ভুল করে চাই

ভুল করে চাই

শক্তিপদ রাজগুরু

BHUL KORE CHAAI

by

SAKTI PADA RAJGURU

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট
দেবদত্ত নন্দী

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ
১৩৭০

—ভোঁপলা, বটাটা—মটর, পনীর, বেথুয়া—সব কুছ লিয়ে আন্‌লো মাম্মি। করমকলা আচ্ছা মিল্‌লো না, টিপে উপে দেখলো সব কুছু সড়াগলা। ট্যমাটো আনলো—

মাধবী দেবী তার বড় ছেলে শ্যামলের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বাজারের থলিটা নামিয়ে শ্যামল ফর্দ দিয়ে চলেছে। মাধবী বলে—ওগো, শুনে যাও তোমার ছেলের কথা। কি সব বলছে।

ভাষাটা জগাখিচুড়ি গোছেরই। মারাঠিরা কুমড়োকে বলে 'ভোঁপলা', আলুকে বটে 'বাটাটা', আর পাঞ্জাবীদের প্রিয় শাক ওই 'বেথুয়া', বাঁধাকপিকে বলে 'করমকলা'।

মাধবী খিঁচিয়ে ওঠে—বাঙ্গালীর ছেলে, এই মুলুকে এসে বাংলা ভুলে গেলি ?

গোবিন্দবাবু অপিস থেকে এই মাসেই রিটায়ার করবেন। দীর্ঘদিন বিদেশে কাটিয়েছেন, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ হয়ে আজ দশবছর আগে বোম্বাই-এ এসে রয়েছেন। রিটায়ার করছেন এখান থেকেই।

দাদারে তখন ফ্ল্যাট পাওয়া যেতো সহজেই। আজকালকার মত মোটা টাকা প্রণামী দিতে হতো না বাড়িওয়ালাকে 'পাগড়ি' বাবদ, বাড়িভাড়া লিখতে হয় এখন দুশো টাকা, কিন্তু লেখাপড়া থাকে উইথ ফার্নিচার, আর ফার্নিচার বলতে দুটো পাখা, একটা চেয়ার হয়তো, তার জন্যই দিতে হবে মাসে পাঁচ, সাতশো টাকা।

এখন বোম্বাই-এর রূপ বদলে গেছে হু হু করে। আর সেই রূপবদলটা নিজের চোখে দেখেছেন গোবিন্দবাবু। বড় ছেলে শ্যামল এখন কোন কোম্পানীতে চাকরী করে, মেজ ছেলে প্রশান্ত এম-এ, এল-এল বি পাশ করে কোন এক সিনিয়ারের সঙ্গে রয়েছে। ছোট ছেলে পড়ছে—সেও এবার বি-এস্‌সি পাশ করবে।

শ্যামলদের কোম্পানীর কারখানায় এ-ক্লাশ এপ্র্যানটিস ও হয়ে যাবে। তিন বছর ট্রেনিং—তখন এলাউন্স কিছু পাবে, আর তারপর কোম্পানীই চাকরী দেবে।

বোম্বাই শহরে তবু কাজকর্ম মেলে এখনও।

কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ আছে, সেখানের আত্মীয় স্বজনদের চিঠি পায়, তাতে কলকাতার হাল সম্বন্ধে হতাশই হয়েছে।

গোবিন্দবাবু এখানে শান্তিতেই আছেন।

দাদার—প্যারেল অঞ্চলে অনেক বাঙ্গালী পরিবার রয়েছে, বান্দ্রা—জুহু-খারের দিকেই গড়ে উঠেছে বাঙ্গালী সমাজ, দাদার প্যারেলের বাঙ্গালীদের মধ্যে এখনও সামাজিকতা, মেলামেশাটা আছে। শিবাজী পার্কের বাঙ্গালী ক্লাবে, লাইব্রেরীতেও যান গোবিন্দবাবু।

মাসে দু' একদিন খারের রামকৃষ্ণ মিশনেও যান। পাঠ হয়, কীর্তন হয় সবুজ স্নিগ্ধ পরিবেশে। সবই আছে, তবু কি যেন নেই।

কিন্তু সেটাকে না পেয়েই এতদিন কেটে গেছে।

হাঁক ডাকে বের হয়ে এলেন গোবিন্দবাবু প্যান্ট সার্ট পরে।
বলে—কি ভাষায় কথা বলে বাপু তোমার ছেলেরা?

গোবিন্দবাবুও জানেন না। বলেন,

—বিদেশে ঘুরে ঘুরে ওই খিঁচুড়ি ভাষাই শিখেছে।

মেজছেলে প্রশান্ত কোর্টে বের হবে, সে ঘরে ঢুকে বলে,

—কেমছে ছে জী?···সাব্, ছে—

মাধবী চটে ওঠে—ওই এলেন আর একজন? গুজরাটিই হবি নাকি এবার প্রশান্ত। কি 'ছে' 'ছে' করিস বাবা?

প্রশান্ত হাসছে। বলে সে—বাঈ! খানা—দুধ রুটি, পালং পনীর, পুরি—ব্যস আউর গোবি কা সবজী!

মাকে চটাবার জন্যই যেন ওরা এক একজন এক এক ভাষায় কথা বলে।

শিখার দেরী হয়ে গেছে কলেজে। বোম্বাই শহরে সকাল থেকেই যেন দৌড় প্রতিযোগিতা সুরু হয়। ওরা অনেকেই সকালে

টিফিন করে রাস্তায় গিয়ে বাসের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ে খবরের কাগজ হাতে। বাসে সীমিত যাত্রী নিয়ে চলাফেরা করে, তাই তাদের পালা আসতে আসতে কাগজটাও পড়া হয়ে যায়।

—ম্যাম্মি!

ঝড়ের মত ঢুকছে শিখা। মাধবীর মেয়ে। পরণে স্ল্যাকস্—আর সার্ট। মাথার একরাশ চুল ছিল, এখন সেগুলো বব্ করা, ফর্সা নিটোল ঘাড়ে পড়ে আছে। সুন্দরীই বলা চলে, শিখাকে। আর সেই রূপটাকে মেজে ঘসে আর উজ্জ্বল করে তুলতে জানে শিখা। সার্ট-এ উন্নত বুকের রেখাগুলো সোচ্চার হয়ে ওঠে, প্যান্ট-এ যেন বেমানান ঠেকে মেয়েকে।

পুরুষালি ভাব নয় একটা উদগ্র ভাবই ফুটে ওঠে সারা দেহে মুখে। মাধবী দেখছে মেয়েকে।

বলে সে—কি ছাই পোষাক পরিস্? আর একরাশ চুলকে কেটে ওই করেছিস?

মাধবী বলে—ছাড়ো তো? ইউ কি রাবিস্ মাম্মি। কলেজে কেউ শাড়ি পরে জবুথবু হয়ে একরাশ চুল-এর বিরাট খোঁপার বোঝা বয়ে কেউ যায় না। দিস্ ইজ সিম্পল—রাদার স্মার্ট। কই খাবার দাও মা! ইস্—লেট হয়ে গেল। রীতাও নেই আইভি থাকবে না, প্রক্সিও পড়বে না প্রফেসর তাণ্ডুল করের ক্লাসে।

সকালটা ঝড় বয়ে যায় মাধবীর সংসারে। গোবিন্দবাবু বলেন—আমি তো বসছি এবার।

মাধবী বলে—ওদের ঝড় তো আছে। আর বাপু সংসারের ঝড় কদ্দিন সামলাবো? এবার রিটায়ার করছো, চলো কলকাতায় ফিরে যাই। তবু মা গঙ্গা আছেন—ওখানে শান্তিতে থাকবে। শিখার বিয়ে থাও দিতে হবে।

গোবিন্দবাবুও কথাটা ভেবেছেন।

বলেন তিনি—তার জন্য তো কলকাতায় তোমার দিদি পাত্র একটা দেখেছেন। এখানেও—দু' এক জায়গায় খুঁজছি।

দেওখালি—পুণায়।

মাধবী এ দেশের রুক্ষতা আর ওই অতি আধুনিক বিকৃতিটাকে দেখেছে। মানুষ এখানে অন্তরের সম্পদকে বাজী রেখে বাইরের সম্পদটাকেই বড় করে দেখেছে। হৃদয়ের কোমল সজীবতা, বিবেক এসবের দাবী এদের কাছে সীমিত হয়ে গেছে।

তাই ঘর সংসার, পরিবারের বাঁধন এদের তেমন নেই। মা-বাবা-ভাই-বোনদের নিয়ে সংসার এখানে দেখা যায় কমই। এক একজন স্বতন্ত্র এক একটি দ্বীপ।

মাধবী বলে—না বাপু, এখানে নয় কলকাতাতেই বিয়ে দেব ওর। ছেলেটিও শুনেছি প্রফেসর!

গোবিন্দবাবু বলেন,

—তা না হয় দিলে।

মাধবী বলে—ওকে বাপু এখানে রাখতে চাই না, পরীক্ষা হয়ে গেলেই বিয়ে থা দিয়ে দাও। এখানে বেশীদিন রাখা ভালো বুঝি না।

গোবিন্দবাবু বলেন—কিন্তু কলকাতায় গিয়ে থাকার কথা বলছো, সবাই রইল এখানে। ওদের ভাতভিতও এখানে। শ্যামল শুনছি ফ্ল্যাটও কিনবে অপিস থেকে লোন নিয়ে, নিজেদের বাড়িও হবে।

তবে আর কলকাতায় থাকার কথা কেন ভাবছো। শুনি তো ওখানে বোমা গুলি চলে। হাঙ্গামা লেগেই আছে। আর ট্রামে বাসে তো ওঠার উপায় নেই। নিত্যি নোতুন ঝামেলা।

এ বয়সে ওসব আর পোষাবে না।

মাধবী বলে—এখানে বোমা গুলি চলে না? গুণ্ডা নেই? আর জ্যাম—ভিড়—সেও তো এখানেও আছে।

কলকাতার সেই দিনগুলো, শান্তির ছোঁয়া, প্রিয়জনের আন্তরিকতা ভুলতে পারে নি মাধবী আজও। সন্ধার পর যেতো গঙ্গার ঘাটে, কীর্তন, পাঠ, আরতি হয়। বাগবাজার—শ্যামবাজারের আত্মীয়দের কথা, সব মিলিয়ে মাধবী এখানের নিঃসঙ্গতার মাঝে কলকাতার দিনগুলোর স্বপ্নই দেখে।

খেয়াল হয় গোবিন্দবাবুর।

—ওগো দেরী হয়ে গেল। যাই ক'টা দিন অপিস করে আসি। ওসব কথা ভাবা যাবে পরে।

মাধবী তবু বলে,

—কলকাতায় দিদিকে চিঠি দিও বাপু, ওই পাত্রটির যেন আরও খোঁজ খবর নেয়। রিটায়ার করেই সামনের মাসে তাহলে ওখানে গিয়ে শিখার বিয়েটা দিয়ে আসবে। তবু মহাদায় থেকে পার পাবো।

মাধবীর সংসারে এবার নির্জনতা নামে।

যে যার কাজে বের হয়ে গেছে। কাজ করার জন্য বাড়িতে একটা বাঈ আছে। মারাঠী গরীব একটি বয়স্কা মহিলা, কাছা দিয়ে কাপড় পরে, উর্ধ্বাঙ্গে রঙ্গীন কাপড়ের একটা চোলি, মাধবীর ওই সঙ্গী।

বৈকালে ছ'একদিন রামকৃষ্ণ মিশনে যায়, তাও সেই খারে। ছেলেরা বড় হয়েছে। বিয়ে থা দিতে হবে।

মাধবী ভাবছে কথাটা!

কলকাতায় গিয়ে মেয়ের বিয়ে থা দিয়ে ভালো ঘরের একটি মেয়েকে দেখে শুনে শ্যামলেরও বিয়ে দিয়ে আনবে। তার মনে বাঙ্গালী সংসারের ঘরোয়া ছবিটা মুছে যায় নি। সেই স্বপ্নই দেখে মাধবী।

বলে সে—বাঈ, তুমি বাসনপত্র ধুয়ে নাস্তা করে নাও। আমি স্নান সেরে পুজোতে বসবো।

মাধবী এখন পুজো পাঠ নিয়েই থাকে। কলকাতা গিয়ে সেবার মন্ত্র নিয়েছে তাদের গুরুদেবের কাছে। কলকাতার কাছেই তার আশ্রম।

মাধবীর আকর্ষণও আছে তাই কলকাতার উপর। পুজোটুজো নিয়ে থাকে। ছেলে মেয়েরা নানা মন্তব্য করে, কিন্তু মাধবী বলে,

—ওসব তো বুঝিস না তোরা? তোকেও বলি শিখা, মাথাটা নোয়াবি দেবতার কাছে, মেয়েছেলে—ঘরের বৌ হবি, মা হবি, ধম্মো কম্মে মতি থাকবে না?

হাসে শিখা।

—তুমি একটা সেকেলে জীবই রয়ে গেলে মাদার। আরব সাগরের তীরে বোম্বাই-এ বসে কলকাতার কোন গুরুদেবকে এত ডাকাডাকি করছো? ননসেন্স! সে কি শুনতে পাবে?

শিখা সবকিছুকেই অমনি উদ্দাম বেপরোয়া মন দিয়ে দেখে। কলেজে সে নামী একটি মেয়ে। এবার ফাইন্যাল বি-এ দেবে। ছেলে মহলেও সে দাপিয়ে বেড়ায়।

সমুদ্রের ধারে কলেজটা, ওদিকে একটা পাহাড় উঠে গেছে। একদিন ওর বুকে দু-একটা ছোট খাটো বাড়ি ছিল, বাকী সব জায়গাটাই প্রায় পাথুরে রুক্ষতায় ভরা, মাঝে মাঝে দু'চারটে তাল গাছ মাথা তুলেছিল।

ক্রমশঃ ওই পাহাড়ের উপরই বুলডোজার দিয়ে মাটি পাথর সমতল করে সেখানে গড়ে উঠছে আকাশছোঁয়া দেশলাই বাক্সের মত ফ্ল্যাট বাড়িগুলো।

কলেজের এলাকাটা তবু সাফ রয়ে গেছে। বড় বড় রেইনট্রি, সাইকামোর, দেওদার গাছের জটলা। মিশনারী কর্তৃপক্ষ কলেজের খেলার মাঠ ঘিরে বাকী জায়গাটায় সুন্দর বাগান করে রেখেছে বহু মেহনত করে।

রুক্ষ মাটিতে ঘাস হয় না, পাইপে জল দিয়ে সবুজ ঘাসফুলের গাছও লোকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

ওখানে গাছের নীচে জমেছে প্রকাশ, মধু সোমানী, গিরীশ শিবদাসানি, আরও ক'জন। মাঠে ক্রিকেট নেট পুঁতে কারা বল পিটছে। বোম্বাই-এ ওই ক্রিকেটই চালু খেলা।

শিখাকে দেখা যায় ওই গাছের নীচে ছেলেদের সঙ্গে। প্রকাশ-এর বাবার বড় বড় ব্যবসা, দামী ইম্পোর্টেড গাড়ি হাঁকিয়ে

কলেজে আসে। মধু সোমানীদের কাপড়ের কল, ইম্‌পোর্ট এক্সপোর্ট-এর ব্যবসা, গিরীশরাও বনেদী ব্যবসায়ী!

—হাই শিখা!

শিখা এগিয়ে যায়, ওদের দেখে।

—হ্যাল্লো!

গিরিশ বলে—লেট আস্‌ গো বেবি!

শিখা বলে—বাট্‌ আই হ্যাভ ক্লাশ!

হাসছে সোমানি—গো টু হেল! চলো জী—ক্লাশ হোগা পিছু। লেট আস হ্যাভ সাম্‌ ফান্‌!

শিখা হাসে—ইউ এ প্যাক্‌ অব নটি বয়েজ!

ওরা এভাবে মাঝে মাঝে বের হয় কলেজ পালিয়ে। গাড়িটা বেগে চলেছে 'ক্রিকের' ব্রিজ-এর উপর দিয়ে। ডান পাশে দূরে সমুদ্রের বিস্তার, সমুদ্রের বুকে দু'একটা পাহাড় মাথা তুলেছে।

জোয়ারের জলে ফুলে উঠেছে খাড়ির বুক, জল ওপাশের জেলে বসতির টালির ছাওয়া ঘরের কাছাকাছি চলে গেছে। ক্রিকের জলে পালতুলে চলেছে লবণ বোঝাই নৌকাগুলো, জেলেদের ডিঙ্গি দু'চারটে চলেছে দূরে দূরে কালো বিন্দুর মত। বৈশাখের শেষ রোদে ঝিকমিক করে জলরাশি।

হাসছে ওরা!

মধু সোমানির গাড়িতে দু'এক বোতল জিন থাকেই। জিনটাই নিরাপদ। লাইম উইথ জিন, ওতে মনটা রঙ্গীন হয়। দেহে সাড়া জাগে, কিন্তু গন্ধ থাকে না। ধরা পড়ার ভয় নেই।

—হ্যাভ সাম্‌ বেবি? মধু সোমানী শিখাকেও একটা গ্লাস এগিয়ে দেয়। শিখা ওদের সঙ্গে সহর দাপিয়ে বেড়ায়, মাঝে মাঝে ছুটির দিন দল বেঁধে সকালে বের হয় সোমানীদের খাণ্ডসার বাংলোয়। পাহাড় বনে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু মদটাকে বিশেষ পছন্দ করে না সে।

অন্যদিন শিখা, রীতা ভোঁসলে—আরও দু'একজন মেয়েবন্ধুও থাকে। প্রকাশ বলে,

—মধু শিখা লাভস্ ইউ ?

শিখা হেসে লুটিয়ে পড়ে। ওর ছোট্ট জামার বাঁধন এড়িয়ে উছল যৌবন যেন সাড়া জাগায়। নরম গালে লালিমা জাগে। শিখা প্রকাশের মাথার কাকের বাসার মত চুলগুলো একখামচা ধরে বলে,

—আই লাভ ইউ সোনি !

তারপরই বাংলায় বলে—শালা প্রকাশ !

হেসে ওঠে ওরা সকলে। প্রকাশ চিৎকার করে চুলে টান পড়তে।

—ছোড় দে শিখা, হম্ তুমসে প্যার নেহি করেঙ্গে ! অয় বাপ্ ! তুম নক্শাল বন্ শিখা ! বেঙ্গল কা নক্শাল—

শিখাকে ওরা কোথায় সমীহ করে চলে।

আজ মধু সোমানী ওকে গ্লাশটা এগিয়ে দেয়।

—হ্যাভ সাম শিখা। জাস্ট এ ড্রপ ! জিন—

শিখা বলে—না, না ! মধু !

—ভয় পেয়ে গেলে শিখা ?

শিখা বলে—ভয় কেন পাবো ? খাবো—তবে পরীক্ষার পর। রেজাল্ট বের হবে সেদিন সেলিব্রেট করবো।

সোমানী বলে—ওকে বেবি ! দেন হ্যাভ এ স্মোক্ !

সিগারেট অবশ্য খায় মাঝে মাঝে শিখা ওদের দলে পড়ে। সিগারেট টানছে সে। গাড়িটা পাহাড়-এর মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। রাস্তার ধারে সুন্দর রেস্তোরাঁ।

পাহাড়টা ধাপে ধাপে উঠে গেছে। উপরে রেস্তোরাঁ—সেখান থেকে কাছেই সমুদ্র দেখা যায়। ওরা সেখানেই উঠে গেল কলরব করতে করতে।

মাধবী মেয়ের দিকে চেয়ে দেখে, রাত্রি হয়েছে। সন্ধ্যা নামে বোম্বাই-এ একটু দেরী করেই। তার অনেক আগেই অপিস থেকে বাবুরা—ছেলেরা ঘরে ফেরে।

ওদিকের গুজরাটি পরিবারের বাড়িতে দেখেছে মাধবী সকলে

সন্ধ্যার আগেই যে যার অপিস থেকে বাড়ি ফিরে সকাল সকাল কিছু খেয়ে নিয়ে আবার বাড়িতেই গল্পগাছা করে। বয়স্ক ভদ্রলোকও বাড়ি ফিরে পায়জামা পাঞ্জাবী পরে ঘরের শিলিং-এ ঝোলানো ঝুলায় বসে, বয়স্কা মহিলাও কাজ সেরে দুজনে ওই ঝুলায় বসে দুলতে দুলতে কি কথা বলে। বাড়ির বাইরের কোন রকও নেই। পাড়ায় কলকাতার মত কোন চায়ের দোকানও নেই।

কোন আড্ডাও হয় না।

পথে যেতে যেতে কেউ পড়শীর সঙ্গে একটা কথা বললো, কেউ তাও বলে না।

নটার পরই শুয়ে পড়ে ওরা।

শান্ত নির্জীব ঘরকন্না।

ওদের সকলের খাওয়া হয়ে গেছে। শ্যামলের কোন বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে, প্রশান্ত ওঘরে বসে তার সিনিয়ার-এর কাছ থেকে নোট করে আনা পয়েন্টগুলোর উপর ভিত্তি করে আর্জি লিখছে কোন মক্কেলের।

তখনও শিখা ফেরে নি।

গোবিন্দবাবু বইটা থেকে চোখ তুলে ঘড়ি দেখেন। রাত্রি ন'টা।

এখনও শিখা ফেরে নি? কি এত দেরী হয়!

মাধবী স্বামীর কথায় বলে,

—মেয়েকে শুধিয়ো! আমার কথা তো শুনলে না? দিদিকে চিঠি দিয়েছো? পাত্রের কথা বলেছো?

গোবিন্দবাবুর ভুলো মন। অপিসে গিয়ে নানা কাজের চাপে পড়ে বাড়ির কথাও ভুলে যান। বলেন তিনি,

—কালই দেব। লিখে রেখেছি—

এমন সময় বেলটা বেজে ওঠে।

মাধবী দরজা খুলতে ঝড়ের বেগে ঢুকলো শিখা।

—হ্যাল্লো মাম্মী!

মাধবী দেখছে মেয়েকে। মুখেচোখে ক্লান্তি—চুলগুলো

এলোমেলো। কি উদ্দামতা ছড়ানো আগুনের ফুল্‌কির মত দেখাচ্ছে ওকে, ঝড়ো বাতাসে এলোমেলো।

মাধবী শুধোয়—কোথায় ছিলি এতক্ষণ! কলেজ কখন হয়ে গেছে। শিখা ওর ঘরের দিকে যেতে যেতে বলে,

—এম সরি! দেরী হয়ে গেছে ম্যাম্মি! রীটা-আইভিদের সঙ্গে একটা ছবি দেখতে গেছলাম! দারুণ ছবি—

মাধবী বলে—সামনে পরীক্ষা। পড়াশোনা করবি তা নয় ছবি দেখে হুল্লোড় করবি?

শিখা মাকে জড়িয়ে ধরে একটু আদর করার চেষ্টা করতে মাধবী মুখটা সরিয়ে নেয়। মেয়ের মুখে সিগারেটের গন্ধ পেয়েছে সে।

কথাটা স্বামীকেও জানাতে পারে না।

শিখা চলে গেছে। বলে সে—ডিনার খেয়ে এসেছি ম্যাম্মি!

মাধবী মেয়ের গতিপথের দিকে চেয়ে বলে গোবিন্দবাবুকে,

—চিঠিটা কালই দিও মনে করে।

মায়ের মন, এই সব ঠিক ভালো লাগে না মাধবীর।

ভাবনাটা আরও বেশী হয়ে ওঠে সেদিন শ্যামলের কথায়।

রবিবারের সকাল।

ওই একটা দিন এদের বাড়িতে থাকার অবকাশ মেলে। সপ্তাহের ছ'টা দিন কাটে ঝড়ের বেগে। রবিবার একটু অবকাশ মেলে। দেখা মেলে ছেলেদের।

বাংলাদেশে যোগ্য ছেলের অভাব আছে, কারণ বেকার আর অভাব এই দুটো। জীবনে প্রতিষ্ঠিত ছেলে এখানে সংখ্যায় কম। অনেক বেছে বুছে, খুঁজে পেতে বের করতে হয়। তার তুলনায় মেয়ে অনেক মেলে।

কলকাতায় মাধবীর দিদি অবশ্য শিখার জন্য পাত্র ভালোই খুঁজেছে, সেই সঙ্গে মাধবীর বড় ছেলে শ্যামলের জন্য দু'তিনটে মেয়ের ফটোও পাঠিয়েছে। ওদের দেখে পছন্দ হলে কথাবার্তা চালাবে,

যাতে দু'এক মাসের মধ্যে যখন ওরা শিখার বিয়ে দিতে আসবে তখন শ্যামলের বিয়েটাও সেরে বউ নিয়ে বোম্বাই-এ ফিরতে পারবে।

মেয়ের ফটো আর শিখার জন্য যে পাত্রটি দেখেছে তার ছবিও এসে গেছে।

মাধবীরও খুব পছন্দ হয়েছে নিশীথকে। পাত্র হিসেবে ভালোই। গোবিন্দবাবুও রাজী হয়ে যান। নিশীথ ডক্টরেট হয়ে কলকাতার কোন কলেজের অধ্যাপক হয়েছে। নিজেদের বাড়ি—উত্তর কলকাতার ছেলে। মাধবীর খুব চেনা জানা। নিশীথের মা বাবা গত হয়েছেন। নিশীথের তাই বিয়ে করারও দরকার।

গোবিন্দবাবু কলকাতায় সম্মতি জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন, ওখানে গিয়ে মাঘমাসেই কয়েকটা দিন আছে, দেখে শুনে তার একটা দিনে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ছেলের বিয়ের ব্যবস্থাও করে আসবে।

কিন্তু বেঁকে বসে শ্যামল।

তার অপিসের কোন মারাঠি সহকর্মিণীর সঙ্গে ইতিমধ্যে তার মন দেওয়া নেওয়া হয়ে গেছে। শ্যামল কথা দিয়েছে হীরাবাঈ সাঠেকেই বিয়ে করবে।

অপিস থেকে দুজনে লোন নিয়ে এর মধ্যে ভারসোভার সমুদ্রের ধারে নোতুন হাউসিং এস্টেটে ফ্ল্যাট-এর জন্য অ্যাডভ্যান্সও করেছে।

শ্যামল মাকে বলে—ওসব নিয়ে আর তোমরা ভেবো না, আমি অন্য কোথাও বিয়ে করতে পারবো না মা।

মাধবী ছেলের কথায় চমকে ওঠে।

—বলছিস কি রে?

শ্যামল জানায়—হীরাকে তুমিও দেখেছো মা, এবার বিজয়ায় এসেছিল প্রণাম করতে। ওকেই বিয়ে করছি। ওকে কথা দিয়েছি মা। ওর মা বাবাও জানে।

গোবিন্দবাবু ছেলের কথায় বলেন,

—ওর মা বাবাকে জানাতে পেরেছো, কথাটা তোমার নিজের মা বাবাই জানেন না?

হতাশায় গোবিন্দবাবুর মন ভরে ওঠে।

শ্যামল কৈফিয়ৎ দেবার সুরে জানায়।

—জানতে পারতে বৈকি! আর দুজনের টাকায় আমরা নোতুন ফ্ল্যাট-এর জন্য অ্যাডভ্যান্সও দিয়েছি।

গোবিন্দবাবু চটে ওঠেন।

—অর্থাৎ পাকাপাকি ঘর বাঁধার ব্যবস্থাও করে ফেলেছো?

গোবিন্দবাবু দেখছেন এবার তাঁর সংসারেও ভাঙ্গন ধরছে। রিটায়ার করার পর থেকেই সংসারের এই বিচিত্র রূপটাকে তিনি আরও নগ্নমূর্তিতে দেখছেন। কারোও উপর কোনো আশা তার নেই।

গোবিন্দবাবু হতাশাভরা স্বরে বলেন,

—সব যখন ঠিক করেই ফেলেছো, আর আমাদের মতামতের দরকার কি!

চুপ করে বের হয়ে যান তিনি।

মাধবী ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। তার বুকেও বেদনাটা বেজেছে গভীর ভাবে। এই হৃদয়হীন সহরের পরিবেশ-এর কাঠিন্য তার মনেও এবার সাড়া তুলেছে!

শ্যামল এসব প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য বলে,

—অপিসে দেরী হয়ে গেল মা।

শ্যামলের কথাটা বাড়িতে চাপা ঝড় তুলেছে। ছেলেরা অপিসে বের হয়ে গেছে। স্তব্ধতা নেমেছে বাড়িতে। সারা বাড়ির পরিবেশটা বদলে গেছে।

মাধবী বলে গোবিন্দবাবুকে,

—খুব হয়েছে। এখন যে যার ব্যবস্থা করে নেবে তা বুঝেছি। তাই মেয়েটার বিয়ে থা দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই।

শিখা সেদিন গেছে বরিভলির ন্যাশন্যাল পার্কে, সবুজ পার্বত্য পরিবেশে হারিয়ে গেছে সে আর মধু সোমানী, মধুর বাবার ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের কারবার। ওর গাড়িখানাও বিদেশী। পরণে

দামী পোষাক—ওকে ঘিরে ইন্টিমেট সেণ্টের মৃদু মনমাতানো সুবাস ওঠে।

শিখার পরণে স্ল্যাকস-কুর্তা, চুলগুলোও আধুনিক স্টাইলে ঘাড়ের কাছ অবধি ছাঁটা। গাড়িটা ক্রিকের ধারে রেখে ওরা একটা কাজুবাদাম গাছের নীচে বসে আছে, দূরে দেখা যায় সমুদ্রের বিস্তার, বেসিন ক্রিক গিয়ে সমুদ্রে মিশেছে। ঝড়ো হাওয়ায় কাঁপছে নারকেল বন। দূরে সবুজ পাহাড়ের মাথায় কোন অতীতে পর্তুগীজ কেল্লার ভাঙ্গা পাথরের প্রাচীরগুলো দেখা যায়।

—শিখা!

মধু সোমানীর ডাকে চাইল শিখা, সবুজ নির্জনে খাঁড়ির বুকে ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ কানে আসে।

শিখা দেখেছে সোমানীর চোখে মুখে কি এক আবেগময় উচ্ছ্বলতা। ওর বুকের উপর মাথা রেখে শিখাও আবিষ্কার করে ওর দেহের কোষে কোষে কি মাতাল নেশার আহ্বান। চোখে তার সেই নেশার আগুন।

শিখা দেখেছে আরও অনেককে তার পিছনে এমনি ঘুরতে, দেখেছে গিরিশকে, মাথুস্বামীর সেই আকুলতা, পিণ্টোর উচ্ছ্বাস, মধু সোমানী আজ নিজেকে হারিয়ে ফেলে। শিখার মনেও কি সাড়া জাগে, সমুদ্রের জোয়ার এসেছে ; ঢেউ ভাঙ্গছে পাথরের বুকে।

মধু সোমানী শিখার দেহটার উপর যেন মত্ততা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। চোখে ওর কি নেশা!

—সোনী! আই লাভ ইউ সোনী!

শিখাও দেখেছে এ জীবনের মত্ততাকে। সমাজের বুকে তাকে নিয়ে লোফালুফি চলেছে। দেখেছে শিখা ওই ছেলেদের। পিণ্টো—রামু শিবদাসানী, মধু সোমানী, মাথুস্বামী—গিরীশ আরও অনেককে।

ওরা তার যৌবনের কুঞ্জবনে ভ্রমরের সুর তুলে বন্দনা করে, ওদের

ব্যাকুল মনে ঝড় তুলে শিখা আনন্দ পায়। ওদের স্তুতি শিখার সব পাওয়ার নেশাকে আরও উদগ্র করে তুলেছে। মনে হয় সে যেন এক ছোট্ট সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী, এই প্রাধান্যকে আরও বিস্তার করে কোন রাজ্য গড়ে তুলতে চায়।

হাসে শিখা—ইউ মধু, সিলি বয়!

মধু বলে—আই লাভ ইউ সোনী!

এ কথাটা প্রায়ই শোনে শিখা অনেকের কাছে। হাসে শিখা, ওর এলোমেলো চুলগুলো ধরে মুখটা কাছে এনে ওর উত্তপ্ত ঠোঁটের স্পর্শ এঁকে দেয় শিখা।

গুনগুনিয়ে ফিরছে শিখা, তার হাতে একটা ফুলের ফুলদস্তা। মধু দিয়েছে আজ প্রীতির স্মারক চিহ্ন। মধু সোমানীও পাশ করে বাবার ব্যবসায় বসবে। মধু বলেছে—সে বিয়ে করতে পারে শিখাকে, যদি শিখা রাজী থাকে!

চমকে উঠেছে শিখা।

মধু সোমানীদের বিরাট বাড়িটা দেখেছে, ভিলে পার্লের ওদিকে বাগান-ঘেরা সুন্দর বাংলো। বিরাট ড্রইং রুম—ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট, গ্যারেজে চারখানা বিদেশী গাড়ি। মধুর নিজের নামেও একটা বাংলো আছে!

....কিন্তু শিখা সহজে কোন বাঁধনে বাঁধা পড়তে চায় না। তার মনে অনেক পাবার নেশা, সকলের স্তুতি-ব্যাকুলতা মাড়িয়ে সে পথ চলবে সম্রাজ্ঞীর মত!

সকাল বেলাতেই বাড়ি থেকে বের হয়েছিল শিখা, ফিরছে তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এমন ভাবে বের হওয়া তার কাছে নোতুন কিছু নয়। মাধবীকে দেখে চাইল শিখা।

সারা বাড়িটা থম্‌থম্ করছে। ওদিকের ঘরে মেজদা তার মক্কেলদের ব্রিফ নিয়ে ব্যস্ত। জরুরী মামলার কয়েকটা আর্জি লিখে নিয়ে বের হয়ে গেল তার সিনিয়ারের কাছে।

বাবার ঘরটা নিস্তব্ধ।

মাধবী দেখছে মেয়েকে। ওই বেশবাসে সারা দেহের উচ্ছলতা ফুটে উঠেছে। মুখে রং-এর পালিশ, বিচিত্র পপ 'সং'-এর সুর এ বাড়িতে বেমানান।

মাধবী শুধোয়—কোথায় ছিলি সারাদিন?

হাসে শিখা, হাল্কা স্বরে বলে—সিলি কোশ্চেন ম্যাম্মি। একটু বাইরে গেছলাম। সহরে হাঁপিয়ে উঠি তাই চলে যাই মাঝে মাঝে বাইরে!

মাধবী বলে বেশ বিরক্তিভরা স্বরে,

—ইদানীং ওটা বেড়েছে দেখছি খুবই। এবাড়িতে ওসব এবার বন্ধ করতে হবে।

শিখা মায়ের দিকে চাইল। শুধোয় সে,

—কি ব্যাপার বলোতো?

মাধবী বলে—যা বলবার বল্লাম। সামনের সপ্তাহে কলকাতা যাচ্ছি আমরা, কলেজের পরীক্ষা হয়ে গেছে। চলো—ঘুরে আসি। অনেকদিন যাওয়া হয় নি।

শিখা বলে—এগেন দ্যাট রটন্ ক্যালক্যাটা! উঃ লোডশেডিং—বোমা—দ্যাট জ্যাম্! কি যে বলো মা! হরিবল!

মাধবী শোনায়—সেখানে কি লোক থাকে না? যতো মানুষ থাকে এই সোনার সহরে? বুঝলি এখানে বাইরেই ঝকমকানি—ভেতরে এর সব মেকি রে! একথা আজ বুঝবি না—আলোয় চোখ ধাঁধিয়েছে, এই মোহ কাটলে বুঝবি এখানের যন্ত্রণার কথা।

পুঃ! শিখা মায়ের ওই দর্শনে এতটুকু বিশ্বাস করে না।

মাধবী হয়তো কিছু বুঝেছিল মেয়ের মনের পরিবর্তনটা। ওর এই বেপরোয়া জীবনযাত্রাকে এড়াবার কথা ভেবেই ওরা চলেছে কলকাতার দিকে।

শ্যামলের বিয়ের প্রসঙ্গ আর তোলে নি তারা। প্রশান্ত, শ্যামল

কিছুদিন পর বিয়ের সময় কলকাতায় যাবে। এখন গোবিন্দবাবু-মাধবী-শিখা আর ছোট ছেলে সুশান্ত চলেছে কলকাতায়।

গোবিন্দবাবু সবই দেখেন কিন্তু চুপ করে থাকেন।

তবু মাধবীকে বলেন—বিয়ের কথাটা শিখাকে জানালে পারতে, একেবারে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বল্লে তখন যদি আপত্তি করে?

মাধবী বলে,

—বোম্বাই-এ বল্লে বেঁকে বসতো, ওই বন্ধুবান্ধবদের দল থাকবে না, শান্তিতে ভাবতে পারবে নিজের ভালোমন্দের কথা। ছাড়ো তো ওসব। নিশীথের সঙ্গে পরিচয় হোক—তারপর কথাটা বলবো। ও নিয়ে ভেবো না।

চুপ করে গেলেন গোবিন্দবাবু।

ইদানীং শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না তাঁর। রিটায়ার করবার পর শ্যামলের ওই বিয়ের ব্যাপারে তার মন ভেঙ্গে গেছে। চুপচাপই থাকেন। ভয় হয় আবার শিখাও না আঘাত দেয় তাকে। একটার পর একটা বিপর্যয়ই দেখে চলেছে গোবিন্দবাবু। মনে হয় সংসার দেয় সামান্যই, তাও খেটে রোজগার করতে হয়। কিন্তু নিয়ে নেয় সবকিছুই।

শিখা-সুশান্ত অনেকদিন পর চলেছে দূর পথে। পাহাড় বনের বুক চিরে গাড়িটা চলেছে নাগপুর ছাড়িয়ে। রূপ বদলাচ্ছে চারিদিকের।

পরদিন সকালে ওরা বাংলাদেশে ঢুকেছে। সবুজ ক্ষেত, সমতলে সবুজ তাল নারকেল গাছঘেরা গ্রাম, মাটির বাড়ি—কলা-আখের ক্ষেত—সব মিলিয়ে পরিবেশটা স্নিগ্ধ, বোম্বাই-এর আশপাশের সেই রুক্ষতা নেই।

দেখা যায় দূরে হাওড়ার ব্রিজটা। ওরা নামার জন্য মালপত্র গোছাচ্ছে।

শিখা হাওড়ায় নেমে দেখে তার মাসীমা বাসন্তী দেবী, মেসোমশাই, মাসতুতো ভাই অনিল, মাসতুতো বোন ইলারা এসেছে ওদের নিতে।

ওই লোকারণ্য প্লাটফর্মে নেমে তাদের দেখে এগিয়ে আসে।

মা বলে শিখাকে—ওমা—হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে তোরা শিখা, সুশান্ত, মাসীমা মেসোমশাইকে প্রণাম কর!

ওদের খেয়াল হয়। বোম্বাই-এ এসব প্রণামের দরকার হয় নি, ওটার রেওয়াজও নেই। এখানে কেন জানে না শিখা প্রতিবাদ করতে পারে না, প্রণাম করলো।

বাসন্তী বলে—থাক্, থাক্। অনিল—মালপত্র নিয়ে গাড়িতে চল বাবা!

তবু শিখার মনে হয় এই প্রণামটুকুর দাবী তাঁরাও করেছিলেন। এবার পেয়ে খুশী হয়েছেন। চল মাধু! জামাইবাবু ভালো আছেন তো?

গোবিন্দবাবু বলেন,

—চলছে একরকম!

জামাইবাবু! শিখা ওই ডাকটা ঠিক পছন্দ করে না।

হাওড়ার ব্রিজ পার হয়ে গাড়িটা চলেছে বড়বাজারের রাস্তায়। গাম্বরের ইট ঢাকা রাস্তা, খানাখন্দ বোঝাই, জল কাদা জমে আছে। আর জমেছে লরির ভিড়। গাড়ি—বাস—মাল বোঝাই লরী তার মধ্যে অগুনতি মানুষের ভিড় গিশ গিশ করছে।

গাড়িটা চলেছে কোনমতে, কোথাও দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

—হরিবল! শিখা গজগজ করে—এই কোলকাতা?

অনিল বলে—এখানে জাম এমনি হয়, বড়বাজার এলাকা। তবে কলকাতার সবজায়গাই এমন নয় শিখা!

শিখা বলে—অম্নি গায়ে লাগলো না রে? দেখা যাক তোর কলকাতা ক্যামন ঠাঁই!

গিরীশ অ্যাভিনিউ-এর এদিকটা দেখে শিখা কিছুটা আশ্বস্ত হয়। ওদিকে বড় রাস্তা থেকে গলিটা বের হয়ে গেছে ভিতরে। সাবেকী আমলের বাড়ি।

ভিতরে একটা চত্বর মত, একদিকে বসার ঘর, ছেলেদের পড়ার

ঘর। উঠোন পার হয়ে ওপাশে উঠে গেছে দোতলা বাড়িটা, টানা বারান্দায় কাঠের ঝিলিমিলি লাগানো, ঘরগুলো বড় বড়ই, তিনদিকে বারান্দার লাগোয়া ঘর, ওপাশে ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি।

ছাদ থেকে ওপাশে গঙ্গার বিস্তার কিছুটা দেখা যায়, মাল নিয়ে বড় বড় নৌকা চলেছে, তার ওপারে দেখা যায় হাওড়ার কলকারখানাগুলো, চিমনি থেকে ধোঁয়া উড়ছে। শিখার ভালো লাগে না। বোম্বাই-এর পাহাড়—মুক্ত সমুদ্র, নীল জলের সন্ধান এখানে নেই। সব কেমন ঘিঞ্জি, আর ধোঁয়াটে।

মাধবী এখানে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে।

গঙ্গায় স্নান করেছে অনেকদিন পর। বলে সে,

—এখানে এসে গঙ্গায় নেয়ে মনে হল বাঁচলাম ছোড়দি!

বাসন্তীর সংসারের এখন সব ভার বড় বৌ-এর উপর। হাসিখুশি মেয়েটি, এর মধ্যে মাধবীকে আপন করে নিয়েছে। রমা বলে মাধবীকে।

—পূজা সেরে নিন মাসীমা। বেলা হয়ে গেছে জল খাবেন।

মেশোমশাইদের চা জলখাবার দিয়ে দিইছি। ওদিকে রান্নাও হয়ে গেছে। এবার খাইয়ে ওকে বিশ্রাম নিতে বলবো। ট্রেনের ধকল—

মাধবী দেখেছে রমাকে!

মনে মনে মাধবী ছোড়দিকে হিংসা করে। তার ছেলের বিয়ে দিয়ে এমনি একটি লক্ষ্মী মেয়েকে সংসারে এনে নিজে তার হাতে সব দায়িত্ব তুলে দিয়ে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। কিন্তু তা হয় নি।

শ্যামল কোন অন্য প্রদেশের একটি মেয়েকে বিয়ে করে সরে যেতে চায়, মাধবীর মুক্তি মিলবে না সংসারের জোয়াল থেকে তা বুঝেছে।

পুজো করতে বসে ওই শূন্যতার কথাই মনে পড়ে বার বার। এখন ভালোয় ভালোয় শিখার বিয়ে দিয়ে যেতে পারলে তবু নিশ্চিন্ত হবে কিছুটা। একজনের জন্য চিন্তাটা কমবে।

শিখা এসে দেখেছে এখানের সমাজের রূপটাকে। পাড়ার মধ্যে ছেলে মেয়ে সবই আছে। বৈকালে ইলার সঙ্গে পার্কে বের হয় দেখেছে শিখা ইলাকে।

শাড়ি ব্লাউজ পরেছে, ইলা শিখাকে ওই স্ল্যাকস্—সার্ট পরতে দেখে চাইল—ওকি রে?

শিখা বলে—সো হোয়াট! ওই সব শাড়ি পরে জবরজং সাজতে পারি না বাপু। মনে হয় গায়ে পায়ে ঠেকছে। চল্‌তো!

ওরা বের হয়েছে দুজনে।

রাস্তায় লোকজনের ভিড়। গাড়িগুলো সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যু ধরে চলেছে। ছেলে মেয়েরা খেলছে পার্কে, বয়স্ক মেয়েদেরও দেখে শিখা।

ইলাই পরিচয় করিয়ে দেয়—শিখা আমার বোন। বোম্বে থেকে এসেছে। এই লতা ও মালতী।

দেখছে শিখা ওদের মুখে চোখে নীরব বিস্ময়ের চিহ্ন। তার ওই পোষাক—বব্ করা চুল, মেক আপ্—সবকিছুই ওদের কাছে পছন্দসই বলে মনে হয় না।

ইলা বলে—কাল সকালে আয় মালতী।

মালতী বলে—কাল বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো, বরং সন্ধ্যাবেলায় যাবো। তুই বরং তোর বোনকে নিয়ে আয় না সকালে?

শিখা দেখছে ওদের।

ছেলেদের দু'একজনকে দেখা যায়। ওদিকে ক্লাব মত, সামনের মাঠে ছোট ছেলেমেয়েরা খেলছে।

—তরুণদা!

ইলার ডাকে একটি ছেলে এগিয়ে আসে দল থেকে।

—কি রে?

ইলা বলে—পরশু প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ, তোমার নোটগুলো একটু আনবো গিয়ে।

বরুণ ওদিকে ভলি খেলায় ব্যস্ত।

বলে সে—ঠিক আছে। যাবি—তবে ফেরৎ দিস কিন্তু!

আবার দৌড়ে গিয়ে কোর্টে ঢুকে খেলায় মন দেয়। কলরব ওঠে ওদের। শিখা দেখেছে ওদের।

এতগুলো তরুণ খেলছে, তার দিকে নজর দেবার সময়, ইচ্ছা তেমন নেই ওদের। ওখানে দেখেছে অন্য কিছু। তাদের সমাজে শিখাকে নিয়ে যে মাতামাতি হয় এখানে তার অবকাশ নেই। শিখা সেটা জেনেছে উদগ্র কামনার বিচ্যুতি এখানে কম।

ইলা সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে পড়তে বসে। তার আগে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বেলে ঠাকুর ঘরে প্রণাম করে আসে। বাসন্তী বলে—শিখা যা প্রণাম করে আয়।

এ বাড়ির সকলেই বিগ্রহ প্রণাম করে আসে, নীচের মন্দিরে এদের কুলদেবতা প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। শিখা বাধ্য হয়ে ইলার সঙ্গে মন্দিরে যায়।

পুরোনো আমলের রেওয়াজ আজও চলে আসছে। ঘণ্টা কাঁসর বাজছে। বাতাসে ওঠে ধূপের গন্ধ। শিখা এই পরিবেশে কোনদিন আসে নি এর আগে। মা—মাসীমা—মেসোমশাই—বৌদি সকলেই রয়েছে। প্রণাম করে শিখাও।

হঠাৎ ক্ষণিকের জন্য তার কোথায় একটা দুর্বলতা জেগে ওঠে। হয়তো এই পরিবেশই তাকে বদলে দিয়েছে কিছুক্ষণের জন্য।

ইলা পড়ছে, শিখা শুধোয়,

হ্যাঁরে ইলা তোর কোন বয়ফ্রেণ্ড নেই? তার সঙ্গে বের হোস না বাইরে?

ইলা শিখার দিকে চাইল।

শিখা বলে—বোম্বাই-এ আমরা প্রায়ই বের হই, হৈ চৈ করি।

ইলা অবাক হয়! জানায় সে,

—ওসব নেই বাবা! কলেজে যাই—পথেঘাটে কারোও সঙ্গে দেখা হয় দু'একটা কথা বলি। ওসব ফ্রেণ্ড ট্রেণ্ড কেউ আমার নেই। আমাদের বাড়িতে জানতে পারলে ওসব ঘুচিয়ে দেবে।

অবাক হয় শিখা, ইলার জীবনের এই শূন্যতায় সেও

অবাক হয়ে বলে—সে কি রে? কি নিয়ে থাকিস তোরা কে জানে?

ইলা শোনায়—বাড়ির কাজকম্মো, পড়াশোনা—সেলাই টেলাই গান নিয়েই দিন কেটে যায়।

শিখার কাছে মনে হয় এই বদ্ধ জীবনের কোন দাম নেই। একেবারে একঘেয়ে এই জীবন।

....নিশীথকে দেখে সেদিন একটু অবাক হয় শিখা। সুন্দর শান্ত চেহারা, মুখে চোখে বুদ্ধির দৃপ্তা। শেলফ্রেমের চশমায় সেই শান্ত মার্জিত রুচির আভাস ফুটে ওঠে। এ বাড়ির বড়বৌ রমার সম্পর্কে ভাই হয়।

রমাই পরিচয় করিয়ে দেয় শিখার সঙ্গে নিশীথের। নিশীথ দেখছে শিখাকে।

রমা বলে—নিশীথ, কাল তাহলে ফ্যাংশানে যাচ্ছি, শিখাও যাবে।

শিখা বলে—যা ভিড় এখানে রাস্তায় ঘাটে, বাসে ট্রামে ওঠার যো নেই, আর টাক্সি তো মেলাই ভার। বোম্বেতে টাক্সির প্রবলেমই নেই।

রমা শোনায়—নিশীথের গাড়ি আছে। যাতায়াতের ভাবনা হবে না।

গোবিন্দবাবু, মাধবী—বাসন্তী সকলেই মনে মনে তৈরী হয়েছেন। ওদিকে বিয়ের আয়োজনও চলছে।

শিখা এ বাড়িতে বেশ কয়েকদিন বন্দী থাকার পর এবার মুক্তির পথ পেয়েছে। সেদিন মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠানে গিয়ে অনেকটা সহজ হয়ে ওঠে নিশীথও।

শিখার যৌবনদৃপ্ত দেহ, ওর সহজ মেলামেশার ভঙ্গী নিশীথকেও সহজ করে তোলে।

শিখা বলে—চলুন আইসক্রীম খেতে হবে।

স্ল্যাকস্‌পরা, ববড চুল—সার্টটায় তাব বুকের—দেহের রেখাগুলো

সোচ্চার হয়ে উঠেছে। হাসছে শিখা, তার তুলনায় ইলা শাড়ি পরে অনেক শান্ত—আর সংযত হয়ে গেছে।

শিখা বলে—কলকাতায় হাঁপিয়ে পড়েছি। বোম্বের আশপাশে সুন্দর আউটিং-এর জায়গা কতো আছে। পাওয়াই লেক—একটু দূরে হিল টাউন খাণ্ডালা, ম্যাথেরণ লোনাভালা, সমুদ্র—পাহাড় কত জায়গা। কলকাতা একেবারে 'বোর'।

নিশীথ বলে—তা কেন হবে। চলো ডায়মণ্ডহারবার তো কাছেই। ভালো লাগবে। দীঘাও খুব সুন্দর বীচ।

সেদিন শিখা আর নিশীথ বের হয়েছে। ডায়মণ্ডহারবারের ভাঙ্গা ফোর্টের নীচে এসে ঠেকেছে জোয়ারের জল। ওদিকের তীরভূমিতে ছোট খাটো মেলা বসে গেছে ট্যুরিস্টদের। বৈকাল নামছে। দূরে দু'একটা জাহাজ যাতায়াত করে, ছুটে চলেছে লঞ্চ, পালতোলা নৌকাগুলো গঙ্গার বিস্তৃত বুকে। গাছগাছালির বুকে দিনের শেষ আলো সোনালী থেকে গোলাপী হয়ে আসছে।

শিখা মুক্তির আশ্বাস পায়।

বলে সে—বিয়েলি নাইস প্লেস।

নিশীথ দেখছে ওকে। ঝড়ো হাওয়ায় শিখার সুন্দর মুখের উপর চুলগুলো আছড়ে পড়ে, হাওয়ায় ওর উদ্ধত যৌবনের দৃপ্ত ঘোষণা।

একটা দিন ফুরিয়ে এল, এবার ফিরতে হবে তাদের। নিশীথ বলে,

—চলো। ফেরা যাক্।

শিখার খেয়াল হয়। বলে সে—আবার সেই কলকাতা। উঃ হরিবল্।

নিশীথ বলে—কাজ তো করতে হবে। সামনের রবিবার নাহয় বের হবো আবার।

শিখা বলে—আমার কিন্তু একদম ফিরতে ইচ্ছে করছে না। জানেন, এখানে এসে আমি 'জলছাড়া' মাছ হয়ে গেছি এই কলকাতার জীবনে যেন কোন আকর্ষণই নেই। রাদার কোল্ড।

হাসে নিশীথ ! বলে সে।

—কোলকাতাকে তুমি কোল্ড সিটি বলছো ? এখানের মানুষের আতিথেয়তার বদনাম নেই। আর বোমা—গুলি—আন্দোলন, মিছিলে এর আবহাওয়া চিরকালই 'হট', অন্ততঃ অন্য প্রদেশের লোকরা তাই বলে। কিন্তু এসব আমাদের সয়ে গেছে। কিছু না হলে পানসে ঠেকে।

শিখা চুপ করে থাকে।

ফিরছে ওরা।

শিখা তবু নিশীথের কাছেই তার মনের এই অতৃপ্তি অসুবিধার কথা বলতে পারে। মাঝে মাঝে ওরা বের হয় গাড়ি নিয়ে। সেদিন শিখা বলে,

—দীঘার কথা বলছিলে, চলো না একদিন। তোমাদের ওই বড়াইকরা সমুদ্রবসতকেই দেখে আসি। কবে যাবে বলো ?

নিশীথের কাছে শিখা অনেকটা সহজ হয়েছে।

মাঝে মাঝে শিখা চলে আসে নিশীথের বাড়িতে। ওর বাড়িটা ওই মাসীমার কেল্লার প্যাটার্নের পুরোনো বাড়ির তুলনায় অনেক আধুনিক।

নিশীথের বাবা তাদের পুরোনো বাড়ির বাগানে এই বাড়িটা তুলেছিলেন। চারিদিকে কিছুটা খোলা মেলা, বাগানের বকুল—ম্যাগনোলিয়া—দু'একটা আমগাছও রয়ে গেছে। সামনে গোলাব-এর বেড়। চারিদিকে সীমাপ্রাচীর, গেট থেকে কিছু বাগানের মধ্যে দিয়ে সুরকি ঢালা পথ দিয়ে এসে পোর্টিকো।

শিখা বলে—এখানে তবু দম ফেলতে পারি। মাসীমার বাড়ি তো সামন্ত রাজাদের কেল্লা।

হাসে নিশীথ—বাবা এটা করিয়েছিলেন। বাগানটা কোনমতে আমি টিকিয়ে রেখেছি।

শিখা তাড়া দেয়—লেট আস্ গো !

ওর যেন ঘরে মন বসে না। সে বাইরেই ঘুরতে চায়। তাই নিশীথকে বাহন করেছে। কাছে এসেছে ওর।

কথাটা তাই সেদিন বাড়িতে শুনে চমকে ওঠে শিখা।

মাধবী, বাসন্তী, রমা ওরা রয়েছে। বাসন্তী বলে,

—নিশীথেরও অমত নেই। তাই বলছিলাম মাধু, শিখার সঙ্গে তাহলে ওদের বিয়েটা সেরে ফেল!

শিখা ভাবতে পারে নি কথাটা।

নিশীথের সঙ্গে মিশেছে, ঘুরেছে সত্যি। তবু নিশীথ ওই দীঘা নিয়ে যাবার কথায় বলেছিল,

—ওখানে রাতে থাকতে হবে! মানে—

ঠিক বোঝাতে পারে নি শিখাকে যে একজন অবিবাহিত মেয়ের সঙ্গে বাইরে এভাবে যাওয়া ঠিক হবে না।

শিখা হেসে উঠেছিল—সো হোয়াট! আমরা হোটেলে দুটো রুম নেব! নেভার মাইণ্ড!

শিখাই জোর করে গিয়েছিল সেখানে।

আজ মাসীমার কথায় শিখা বলে ওঠে,

—বিয়ে করতে হবে, নিশীথকে? কেন?

মাধবী অবাক হয়, বলে সে,

—এমন ছেলে সাধনা করে পেতে হয়, যেমন শিক্ষিত তেমনি ভদ্র, বিনয়ী। নিজের বাড়ি—

শিখা নীরব রাগে ফুলে ওঠে।

মাসীমা বলে—তুইও চিনিস ওকে! তবে আর অমত করছিস কেন?

শিখার অমত করার কারণটা ওরা জানে না।

শিখা জানে, বোম্বাই-এর সেই অবাধ মুক্তির দিনগুলোকে ভুলতে পারে নি সে। মধু সোমানী, জাভেরী, পিণ্টো—ওই দলবলের সঙ্গে দাপিয়ে বেড়াত।

জীবনটাকে উপভোগ করতে চায় সে, বোম্বাই থেকে তাকে চক্রান্ত করে সরিয়ে এনে এবার এখানেই আটকে রাখতে চায় ওরা ওই বিয়ে দিয়ে।

শিখার সারা মনে নীরব জ্বালা ফুটে ওঠে।

মাসীমা, বড়বৌদি বলে—ওসব কথা বুঝি। তবু মা বাবার দিকে চাইতে হবে শিখা।

মাসীমা বলে—জামাইবাবুর বয়স হয়েছে, শরীর ভালো নেই। তবু ভালো ঘর বরে তোর বিয়েটা দিতে পারলে ও বেচারা নিশ্চিন্ত হবে।

সকলকে ভাবনামুক্ত, দায়মুক্ত করার জন্যই নিজেকেই বলি দিতে হবে শিখার।

মা দেখেছে মেয়েকে।

রাতে একরকম না খেয়েই উঠে এসেছে শিখা। মাধবীও মেয়ের ঘরে এসে দেখছে ওকে।

শিখা মাকে দেখে চাপা স্বরে বলে—এসব ষড়যন্ত্র! বোম্বে থেকে প্ল্যান করে সরিয়ে দিতে চাও আমায়?

মাধবী বলে—এখানে সুখী হবি শিখা। ওই হৈ চৈ ছুটে বেড়ানো আর আলোর ঝলকের জীবনে শান্তি নেই রে!

শিখা গর্জন করে—আমাকে ওসব বোঝাতে হবে না। কচি খুকি নই আমি।

একা শিখা, অন্যদিকে সারা পরিবারের লোকজন।

আজ শিখাকে ওরা জোর করেই বিয়ের ব্যাপারে নামিয়েছে। বোম্বাই থেকে বড়দা, মেজদাও এসে পড়েছে।

বিয়ের জন্য বাড়িটাকে সাজানো হচ্ছে।

বড়বৌদি মা, দুজনেই ব্যস্ত। বিয়ের বাজারপত্র চলছে পুরোদমে। গহনা—বেনারসী শাড়ি—মায় ফার্নিচারপত্রও এসে গেছে।

শিখা গুম হয়ে গেছে।

নিশীথকেই মেনে নিতে হবে। আর কোন পথই তার সামনে খোলা নেই।

বোম্বাই-এর আরবসমুদ্রতীরের ঝাউবনে ঢেউ ভাঙছে, মাহিমক্রিকের উপর দিয়ে ঝড়ো ভিজে হাওয়ায় ভর করে সাহানীর গাড়িতে ছুটে যাওয়ার স্মৃতিই মনে পড়ে। খাণ্ডালার পাহাড়-এর উপর থেকে দেখা নীচের গভীর ছায়াঢাকা উপত্যকা তার চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেছে।

হারিয়ে গেছে সেই দিনগুলো।

শিখা চেয়ে দেখছে ওই উৎসবমুখর পরিবেশ—লোকজনের আনাগোনা—বিচিত্র ওই মানুষগুলোকে। মায়ের উপরই রাগটা বেশী হয় শিখার। বাবাও এই ব্যাপারটা দেখছেন নীরব দর্শকের মত। সকলেই শিখার যেন পরম শত্রু!

কি রাগে গম্ভীর হয়ে শিখা এই সর্বনাশটাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। সবকিছু তার হারিয়ে গেল।

আর রাগ হয় নিশীথের উপরও। নিশীথের সঙ্গে মিশে এমনি করে মূল্য দিতে হবে শিখাকে এটা ভাবে নি সে। এই আলোঝলমল উৎসবমুখর পরিবেশ শিখার কাছে অসহ্য ঠেকে।

....কিন্তু তবু এই বিয়েটাকে ঠেকানো যায় নি।

শিখা নিজেকে দেখে চিনতে পারে না। উদ্ধত—বেপরোয়া-যৌবন মাতাল শিখা হেরে গিয়ে বদলে গেছে পরণে বেনারসী, হাতে শাখা—চুড়ি—সিঁথিতে সিন্দুর।

শিখার সেই স্বাধীন মুক্ত সত্ত্বাকে আজ ওই জগৎ থেকে সরিয়ে এনে নির্মমভাবে হত্যা করেছে এরা।

পায়ের শব্দে চাইল শিখা।

নিশীথ ঢুকছে। ওই নিশীথের সঙ্গে একদিন সহজভাবেই মিশেছিল। কিন্তু আজ ওকে অন্য চোখে দেখে শিখা। নিশীথ তাকে গ্রাস করার লোভ সামলাতে পারে নি, তাই এই ভাবে দখল করেছে।

—কি ভাবছো ?

নিশীথের দিকে চাইল শিখা।

তার মনের জ্বালাটাকে প্রকাশ করা অনর্থক। শিখা তাই মুখে একটু হাসির আভা ফুটিয়ে বলে,

—কই না তো ?

নিশীথ ওকে কাছে টেনে নেয়। শিখা প্রতিবাদ করতে পারে না, মন থেকে ওই নিবিড় স্পর্শ টুকুকে ঠিক গ্রহণ করার মত মানসিকতাও তার নেই !

পুরুষের ছোঁয়া শিখার জীবনে প্রথম নয়।

এর আগেও দেখেছে সে মধু সাহানী, জাভেরী—অন্য অনেককে। আজ ওই প্রথম মিলনের কোন স্মৃতিই তার মনে রেখাপাত করে না, মনে হয় তার অনিচ্ছাতেই সে আজ একটা জীবনকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

ক্লান্ত—তৃপ্ত নিশীথ শিখার মনের এই নীরব জ্বালা আর নিরাশক্তির খবর জানে না। পাশাপাশি দুটি মানুষ—তবু দুজনের মাঝে একটা ব্যবধান—কোথায় বাধার অদৃশ্য প্রাচীর গড়ে ওঠে।

মাধবী, গোবিন্দবাবু নিশ্চিন্ত হয়।

বাসন্তীর কাছে কৃতজ্ঞ মাধবী। তার মেয়ের বিয়ে ভালো-ভাবেই চুকে গেছে। একটা মহাদায় থেকে মুক্তি পেয়েছে তারা।

মাধবী বলে,

—ছোড়দি, এখানের কাজ তো সারা হ'ল। এবার ফিরতে হবে আমাদের।

বাসন্তী বলে,

—এখানেই বাসা-টাসা ঠিক করে থাক। বলছিলি বোম্বাই-এ যাবি না।

হাসে গোবিন্দবাবু—তা হয় না বাসন্তী। ছেলেরা সব ওখানেই রয়ে গেল। আমাদেরও থাকতে হবে ওখানেই।

মাধবীও তা জানে।

তাই ফিরছে তারা আবার। মাধবীর দুচোখ জলে ভরে আসে। ক'মাস এখানে এসে ভালোই ছিল। গঙ্গাস্নান করতো—পূজাপাঠ, ভাগবত পাঠ শুনতে যেতো গঙ্গার ধারে দিনের শেষে। শান্ত এই জীবন ছেড়ে আবার সেই ফ্ল্যাট বাড়িতে যেতে হবে, মাপা কথা—মাপা চলাফেরা—আর নিঃসঙ্গতার মাঝে।

তবু যেতে হবে।

শিখার বাড়িতেও এসেছে মাধবী।

নিশীথ সেদিন কলেজ থেকে সকাল সকাল ফিরেছে। মাধবী শিখাকে বুকে টেনে নিয়ে বলে,

—তোকে সুখী করার জন্য এসব করেছি মা। স্বামীর ঘর বলে কথা। আনন্দে থাকবি। চিঠিপত্র দিবি মাঝে মাঝে!

শিখা মায়ের দিকে চাইল।

মা-বাবা ফিরে চলেছে বোম্বাই-এর সেই পরিবেশে। মনে পড়ে বান্দ্রার সমুদ্রতীর, নারকেল গাছ কাঁপা সেই জগৎ—মধু সাহানী, জাভেরী, পিন্টো—রীতা—কমলজিৎদের সঙ্গে হৈ চৈ করা কাতো দিনের কথা।

আজ সেই জগৎ থেকে শিখাকে নির্বাসিত করে এরা আবার ফিরে চলেছে সেখানে। সেখানে শিখার কোন ঠাঁই আর নেই।

শিখা-নিশীথ মাকে প্রণাম করে।

মাধবী বলে—কালই যাচ্ছি। পরে কলেজের ছুটি হলে শিখাকে নিয়ে বোম্বাই-এ আসবে নিশীথ।

নিশীথ দেখছে শিখাকে।

মা-বাবা চলে যাচ্ছে। নিশীথ শিখাকে আশ্বাস দেবার জন্যই যেন বলে,

—যাবো, একবার ঘুরে আসবো ওদিকে এই সামার-এর ছুটিতেই।

মাধবী খুশী হয়। বলে সে,

—তাহলে আজ চলি শিখা। কাল একসঙ্গে স্টেশনে যাবি কিন্তু।

নিশীথ তৈরী হচ্ছে বের হবে ইস্টিশনে। বৈকালে ট্রেন।

কলেজ থেকে ফিরে এসে দেখে শিখা শুয়ে আছে। মুখ-চোখ ম্লান।

শিখাকে দেখে শুধোয় নিশীথ,

—এখনও চুপচাপ শুয়ে আছো যে! স্টেশনে যাবে না?

শিখাও ভেবেছে কথাটা। আজ তাকে এভাবে দূরদেশে ফেলে রেখে ওরা সবাই চলে যাচ্ছে। মা বাবার এই ষড়যন্ত্রকে সে মেনে নিতে পারবে না।

চুপ করে থাকে নিশীথের কথায়। কি ভেবে বলে শিখা,

—শরীরটা ভালো নেই। তুমিই যাও—তোমার দায়ই বেশী!

কথাটার সুরে একটা জ্বালা ফুটে ওঠে, সেটা নিশীথেরও নজর এড়ায় না। নিশীথও লক্ষ্য করেছে ইদানীং শিখার কথার স্বরে কোথায় নীরব জ্বালা ফুটে উঠছে। এই জীবনে সে সুখী হতে পারে নি হয়তো, তাই এই জ্বালার প্রকাশ ঘটছে।

কিন্তু কেন তা জানার সময়ও নিশীথের নেই। তার নিজের পড়াশোনা—লেখাপত্র নিয়ে সকাল থেকেই পড়ার ঘরে আটকে থাকে। খেয়ে দেয়ে কলেজে বের হয়ে যায়। শিখা এমনিতেই বেলা করে ওঠে।

রান্নার—কাজ করার লোকজন আছে। আর এ সংসারের সব ভার আগে থেকেই রয়ে গেছে এ বাড়ির বাবার আমলের লোক ভূষণের উপর। ভূষণই সব দেখাশোনা করে।

শিখা কোনদিন খাবার টেবিলে যায় নিশীথের খাবার সময়, এই মাত্র।

নিশীথ কলেজে বের হয়ে যায়।

সন্ধ্যার দিকে কলেজ সেরে বই পাড়ায় যায়, দু'একজন প্রকাশকের ওখানে কাজ থাকলে, নাহলে ফিরে এসে আবার লাইব্রেরীতেই ঢোকে।

শিখাও দেখেছে নিশীথ কাজ নিয়েই ডুবে থাকে।

আজ নিশীথ বলে—ওরা চলে যাচ্ছেন, না গেলে কি ভাববেন ওরা ?

শিখা বলে—শরীর ভালো নেই। কাল তো দেখা হ'ল মা বাবার সঙ্গে! আজ তুমি গিয়ে ওদের বলে দিও।

মাধবী একটু অবাক হয়।

শিখা আসতে পারে নি। গোবিন্দবাবু ভাবনায় পড়েন।

—সে কি! শরীর খারাপ করে বসলো শিখার আজ? কেমন আছে?

নিশীথ বলে—না, না। তেমন কিছু নয়। একটু রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

মাধবী চুপ করে থাকে।

ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে। দীর্ঘ ক'মাস এখানে থেকে আবার ফিরে চলেছে ওরা। শিখাকে রেখে গেল এখানে। মাধবীর চোখ ছলছল করে ওঠে। গোবিন্দবাবু দেখছেন স্ত্রীকে।

—কি হল?

বৈকাল নামছে। রূপনারায়ণ পার হয়ে ট্রেনটা চলেছে দূর বোম্বাই-এর দিকে।

মাধবী বলে—ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে দিয়ে গেলাম!

গোবিন্দবাবু আশ্বাস দেন,

—থামো তো! নিজের ঘর—স্বামী ওসব নিয়েই ভুলে থাকবে শিখা। মেয়ের তো বিয়ে দিতেই হবে। পরের ঘরে পাঠাতে হবে। এ নিয়ে দুঃখ করে লাভ কি বলো! ওরা সুখে থাকুক—তাহলেই শান্তি।

মাধবী চুপ করে কি ভাবছে।

ট্রেনের গতিবেগ বেড়ে উঠেছে—দূরে আরও দূরে হারিয়ে যাচ্ছে স্নিগ্ধ শ্যাম দিগন্ত, সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকার নামছে।

নিশীথও একটু অবাক হয় শিখার এই ব্যবহারে। ইচ্ছে করেই শিখা মা বাবাকেও এড়িয়ে গেছে। নিশীথের মনে হয় মা বাবাকে কোথায় শিখা সহ্য করতে পারে নি।

নিশীথ ফিরেছে।

বলে সে—ওঁরা চলে গেলেন। মা বার বার তোমার নাম করছিলেন। বাবা শুধোলেন কি হয়েছে।

শিখা শোনায়—এত দরদ ছিল আমার জন্য তা তো জানতাম না। শুনে খুশী হলাম।

নিশীথ অবাক হয়।

—কি বলছো শিখা! তোমার বাবা মা—তোমার কথা ভাববেন না?

শিখা বলে—আর ভেবে কাজ নেই। সব ভাবনার দায় তো চুকিয়ে দিয়েছেন।

নিশীথ ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েছে, বাবার কাছেই মানুষ। বাবাও চলে গেছেন ক'বছর। এখন এতবড় পৃথিবীতে সে নিঃসঙ্গ—একা। সেই অভাবটা সে তবু অনুভব করে।

নিশীথ বলে—আমার বাবা মা নেই, তাদের অভাব আজও বোধ করি শিখা। তোমার আছে সব—তাই ওসবের মূল্য বোঝো না।

শিখা চাইলো ওর দিকে।

সবকিছু তার যেন বিষিয়ে গেছে। শিখা বলে,

—বাবা, মা—ওসবের স্বরূপ আমি চিনেছি। দয়া করে ওসব বিষয়ে আর কিছু না বলাই ভালো।

শিখা চলে গেল ওঘরে। নিশীথ দেখছে ওকে।

ওর মনের অতলে সেই জ্বালাটা ঠেলে উঠতে চায়।

তবু শিখা কোনমতে এই জীবনকে মেনে নিয়ে বাঁচার চেষ্টাই করে চলেছে।

নিশীথ বলে—পিসীমা ক'দিন থেকেই খবর পাঠাচ্ছেন, বিয়েতে

আসতে পারেন নি, শরীর ভালো নেই। তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন, চলো কালই ঘুরে আসি বারাকপুর থেকে।

নিশীথের পিসীমায়ের বাড়িটা বারাকপুরের গঙ্গার ধার ঘেঁসে। ওখানের পুরোনো বাসিন্দা ওঁরা। পিসীমা নিশীথের বিয়ের সময় যেতে পারেন নি। তাই নোতুন বৌকে নিয়ে আসতে বলেছে।

নিশীথের আপন বলতে ওই পিসীমাই।

তাই পিসীও আশা করেছিল নিশীথের বৌ তাদের সংসারের সব কিছুই বজায় রাখবে। লক্ষ্মীমন্ত বৌ হবে।

নোতুন বৌমার জন্য একজোড়া সোনার পাতে মোড়া লোহাও আনিয়েছে। সকাল থেকেই পিসীমা বাড়িতে হাঁক ডাক সুরু করেছে। নিজের বৌমাদেব শোনায়,

—ভালো করে রান্নাবান্না করো বাপু। বাছারা এসে খেয়ে দেয়ে যাবে। আর ভজনকে বলো বাজার থেকে দু'তিন রকমের মাছ কিনে আনুক। সধবা মানুষ মাছ ভাত খেয়ে যাবে। দই মিষ্টিও ভালো দেখে আনে।

বৌমা বলে—ওসব নিয়ে আপনি ভাববেন না মা।

পিসীমা বাইরে গাড়ির শব্দ পেয়ে দোতলার জানালায় এসে দাঁড়ালো। নিশীথরা এসেছে। গাড়ি থেকে নিশীথ আর বৌমা নামছে। এগিয়ে যায় পিসীমা।

দেখে একটু অবাক হয় পিসীমা!

শিখা দেখছে বয়স্কা মহিলাকে। ওর মুখ চোখের ব্যাকুলতা মুছে গিয়ে ফুটে উঠেছে কি বিস্ময়, হয়তো হতাশাই। পিসীমা দেখছে শিখাকে। মাথায় বব্ করা চুল—ঘাড়ের কাছে পড়েছে, ব্লাউজটাও খুবই ছোট—আর হাতের আবরণের কোন বালাই নেই। নিটোল মসৃণ হাত—বাহুমূল—দেহের অনেকটাই নিরাভরণ ঠেকে, তাতে নোতূন বৌ-এর শ্রী ফুটে ওঠে নি, ফুটে উঠেছে একটা বিকৃতিই। সিঁথিতে সিন্দুর আছে কিনা বোঝাই যায় না।

আর নিটোল হাতে শুধু ঘড়ি অন্য হাতে একগাছি বালা রয়েছে।

নিশীথও দেখেছে পিসীমার এই ভাবান্তর। এর মধ্যে নিশীথ পিসীমাকে প্রণাম করে ইঙ্গিতে শিখাকে প্রণামের কথা জানাতে সে কোনরকমে মাথা নুইয়ে প্রণাম করে মাত্র।

পিসীমা শুকনো গলায় বলে—থাক্-থাক্ বাছা। এসো।

শিখা এ বাড়ির বৌদেরও দেখেছে। বড় বৌ এসে কথাবার্তা বলে। শিখা জবাব দেয় মাত্র। কিন্তু ওদের আলোচনায়, ওই সংসারের ব্যাপারে শিখার বলার মত কোন অভিজ্ঞতাই নেই। এখানে এসে পদে পদে নিজেকে বেমানানই বোধ হয়।

দুতিনটে কচি বাচ্চা এসে দেখছে ওকে! একটি ছেলে সাহস করে এগিয়ে আসে। বলে সে,

—তুমি নতুন কাকীমা?

শিখা দেখছে ছেলেটিকে। ডাকে সে,

—হ্যাঁ! এসো!

ছেলেটা কাছে আসেনা। ওদিকে খেলার সঙ্গীদের ডাকে দৌড়লো।

বড় বৌ বলে—আমার ছোট ছেলে। দারুণ দুরন্ত!

শিখা চুপ করে থাকে।

পিসীমাই ওকে নোহাবাঁধাটা হাতে পরিয়ে দিয়ে বলে,

—এটা হাতে রেখো বাছা। এয়োতির লক্ষণ। শাঁখা পরোনা কেন? আর বাপু এমনি মেমসাহেবদের মত চুল রেখোনা—চুল এবার বড় হলে খোঁপা করে বাঁধবে, সিঁথিতে সিঁদুর দেবে। ঘরের বৌ বলে কথা, মেমসাহেবদের মত থাকলে চলে?

শিখা চুপ করে কথাগুলো শোনে। পিসীমা বলেন,

—ছেলে পুলে আসবে এরপর, মা হবে। সব ভার তো নিতে হবে!

শিখা দেখেছে ওই বৌদের ছেলেপুলেদের। বাড়িময় দাপাচ্ছে।

একটা ক্রিকেট বল এসে জানলায় লাগছে, ধুলোপায়ে সোফা টপকে দৌড়চ্ছে কোনটা, ওদিকের মেঝেতে একটা বাচ্চা বিকটস্বরে চীৎকার করছে।

মা রান্না ফেলে এসে বাচ্চা চাকরটাকে বকাবকি করছে। বাড়িতে ঝড় বয়ে চলেছে ওই ছেলেমেয়েদের জন্য। শিখা এই দৃশ্যটার সঙ্গে পরিচিত নয়।

ঘাবড়ে গেছে সে। বিরক্তি বোধ করে।

এমন মা হতে—তার ব্যক্তি স্বাধীনতা হারিয়ে সংসারের জোয়ালে নিজেকে জুততে সে রাজী নয়। এমন সংসার এমন মাতৃত্বের স্বপ্ন দেখতে ভয় পায় শিখা।

বের হয়ে আসছে ওরা দুজনে।

নিশীথ শুধোয়—পিশীমাকে কেমন লাগলো? খুব ভালোবাসেন আমায়।

শিখা বাইরে গাছগাছালি, নোংরা ইট ভাটার দিকে চেয়ে থাকে। ধোঁয়া ধুলোয় ভর্তি এই জগৎ। বলে শিখা,

—আর এমন কোথাও আসবো না!

—কেন? অবাক হয় নিশীথ। তার মনের সব সুরটিকে ছিঁড়ে খুঁড়ে দিয়েছে শিখা। পিশীমার কাছেই মাঝে মাঝে আসে নিশীথ। শিখার ওই মন্তব্যে তাই বিস্মিত হয়েছে সে।

শিখা বলে—ওরে বাব্বাঃ ওই মাস্টারি সইবে না। একেবারে দজ্জাল শাশুড়ীর মত উপদেশ দিতে যা শুরু করলেন। এটা নাই কেন—ওটা করোনি কেন? মেমসাহেবদের মত চুল রাখবে না—হরিবল্।

হাসছে নিশীথ। শিখা ওর এতবড় বিপর্যয়ে নিশীথকে ওভাবে হাসতে দেখে বলে—তুমি হাসছো? মজা লাগছে তোমার—আমাকে বিপদে ফেলে সবাই মজা দেখছো তা জানি। কিন্তু বলতে পারো কি দোষ করেছি আমি তোমাদের কাছে?

নিশীথ অবাক হয়ে দেখছে শিখাকে।

কি উত্তেজনায় গলা চড়িয়ে হঠাৎ শিখা কেঁদে ফেলে। দুচোখে জল নামে ওর।

নিশীথ বলে—এ্যাই শিখা! না-না। তোমাকে দুঃখ দেবার জন্য ওসব কথা বলিনি। বিশ্বাস করো। প্লিজ এই লক্ষ্মীটি!

শিখা গুম হয়ে বাড়ি ফিরছে।

নিশীথের সঙ্গে সারাপথ আর কথা হয় নি। ঘরে ঢুকে ওই বেশবাস ফেলে দিয়ে সহজ হয়ে হাউসকোট পরে বসার ঘরে এসে বসলো। ভূষণ কফি এনেছে।

সেও দেখছে ওকে। হাউস কোট পরে কাঁধ অবধি চুল ফেলে কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে ঘরের বৌ।

নিশীথও দেখছে তাকে। ভূষণের চোখে ঘরের বৌ সম্বন্ধে এই অপরিচিত রূপের বিস্ময়টাও দেখেছে! নিশীথ বলে,

—রাতে সকাল সকাল খেতে দিতে হবে ভূষণদা!

ভূষণের গলা শোনা যায়—হ্যাঁ। দেখছি।

চলে গেল ভূষণ। শিখা হাতের সেই নোহাটাও খুলে ফেলেছে। নিশীথ দেখেছে সেটা, তবু চুপ করেই থাকলো। শিখারও ওদের চোখে মুখের পরিবর্তনটা নজর এড়ায় নি। শিখা বলে—ওই ভূষণও মাঝে মাঝে উপদেশ দেয়, বুঝলে! চাকর হয়ে বাড়ির মনিবকে মানে না!

নিশীথ বলে অনেকদিন আছে। আমাকে ও মানুষ করেছে।

শিখা শোনায়—সো হোয়াট! চাকরবাকরকে লাই দিয়ে তুমিই মাথায় তুলেছো। এসব ভালো নয়।

শিখা নিজে কিছুই করে না ঘরের কাজ। ঝি-চাকর আর ওই ভূষণকে তাই দরকার। তার অখণ্ড অবসর কাটে বই পড়ে। সস্তা ইংরাজী পেপারব্যাক না হয় কোন হালকা বই।

কথাটা নিশীথই বলে—বি-এ পাশ করেছো, এখানের ইউনি-

ভার্সিটিতে ভর্তি করার চেষ্টা করি, যদি বলো। বাড়িতে কাজকর্ম ওরাই দেখছে, এম. এ.-টা করে নাও।

শিখা চাইল নিশীথের দিকে।

শিখা বোম্বাই কলেজের দিনগুলো মনে করতে পারে, সেখানে উদ্দাম হাওয়ার মত কেটেছে তার কতো দিন। কলেজ যেতো ওই বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারার জন্যই। পরিবেশ ছিল স্বতন্ত্র। কে জানে মধু সোমানী, রীতা—কমলজিৎ—পিন্টো, জাভেরীরা পাশ করেছে ইউনিভার্সিটিতেই গেছে বোধহয়। সেখানে হৈ—চৈ করছে তারা।

এখানে তার চেনা জানা কেউ নেই, সব নোতুন—অচেনা। এই আগ্রহ তার নেই।

শিখা বলে—দেখি ভেবেচিন্তে।

নিশীথ বলে—এত ভাববার কি আছে। বি-এ.-তে ভালো রেজাল্ট করেছো, চেষ্টা করলে এম-এ.-তে সিট পাবে। তবু সময়টা কাটবে একটা কিছু নিয়ে।

শিখা বলে ওঠে দেখি ভেবে। আজ মার্কেটিং-এ বেরুতে হবে।

নিশীথ চাইল শিখার দিকে।

কেন জানে না শিখা ওই পড়ার ব্যাপারটায় তেমন গুরুত্ব দিতে চায় না। হালকা ভাবেই কথাটা নিয়েছে সে।

নিশীথ দেখেছে ওই পড়াশুনার চেয়ে শিখার বেশী আগ্রহ ইংরাজী সিনেমা দেখার, আর নিউমার্কেটে গিয়ে কেনাকাটা করে আনে যখন তখন।

তবু চুপ করেই থাকে নিশীথ।

শিখা বলে—আজ তোমাকে কলেজে পৌঁছে দিয়ে গাড়ি নিয়ে নিউমার্কেটে যাবো।

নিশীথ হালকা স্বরে বলে—ঠিক আছে। তবে পড়ার ব্যাপারে রাজী থাকলে ফর্ম আনবো, ওটা ফিল্ আপ্ করে দিও।

…শিখা বের হয়েছে মার্কেটে। মাসীমাদের ওখানে বড় একটা যায় না। ছু'একদিন ইলা আসে। আজ ইলাও সঙ্গী হয়েছে তার।

ছুপুরের চৌরঙ্গীপাড়া—নিউমার্কেটে একটা ঢিলেঢালা ভাবই থাকে। শিখা আর ইলা চলেছে মার্কেটে।

—শাড়ি ছুখানা দেখে পছন্দ করে শিখাই। ইলা বলে,

—এতো দাম বৌদি! নশো টাকা!

শিখা পার্শ খুলে দাম মিটিয়ে বলে—কিছু দরজার কার্টেন, ব্রোকেডের পর্দা কিনতে হবে। কিছু ফুড-স্টাফ—

ইলা হাসে।

—সারা বাজার কিনবে নাকি বৌদি। দাদাকে এবার ফতুর করবে দেখছি।

শিখা কথাটা শুনে চাইল ওর দিকে। বলে সে,

—আমাকে ফতুর করেছে কারা সে খবর রাখো ইলা?

ইলা চাইল শিখার দিকে। এ খবর ইলার জানার কথা নয়। সে দেখেছে ওদের বাইরের রূপটাকে। নিশীথদাকে চেনে ইলা। তাই বলে সে—নিশীথদা কিন্তু ভালো লোক বৌদি। তাকে ভুল বুঝো না।

চুপ করে যায় শিখা।

একরাশ ব্রোকেড খুলিয়ে সেগুলো পরীক্ষা করছে শিখা।

ওদিককার পালা চুকিয়ে বলে শিখা।

—গরমে নেয়ে গেছি। এখানে যা ভ্যাপ্‌সা গরম। বোম্বাইএ এত ঝলসানো গরম নেই। তিনদিকে সমুদ্র, বাতাস তাই ঠাণ্ডা। চলো একটু কোল্ডড্রিংক খেয়ে নিই।

ড্রাইভারের জিম্মায় গাড়িতে মালপত্র রেখে ওরা ওপাশের রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকেছে। এয়ার কন্‌ডিশনড্‌ ঘরটা। হিমহিম পরিবেশ এখানে। আলোগুলোকে ইচ্ছা করেই ম্লান করে রাখা হয়েছে শেড লাগিয়ে যাতে চোখে না লাগে। এগিয়ে চলেছে শিখা আর ইলা।

অনেকদিন রেস্তোরাঁয় আসেনি। এসব জায়গায় এলে শিখার ফেলে আসা বোম্বাই, সেখানের বন্ধুবান্ধব সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে তার।

—হাই শিখা!

হঠাৎ কার ডাকে চমকে ওঠে শিখা। সুদূর আরবসাগরের তীর থেকে কে যেন ডাকছে তাকে, ডাকছে হারানো অতীত থেকে বর্তমানের এই কঠিন ঊষরতায়।

চাইল সে! এগিয়ে আসছে মধু সোমানি। মাথায় আধুনিক স্টাইলের কাকের বাসার মত চুল একরাশ, ইয়া জুলপি। গলায় চেন ঝুলছে, গেঞ্জির বালাই নেই। খোলা জামার মধ্য দিয়ে বুকের রোমশ ভাবটা ফুটে উঠেছে।

ইলা দেখছে ভদ্রলোককে।

শিখাও চমকে ওঠে—ইউ সিলি বয় মধু!

এ যেন অন্য শিখা। চঞ্চল—উচ্ছল হঠাৎ বদলে গেছে সে।

মধু চেয়ার টেনে বসালো ওদের। এতক্ষণে খেয়াল হয় শিখার। শিখা বলে— মধু মিট মাই সিস্টার ইলা, ইলা দিস ইজ মধু সোমানি। আমার ক্লাশ মেট ফ্রম বোম্বে। মধু নমস্কার করে মাথা নুইয়ে।

মধুও অনেকদিন পর হারানো শিখার খোঁজ পেয়ে বলে,

—শুনেছিলাম তুমি কলকাতায় এসেছো? বহুত দিন পর দেখা! লেট আস্ সেলিব্রেট! বয়—

মধু সোমানি খুশির চোটে চিল্‌ড বিয়ারের অর্ডার দিতে যাবে, বাধা দিল শিখা। ইলার সামনে ওসব সে আনতে চায়না। শিখা বলে—লেট আস্ হ্যাভ সাম্ কোল্ড ড্রিঙ্কস। বয় এ্যাপেল জুস তিন্‌টে!

মধু সোমানী পাশ করে বাবার ব্যবসায় নেমেছে। ওখানেও বেশ বাড়াবাড়ি করছিল সে, তাই তার ব্যবসায়ী পিতৃদেব ছেলেকে কলকাতায় তাদের আপিসে পাঠিয়েছে এখানের ব্যবসাপত্র দেখতে।

মধু সোমানী এখানে এসে কিছু নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। বিলাস-

ব্যসন, অর্থের কোন অভাব নেই। তবু কেমন একা পড়ে গেছে। বোম্বের সেইসব বেপরোয়া বন্ধুরা নেই।

হঠাৎ তাই শিখাকে দেখে খুশি হয়েছে।

ইলা এই পরিবেশে কেমন বেমানান। দেখেছে মেয়েদের স্ল্যাকস শার্ট, নাহয় মিনি স্কার্ট পরে জোড়ায় জোড়ায় বসে গল্প হাসিতে মশগুল হয়ে আছে। ওদের উদ্দাম হাসির শব্দ শোনা যায়। কোন মেয়ে দিব্যি ছেলেদের মতই সিগ্রেট ফুঁকে চলেছে।

শিখা আর ওই ভদ্রলোক কি কথায় মশগুল।

ইলার ডাকে খেয়াল হয় শিখার।

—বৈকাল হয়ে গেছে শিখাদি নিশীথদাকে চারটের সময় কলেজ থেকে নিয়ে যাবার কথা ছিল।

শিখাও সেসব কথা ভুলে তন্ময় হয়ে গেছিল। মধু সোমানীর খেয়াল হয়। তাকেও আপিসে ফিরতে হবে। মধু বলে—আজ চলি শিখা, হিয়ার ইজ মাই কার্ড—স্মাল মিট এগেন!

শিখারাও উঠে পড়ে।

তখন বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। কয়েক ঘণ্টা কোন্ দিকে কেটে গেছে সে খেয়াল করেনি। ইলা বলে।

—দেরী হয়ে গেল। মা জানেনা তোমার সঙ্গে এসেছিলাম! একটু বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাবে শিখাদি।

—ঠিক আছে। শিখার মেজাজটা আজ খুব হাসিখুশিই। ইলা শুধোয় ওই দেড়েল ভদ্রলোককে আগে চিনতে না?

শিখা চাইল ইলার দিকে।

ইলা বুঝেছে আগে থেকেই ওরা ঘনিষ্ঠ। তবু কিছু জানতে চায় ওই মধু সোমানীর সম্বন্ধে।

বলে ওঠে শিখা—আমাদের মহল্লাতেই ওদের বিরাট বাড়ি বোম্বাই-এ। বিরাট ব্যবসাদার, এখানে এসেছে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

ইলাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল শিখা। বাসন্তীও ওকে দেখে নেমে আসে। বলে সে,

—আসবিনা শিখা ?

শিখা বলে, দেরী হয়ে গেছে মাসিমা। আজ চলি। চলো—

গুণ গুণ গানের সুর তোলে শিখা। গাড়িটা ওকে নিয়ে বের হয়ে গেল। বাসন্তী দেখছে শিখাকে। হঠাৎ আজ অনেকদিন পর মেয়েটার মুখেচোখে দেখেছে খুশির আভাস। ওর গুণগুণ সুরও শুনেছে। শিখার পরিবর্তনটা বাসন্তীরও নজর এড়ায় না।

বলে সে—সুখেই আছে মেয়েটা। তখন বিয়ের আগে যা কাণ্ড বাধিয়েছিল।

ইলা মায়ের দিকে চাইল। মায়ের মন্তব্যে কোন জবাবই দিল না। তবু ইলা কেন জানেনা রেস্তোরাঁয় মধু সোমানীর দেখার প্রথম মুহূর্তটা ভোলেনি।

তারপর থেকেই একেবারে বদলে গেছে শিখাদি। ইলা উপরে উঠে গেল।

ট্রামে বাসের ভিড়ে ওঠারও উপায় নেই। লাইব্রেরী থেকে বেশ কিছু ভারি ভারি বইও নিয়েছে নিশীথ। তার পড়াশোনার কাজে দরকার। নোতুন বইটা লিখছে ভারতীয় সভ্যতার ক্রম-বিকাশের উপর, তার জন্য কিছু রেফারেন্স বই নিয়েছে, হাতে বইগুলো, ফোলিও ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শিখার মার্কেটিং সেরে ফেরার কথা তিনটে সাড়ে তিনটের মধ্যে। কিন্তু ওদের দেখা নেই। গাড়িও আসে না।

ক্লাস সেরে অধ্যাপক বন্ধুরা চলে গেছে, ছাত্রছাত্রীরাও বের হচ্ছে। নিশীথ একপাশে ওদের এড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সিগ্রেট ফুঁকতে ফুঁকতে হুল্লোড় করে চলেছে ছেলে মেয়েরা। নিশীথ দেখছে ওদের।

কে বলে ওঠে—এন্ বি গাধার বোঝা নিয়ে বৌএর পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে রে!

নিশীথ ব্যানার্জিকে ওরা ওই নামেই ডাকে। কে একজন বলে ওঠে—যা লাট্টুমার্কা বউ ওর—দেখগে কোথায় কার সঙ্গে ভিড়ে পড়েছে। ও বেচারা হা পিত্যেশ করে আছে এদিকে।

হাসির ধুম পড়ে।

একজন মেয়ে ধমকে ওঠে—ভ্যাট!

ছেলেদের কে একজন লম্বা পাকানো চেহারা নিয়ে বলে মেয়েটিকে—তোদের কাণ্ডই এমনি। ওদিকে যোগেশ ব্যাটা তোর জন্যে বুক চাপড়াচ্ছে আর তুই বিজনের সঙ্গে জমেছিস লিলি!

নিশীথ ওদের দেখে সরে যায় গেটের ওদিকে। ওদের কথাগুলো তবু কানে আসে। তীক্ষ্ণ হাসির শব্দ সারা মনে জ্বালা ধরায়। রাগ হয় শিখার উপরই।

ট্যাক্সি পাবারও চেষ্টা করছে। কিন্তু কলকাতার ট্যাক্সি-ওয়ালারা কোথায় যাত্রী ধরে কে জানে, খালি ট্যাক্সি নিয়ে দৌড়চ্ছে ওর ডাকে সাড়া না দিয়েই।

গলদঘর্ম হয়ে গেছে নিখিল বোঝা নিয়ে।

শেষকালে এক ছাত্রই উদ্ধার করে। নিশীথকে দেখে বলে।

—আমাদের গাড়ি এসেছে স্যার, আপনি তো ওদিকেই থাকেন নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। এখন কিছুই পাবেন না।

নিশীথ বলে—আমার গাড়ি আসার কথা।

ছেলেটি জানায় কোথায় জ্যামে পড়েছে নাহয় কিছু বিগড়েছে গাড়ির তাই আটকে গেছে। চলুন স্যার।

নিশীথ বাড়ি ফিরেছে। ভূষণই দরজা খুলে দেয়।

নিশীথ গাড়িটা না দেখে শুধোয়—বৌদি আসেনি?

—না তো! তোমাকে নিয়ে ফেরার কথা! ভূষণও ভাবনায় পড়ে।

বলে সে—পথে কোন কিছু হয়নি তো? বার বার বলি বৌদিকে একা বের হয়োনা। কলকাতা শহরে কোথায় কি হয় কখন!

নিশীথ ভূষণকে ভাবতে দেখে বলে,

—ঠিক ফিরবে, কোথায় গেছে হয়তো মার্কেটিং সেরে।

ভূষণ শোনায় ওই এক নেশা। কেনাকাটাই চলছে। দরকার নাই তবু এত এত টাকা নষ্ট করতে হবে। তুমিও কিছু বলবে না।

নিশীথ ভূষণের দিকে চাইল।

বয়স হয়েছে ভূষণের। চুলে পাক ধরেছে, তবু শরীরটা মজবুত আছে বলে বয়সটা ঠিক বোঝা যায় না। এ বাড়ির অনেক কিছুই দেখেছে সে। নিশীথ বলে,

—ও নিয়ে তুমি কিছু বলো না ভূষণদা। যা বলার আমিই বলবো।

ভূষণ ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে,

—আমার বলার কি দরকার! তবে তোমাকে বলছি খোকা একটু সমঝে চলতে বলো। এত দরাজ হাতে শ'দরুণে ঘটা করা ঠিক নয়। সংসারের আসল ঘটা এখনও বাকী!

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চাইল নিশীথ। চমকে ওঠে সে। ফিরেছে শিখা—আর শিখাও বারান্দায় উঠে ওদের সব কথাই শুনেছে। খুশীভরা মন নিয়েই ফিরছিল, হঠাৎ বাড়িতে পা দিয়ে ভূষণকে ওই সব কথা বলতে শুনে শিখা দপ্ করে জ্বলে ওঠে। বাড়ির চাকর তাকে নিয়ে এসব মন্তব্য করবে, আর নিশীথও দাঁড়িয়ে এসব কথা শুনছে, মেনে নিচ্ছে চাকরের কথাগুলো, শিখার সম্বন্ধে ওই কথার কোন প্রতিবাদই করেনা নিশীথও।

শিখা রাগে যেন ফেটে পড়বে, কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

পিছনে ড্রাইভারের হাতে রাশি প্রমাণ কাপড়চোপড়, পর্দার কাপড়ের থান, আরও কি সব। মালপত্রগুলো দেখে চাইল ভূষণ। নিশীথও। শিখা লক্ষ্য করেছে নিশীথের বিরক্তিভরা চাহনিটা।

ভূষণ বের হয়ে গেল, শিখা ড্রাইভারকে বলে,

—এগুলো রেখে যাও!

ঘরটা থমথমে। নিশীথের সামনে দাঁড়িয়ে আছে শিখা। নিশীথ ওর কথায় চাইল। শিখা বলে,

—কিছু বলবে ?

নিশীথ শোনায়—বলার কিছুই নেই।

ওর কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠেছে বিরক্তি আর কাঠিন্য। তবু এই ্যাপারটাকে এড়িয়ে যেতে চায় সে। শিখা বলে,

—একটু আগে কিন্তু অনেক কথাই বলছিলে, আবও বিশ্রী াগে তোমার চাকর ওই ভূষণও আমার সম্বন্ধে এসব কথা বলে ার তুমি তাকে সমর্থন করো। অথচ সামনে সে সব কথা আমাকে লতে তোমার লজ্জা করে।

নিশীথ চাইল শিখার দিকে। সামনে হাজার দেড়েক টাকা মপব্যয় করার প্রমাণ হিসেবে পড়ে আছে ওই কাঁপড়গুলো।

নিশীথ আজ স্ত্রীর কথায় বলে,

—এসব কথা বলতে আমি চাইনি শিখা, ভেবেছিলাম তোমার ংসারে তুমিই হিসাব করে চলবে। আয় মতই খরচ করবে। কিন্তু এমনি অপচয় করলে সেটা জোটাবার সাধ্য আমার নেই এই কথাটাই শুধু বলতে চাই আজ। এটাই বলেছিল ভূষণ, শুধু চাকরই য়— সে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী তাই। তাকেও ভুল বুঝোনা।

শিখা দপ্ করে জ্বলে ওঠে ওর কথায়।

বলে সে—অপচয় করেছি ? ঠিক আছে—ও টাকা আমি যেখান থকে হোক, যেভাবে হোক তোমাকে মিটিয়ে দেব। আর ভবিষ্যতে াতে তোমার কাছে হাত না পাততে হয় সেই চেষ্টাই করবো।

কথাগুলো বলে বের হয়ে গেল শিখা, রাগলে সে চীৎকার করে ঠে। বোম্বাই এর বাড়িতেও সেই রাগের মূর্ত প্রকাশ দেখেছে ার মা বাবা। শিখা প্লেট-শশারও ছুড়ে বসে রাগের মাথায়।

আজ ওই রাগের বহিঃপ্রকাশ তার ঘটেনা। কিন্তু মনে মনে স একটা পথ খুঁজে নেবার সিদ্ধান্তই করেছে।

—নিশীথ স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলে,

—ওকথা উঠছে কেন ? ভবিষ্যতে যাতে হিসেব করে চলো, সইটাই বলছিলাম।

শিখা সে কথা শোনার জন্য আর নেই ও ঘরে। সে চলে
গেছে তার ঘরের দিকে, রাগে ওর মুখ চোখ টসটসে হয়ে গেছে।

শিখাও বুঝেছে এমনি একটা সংঘাতের মুখোমুখি হতে হবে
তাকে। তাতেও পিছোবে না সে। তার নিজের ব্যক্তিসত্বার এই
প্রাধান্য স্বাতন্ত্রকে সে শেষ হতে দিতে পারবে না।

রাত্রি নামছে।

শান্ত হয়ে আসে শহরের কোলাহল। কুয়াশামাখা আকাশের
বুকে দু'একটা তারার নিশানা জেগে ওঠে। ঝিঁঝিঁ ডাকে বাগানের
গাছে গাছে।

জেগে আছে শিখা।

ঘুম আসে না তার। বারবার অশান্ত মনের কি জ্বালা ওকে
প্রতিবাদের কাঠিন্যে চঞ্চল করে তোলে। নিশীথ তখনও
লাইব্রেরীতে।

শিখা অবাক হয়, মানুষটা তার লেখার মধ্যে ডুবে গেছে।

মনে হয় ওই নিশীথকে চিনেছে সে ক্রমশঃ, কঠিন নির্মম একটি
মানুষ। অন্য কারো দিকে চাইবার অবকাশ, প্রয়োজন তার
নেই। আঘাতই দিতে পারে সে, আঘাত আর অবহেলা।

শিখার মনে হয় সকলে মিলে তাকে শুধু ঠকিয়েছে। সেও এর
জবাব দেবে।

···মাধবী বোম্বাই এ ফিরেছে, আবার এই শহরের ভিড়ে নিজের
সংসারের চাপে ভুলে গেছে কলকাতার কথা। তবু ভেবেছিল বড়
ছেলে শ্যামল হয়তো তার ভুল বুঝবে, প্রেমের নেশা কেটে যাবে—
ঘরে ফিরবে সে।

আশা ছাড়েনি মাধবী।

কিন্তু সেদিন শ্যামলের কথায় চাইল ওর দিকে।

ছুটির দিন। সংসারের কাজের তাড়া আজ কম। মাধবী
বলে।

—ওগো খার মার্কেট থেকে মাছ ফাছ একটু ভালো দেখে আনো। ওই পমফ্রেট, কার্লা—ভেটকি নয়, রুইমাছ আনবে।

গোবিন্দবাবু সকালে মর্ণিংওয়াকের জন্য মাঝে মাঝে বাজারও করে আনেন। কিছুদিন থেকে শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। তবু সকালে এদিকটা সুন্দর। নির্জন। বাংলোগুলোতে অনেক গাছ-গাছালি। পথটাও ফাঁকা—গাড়ির ভিড় নেই। সকালের হাওয়াটা স্নিগ্ধ। বেড়াতে ভালো লাগে।

কিন্তু কদিন থেকে প্রেসার বেড়েছে।

তাই বলেন—সুশান্ত যাক। শরীরটা ভালো নেই।

সুশান্ত হাঁক পাড়ে—আমার কলেজের খেলা আছে মা, বড়দার ছুটি ওই যাক!

সে বের হয়ে যায় কিড্ ব্যাগটা নিয়ে। মাধবী গজ গজ করে। য যার পথ দেখবি তাতো জানি! দেখি ওকি বলে।

শ্যামল বের হবার জন্য তৈরি হচ্ছে, মাকে দেখে চাইল। মাধবী শুধোয়—এত সকালে বের হচ্ছিস কোথায়?

শ্যামল মায়ের কথায় বলে—কাজ আছে মা! নোতুন ফ্ল্যাটের পজেশন পেয়েছি। ওটাতে কিছু কাজকম্মো করাতে হচ্ছে। মিস্ত্রী আসবে, হীরাও এসেছে ওখানে।

মা চাইল ছেলের দিকে। ওরা ফ্ল্যাট পেয়ে গেছে একবারও তা জানায় নি বাড়িতে।

শ্যামল বলে—আজ বাড়িতে খাবো না মা, ওখানেই খেয়ে নেব।

মাধবী ক্রমশঃ অবাক হচ্ছে।

শ্যামল বলে—আর বিয়েটা সামনের মাসেই চুকিয়ে ফেলতে হবে মা। হীরার বাড়ি থেকেও চাপ দিচ্ছে।

গোবিন্দবাবুও এসে পড়েছেন। ছেলের সব কথাই শুনেছেন তিনি। বের হয়ে গেছে শ্যামল। মাধবী ছেলের কথার উপর একটি কথাও বলতে পারে নি। স্বামীকে বলে,

—শুনলে শ্যামলের কথা! ফ্ল্যাট পেয়েছে—বিয়ে করবে সামনের

মাসে। এসব কথা কিছুই জানায় নি। আজ আমরা ওর কেউ নই?

গোবিন্দবাবু বিবর্ণ মুখে স্ত্রীর দিকে চাইলেন।

বলেন তিনি—ও নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই বড়বৌ। ওরা সুখে থাকার জন্য ওসব করেছে, করতে দাও। বাধা দিলে তিক্ততা বাড়বে মাত্র।

সংসারের সাজানো গাছের একটা একটা করে ফুলভরা সবুজ ডাল ভেঙ্গে পড়ছে। মাধবী অনেক আশা নিয়ে বাঁধতে চেয়েছিল সবাইকে কেন্দ্র করে। কলকাতায় তার ছোটদির সংসারের কথা মনে পড়ে। বৌমা—নাতি-পুতি ছেলেমেয়েদের নিয়ে কেমন সবাই একসঙ্গে বেঁচে আছে।

তার সংসারে এসেছে ভাঙ্গনের সাড়া।

বাধা দেননি গোবিন্দবাবুও। নোতুন ফ্ল্যাটে শ্যামল হীরার বিয়ে হয়ে গেছে। কোন স্কুল-এর হল ভাড়া নিয়ে ডেকেরেটার দিয়ে সাজিয়ে বিয়ের বৌভাতও হয়েছিল 'বুফে ডিনার'-এর আয়োজন করে। এরা বৌভাত বলে না, বলে 'রিসেপসন'। স্কুলের ময়দানে টেবিল সাজিয়ে খাবার দাবার রাখা—অতিথিরা প্লেট নিয়ে আপন পছন্দমত খানা খেয়ে চলেছে।

ওদের একজনের মতই বসে আছেন গোবিন্দবাবু, মাধবী আসতেই চায়নি। বলে সে—ওইখানে নাইবা গেলাম।

তবু আসতে হয়েছে তাকে।

দেখেছে নোতুন বউমা হীরাও সেজেগুজে অতিথিদের সঙ্গে হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

মাধবীর কাছে এই উৎসব মনে হয় কি বেদনায় বিবর্ণ। শেষ হয়ে গেছে উৎসব। অতিথিরা ঘরে ফিরে গেছে। আলোকসজ্জা নিভে গেছে।

শ্যামল হীরারা চলেছে তাদের নিজের ফ্ল্যাটে। সেখানেই ধুচন্দ্রিকা যাপন করবে।

দাঁড়ালো গোবিন্দবাবু—মাধবীকে বলেন।

—চলো।

মাধবীর খেয়াল হয়। বড় ছেলেও আজ ঘর ছেড়ে চলে গেল। ারিয়ে গেল তার সংসার থেকে একজন, যাকে এতদিন ধরে মানুষ ারেছিল।

প্রশান্ত ট্যাক্সি এনেছে।

চুপ করে উঠলেন গোবিন্দবাবু, মাধবীও উঠেছে। হঠাৎ গাবিন্দবাবুর বুকের ভিতর যেন একটা তীব্র যন্ত্রণা বোধ হয়, মুখ বৈর্ণ হয়ে গেছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, বুকের ভিতর একটা মাট অস্বস্তির ভাব!

মাধবী চমকে ওঠে—কি হ'ল?

প্রশান্তও অবাক হয়। বাড়ি নয়, ওরা ওপাশে নানাবাতি সপিটালের দিকেই ট্যাক্সি নিয়ে ছুটে চলেছে।

…কয়েকদিন যমে মানুষে টানাটানি চলেছে। খবর পেয়ে লকাতা থেকে এসেছে শিখা আর নিশীথও! প্রশান্ত তার বন্ধু-ান্ধব মায় তার সিনিয়ার নামকরা অ্যাডভোকেট মিঃ পার্শেকরও াসেন।

কিন্তু গোবিন্দবাবুকে বাঁচান যায় না।

এক বিষণ্ণ অপরাহ্ণে মাধবীর দুচোখে জল নামে। সেই সন্ধ্যার ার থেকে জ্ঞান আর ফেরেনি গোবিন্দবাবুর।

বহু বছর আগে বাংলার কোন নদীতীরের আম কাঁঠাল-এর ায়াঘেরা গ্রাম থেকে এসেছিল একটি তরুণ। কলকাতা, দিল্লী ানা ঠাঁই ঘুরে এসে আশ্রয় পেয়েছিল আরব সমুদ্রতীরেব এই াহরে। পথহারা সেই তরুণ যৌবন-বার্ধক্য পার হয়ে আজ হারিয়ে গল কোন দূর অজানায়।

শিখা এসেছে অনেকদিন পর।

বাবার কাজকম্মো চুকতে একটু সহজ হয় সে। ক'দিন পর বের হয়েছে রীতার ওখানে।

বোম্বাই এর জীবনযাত্রায় কোন স্তব্ধতা নেই। শোকের মালিন্য তাই মুছে গেছে শিখার মন থেকেও। তার নিজের জীবনের বিরক্তি আর বঞ্চনার কথা মনে পড়ে।

বান্দ্রার কার্টার রোডের নীচের পাথরে পাথরে এসে আছড়ে পড়ে জোয়ারে ফুলে ওঠা সমুদ্র। ওদিকের বড় বাড়ির পাঁচতলার ফ্ল্যাটে তখন হৈ চৈ চলেছে।

শিখাকে দেখে চমকে ওঠে রীতা।

—হাই শিখা! হোয়াট নিউজ অব্ ক্যালকাটা? কাম অন্!

ওদের আড্ডা জমে ওঠে।

রীতার এখানে কি পার্টি চলেছে, এগিয়ে আসে জাভেরী, পিন্টো। শিবদাসানি এখন ব্যবসায় নেমে ধুলোমুঠো ধরছে, সোনামুঠো হচ্ছে। সিঙ্গাপুর-এর সঙ্গে চালু কারবার, ওদিকে ইউরোপেও তার এক্সপোর্ট চলছে।

শিবদাসানি মদের গ্লাসটা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসে।—উই মিস্ ইউ শিখা! মোস্ট গ্ল্যাড টু মিট ইউ!

শিখা দেখেছে তার ফেলে যাওয়া সেই সমাজে এখনও কিছু উত্তাপ রয়ে গেছে। আর এরা বসে নেই, এগিয়ে চলেছে দ্রুত জীবনের ছন্দের সমতালে পা ফেলে ফেলে। এই জগতের স্বপ্নই দেখেছিল শিখা।

কমলজিৎ বলে—কি করছো শিখা ওই রটন্ কলকাতায় পা পড়ে। কাম টু বোম্বাই সোনি।

শিবদাসানি শোনায়।

—ওয়েল কাম টু বোম্বে শিখা। এখানে আমার ফার্মে লিয়ায়জঁ অফিসার হয়ে যাবে। আই স্যাল বি গ্ল্যাড টু ওয়া টুগেদার।

শিখা ভাবছে কথাটা।

রীতা বলে—কিছুই নাওনি শিখা। হ্যাভ কাম ড্রিঙ্ক! জাস্ট এ ড্রপ অব শ্যাম্পেন।

শিখা কলকাতায় বিশেষ এসব খায় না। এর মধ্যে মধু সোমানির ফ্ল্যাটে দু'একবার গেছে। সামান্য দিন খেয়েছে মাত্র, তাও মুখের গন্ধ যাতে না ওঠে তাই সাবধানে থেকেছে।

নিশীথ নেই।

তিনদিনের জন্য অজন্তা ইলোরা দেখতে গেছে, সেই অবসরে আজ শিখা এসেছিল তার হারানো জীবনের সন্ধানে। কি যেন সাড়া আছে এই সমাজে, ওই সফেন পানীয়ের মধ্যে! শিখা তার মনের এতদিনের বঞ্চনাটাকে ওই পানীয়ের উত্তাপে ভুলতে চায়।

বিদেশী জাজ'এর মাদকতা, পুরানো বন্ধুদের কোলাহল, সেই পরিবেশে শিখা এতদিন পরও নিজেকে আবার ফিরে পায়।

সন্ধ্যা নামছে।

প্রশান্ত কোর্ট থেকে এসে জরুরী কাগজপত্র নিয়ে ওর সিনিয়ারের বাড়িতে গেছে কি পরামর্শের জন্য।

সুশান্তও ফেরে নি। কোথায় খেলার জন্য আটকে গেছে। একা নিঃসঙ্গ মাধবীর কাছে বাড়িটা শূন্য মনে হয়। শিখাও বের হয়ে গেছে সকালে, এখনও ফেরে নি।

মা ভেবেছিল শিখা বদলাবে কলকাতার ওই পরিবেশে। নিশীথও ভালো ছেলে। দুজনে সুখী হবে। কিন্তু মায়ের চোখে শিখার মনের সেই শূন্যতাটা এড়িয়ে যায় নি। নিশীথ এদিকে খুবই ভদ্র, সে তবু মানিয়ে নিয়ে চলেছে চুপ করে। কিন্তু শিখার দিক থেকে সেই মনোভাব নেই তা বুঝেছে মাধবী।

নিশীথ শিখাকে নিয়েই অজন্তা ইলোরা যেতে চেয়েছিল।

নিশীথ বলে—চলো, একটু ঘুরে আসি ক'টা দিন।

মাও বলে—তাই যা শিখা।

'শিখা বলে ওঠে—ওই পাহাড়-পব্বত দেখার সখ আমার নেই। ক'টা দিন একটু রেস্ট নিই বাপু।

এড়িয়ে গেছে শিখা। মাধবীও খুশি হয় না। নিশীথ একাই গেছে। ফিরবে পরশু দিন। আর শিখা বের হয়েছে তারপরই।

সন্ধ্যা নামছে।

বেলটা বাজছে। বাঈ দরজা খুলে দিতে শিখা ঢুকছে। পার্টিতে আজ হঠাৎ অনেকদিন পর একটু বেশী খেয়ে ফেলেছিল শিখা। চুলগুলো উস্কোখুস্কো, চোখ দুটো বেশী মাত্রায় চকচকে, খুশিতে ঝকমক করছে।

বাড়ি ঢুকে মাকে ওর দিকে চেয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়।

শিখা বলে—একটু দেরী হয়ে গেল মা। অনেকদিন পর রীতার ওখানে গেছলাম। ওখানেই লাঞ্চ করতে হল। এ ফাইন গেট টুগেদার।

মাধবী দেখছে শিখাকে। তার চোখে এই উচ্ছ্বাস ভালো লাগে না।

মাধবী বলে—আবার তো কলকাতায় ফিরতে হবে, চারদিন পরই। সে ক'টা দিন বাড়িতে একটু রেস্ট নে। এভাবে আগেকার মত হৈ চৈ না করলেই ভালো। নিশীথের সঙ্গেও গেলি না।

শিখা মায়ের দিকে চাইল, আজ তার মুক্তির এই ক্ষণিক আনন্দে মা খুশী হতে পারেনি।

শিখাকে ওরা সব কেড়ে নিয়ে শেষ করার পুণ্যকাজ থেকে আজও নিরস্ত হতে চায় না। এভাবে শিখা এখানে মুখ বুজে থাকবে না। শিখা বলে ওঠে,

—ঠিক আছে। চলেই যাবো মা—তোমার এখানে থাকতে আসিনি। তবে জেনে রাখো আমারও স্বাধীন মতামত একটা আছে, সেটাকে বাবাও কোনদিন জানতে চাননি, তুমিও।

মাধবী মেয়ের ওই সতেজ কণ্ঠস্বরের জবাবে ক্লান্ত স্বরে বলে,

—তাঁকে আর এসবের মধ্যে টেনে আনিস না শিখা, তোরাও

বড় হয়েছিস। তোদের মতের বিরুদ্ধে কথা বলতে চাই না। যা ভালো বুঝিস করবি! এসব আর আমার ভালো লাগে না।

শিখা গুম হয়ে ওঘরে গিয়ে ঢুকলো।

এই বাধাগুলো তার অসহ্য মনে হয়।

নিশীথ ফিরেছে।

শিখাও সেইদিনের পরও বের হয়েছিল। এই ফাঁকে একদিন ফোর্ট এরিয়ায় শিবদাসানির অফিসও দেখে এসেছে। বিরাট ফ্লোর এরিয়া নিয়ে ঝকঝকে অফিস করেছে সে, ঘরে ঘরে ইনটারকম, সারা ফ্লোরটা এয়ারকন্‌ডিশন করা। শিবদাসানির ঘরে ওয়াল টু ওয়াল পুরু কার্পেট পাতা, ওভ্যাল শেপ বার্ণিশ করা টেবিলে তিন চারটে নানা রং-এর নানা ছাঁদের টেলিফোন, চেয়ারগুলোয় বসলে মানুষটা অতলে হারিয়ে যায়।

—কি নেবে শিখা? টি অর কফি!

...শিবদাসানি নিজে এখন ব্যবসার কর্ণধার, আর চুটিয়ে ব্যবসা করছে সে। আরও বাড়তে চায় সে। বলে,

—বাইরে এখানের শিল্পীদের কাজ কিছু পাঠাবার প্ল্যান করছি। গুড মার্কেট। আরও কিছু প্ল্যান আছে, কিন্তু তেমন যোগ্য লোক না পেলে সেগুলো এগ্‌জিকিউট করতে পারছি না!

শিবদাসানির গাড়িতেই ফিরছে ঘরের দিকে। দামী এয়ার-কনডিশন্‌ গাড়ি মসৃণ গতিতে চলেছে শিবদাসানির ভাগ্যের মতই।

শিখা লিং কিং রোডের ধারে নেমে বিদায় নিল আজ। শিবদাসানি বলে,

—মিট ইউ এগেন শিখা।

শিখার জন্য বোম্বাই-এ এখনও ঠাঁই আছে। খুশি মন নিয়ে বাড়িতে ফিরে দেখে নিশীথ ফিরেছে। সে গোছগাছ করছে। কাল সকালের ট্রেনেই ওরা ফিরবে।

শিখা কি ভাবছে। কি বাঁধনে সে বাঁধা পড়ে গেছে। কথাটা ভাবতে পারে না। কলকাতায় ফিরতে হবে তাকে।

মাধবী দেখছে মেয়েকে, যাবার কথা শুনে শিখার মুখখানা কঠিন হয়ে গেছে। মাধবী তবু শোনায়,

—গোছগাছ করে নে বাছা। কাল ভোরেই ট্রেণ।

অর্থাৎ মাও চায় না শিখা এখানে থাকুক। এখানের জীবন থেকে ওকে সরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে, সেই জীবনেই ফিরে যাক শিখা।

মায়ের কথায় শিখা বলে,

—ভয় নেই মা। আমি ফিরেই যাবো। গোছগাছ আমার হয়ে গেছে। আর যদি কখনও বোম্বাই-এ আসি এ বাড়িতে তোমার বোঝা বাড়াতে আসবো না মা।

মাধবী বলে,

—ওকি কথা রে ?

শিখা জবাব দিল না। মাকে ভুল বুঝেই রইল সে। বোম্বাই থেকে বের হ'ল মায়ের উপর, নিজের জীবনের উপর কি অসীম বিরক্তি নিয়ে।

প্রশান্তও দেখেছে ব্যাপারটা। শিখার ব্যাপার নিয়ে প্রশান্ত কোন কথা বলেনি। কিন্তু বুঝতে পেরেছে শিখার মনোভাবটা।

বলে সে মাকে—ওর ভাবগতিক ভালো বুঝছি না মা।

মাধবী জানায়—কে জানে বাছা কি ও চায়। সবই আমার অদৃষ্ট। সুখের দিনের স্বপ্ন দেখেছিলাম, এখন দেখছি সবই আমার হারিয়ে যাচ্ছে!

প্রশান্ত দেখেছে দাদার বিচিত্র ব্যবহার। আজ সে এই সংসারের কোন দায়িত্বই নেয় নি। বাবার অসুখের সময় হীরা আর সে এসেছিল। মারা যাবার পর এ বাড়িতে বাবার শেষ কাজ চুকিয়ে আবার ফিরে গেছে তাদের সেই ফ্ল্যাটেই।

প্রশান্ত রয়ে গেছে এখানে। আর সে এই সংসারের দায়িত্ব,

মায়ের সব দায়িত্ব তুলে নিয়েছে নিজের উপরই। এ ব্যাপারে তাকে পরামর্শ দিয়েছে উষাই। উষা নিজেও আসে এখানে মাধবীর কাছে। উষা প্রশান্তের সিনিয়র মিঃ পার্শেকরের মেয়ে।

সব রকমে সাহায্য করে চলেছেন তার সিনিয়ার মিঃ পার্শেকর। মারাঠি ব্রাহ্মণ, সজ্জন ব্যক্তি। প্রশান্তেরও পসার বাড়ছে। তার সুন্দর চেহারা, মনোরম ব্যক্তিত্ব আর তীব্র বুদ্ধির জন্য এর মধ্যে বারে বেশ নাম করেছে। মক্কেলও ভিড় করেছে তার কাছে।

উষা পার্শেকর বলে—বাবাকে ছাড়িয়ে যাবে নাকি প্রশান্ত?

উষা শান্ত—নম্র। চেহারায় আছে একটি লক্ষ্মীশ্রী। মাধবীও দেখেছে তাকে আগেও দু'একবার।

গোবিন্দবাবু মারা যাবার পর থেকে উষা এ বাড়িতে প্রায়ই আসে। এর মধ্যে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলাও শিখে গেছে। নিষ্ঠাবান সারস্বত ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে, আমিষ ওদের বাড়িতে ঢোকে না।

এর মধ্যে মাধবীর পুজোর আয়োজন করে দেয়। এ বাড়িতে এসে অনেক সময় কাটিয়ে যায়। মাধবীর নিঃসঙ্গতাও ঘোচে কিছুটা উষার জন্য।

প্রশান্তও দেখেছে উষার ব্যাপার।

বলে সে—এখানে দেখছি বেশ জমিয়ে নিয়েছো?

উষা বলে—এখন সরো তো। মক্কেল চরাও গে, আমি আজ রান্নার দুটো আইটিম করছি। সুকতনি এ্যাণ্ড পোস্ত! মা দেখিয়ে দিয়েছেন।

অবাক হয় প্রশান্ত।

—ব্যাপার দেখছি অনেক দূর গড়িয়েছে। পোস্ত-শুক্তুনি মুখে তোলা যাবে তো?

হাসে উষা—খেতে বসে দেখো!

মাধবী দেখেছে উষাকেও। উষা হীরার ঠিক বিপরীত। এ বাড়িরই একজন হয়ে গেছে উষা।

কথাটা মনে মনে ভেবেছে মাধবীও।

প্রশান্তের বিয়ে থা দিয়ে সংসারী করতে হবে। সুশান্তও এবার বি-এস্-সি পাশ করে খেলার জন্য কোন কোম্পানীতে চাকরী পেয়েছে।

সবই সুসার হচ্ছে, কিন্তু গোবিন্দবাবুই দেখে যেতে পারেননি।

মাধবীই সেদিন প্রশান্তকে বলে,

—হ্যাঁরে, আমি আর কতো দিন সংসারের বোঝা ঠেলবো, এবার বিয়ে থা কর!

প্রশান্ত মায়ের কথায় চাইল। বলে সে,

—কিন্তু একজন বিয়ে করে তো সরে গেল, আবার বিয়ে দিতে চাইছো, যদি কোন ঝামেলা হয়?

মাধবী বলে, ভালো মেয়ে হলে সংসারের সুখশান্তিই বাড়ে রে?

এ বাড়ির মানুষদের যে চেনে জানে এমন যদি কেউ থাকে!

হেসে ওঠে প্রশান্ত।

হঠাৎ উষাকে পুজোর ফুল ফল, কিছু আনাজপত্রের বাজার করে এ বাড়িতে ঢুকতে দেখে চাইল মাধবী। সদ্য স্নান সেরে আসছে উষা, পিঠের উপর একরাশ চুল মেলা, পরনে দুধে গরদের লালপাড় শাড়ি। স্নিগ্ধ শ্রীময়ী ওই মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে। অন্য প্রদেশের বলে ওকে মানতে চায় না, ও কবে মাধবীর কাছে আপনজন হয়ে গেছে।

মাধবী বলে দ্যাখো পাগলীর কাণ্ড! ওসব কে আনতে বলেছে মা!

উষা বলে ওঠে—কাল পূর্ণিমার পুজো, বাবাও বললেন ফ্রি আছেন সিন্নি প্রসাদ খেতে আসবেন। বাজার কিছু করে আনলাম মা।

…মাধবী দেখছে উষাকে। ঠাকুর ঘরে ওইসব জিনিষ রাখতে চলে গেছে সে।

মাধবী প্রশান্তকে বলে,

—কাল পার্লেকর সাহেব আসছেন, কথাটা বলবো ভাবছি ওকে!

মায়ের চোখে কিছুই এড়ায়নি। প্রশান্ত কথাটা শুনে সলজ্জভাবে বলে, তোমার যতো ওইসব ভাবনা মা! এত তাড়া কিসের?

মা হাসছে। আজ মনে হয় মাধবীর সংসারের রুক্ষতার মাঝে তবু কিছু শ্যাম সজীবতা রয়ে গেছে, একেবারে নিষ্করুণ নয় এর বুক। তাই সেও নোতুন করে কি পাবার, বাঁচার আশ্বাস খোঁজে।

ঊষাও খুশি হয়, মনে মনে সেও এমনি একটি শান্ত সুন্দর পরিবেশই চেয়েছিল। এ সংসারে এসে ঊষা মনের মত করে সাজিয়েছে, মাধবীও খুশি হয়।

প্রশান্ত আর ঊষা তাকে সংসারের সব ভাবনা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। ঊষা বলে ছোট দেওর সুশান্তকে,

—এবার তুমার ভি সাদি হামি দিবে।

সুশান্তও চাকরীতে ঢুকেছে, নেশা তার খেলা। আপিস আর খেলা নিয়েই থাকে। সুশান্ত বলে,

—দোহাই বউদি। অন্যায় কিছু করি নি। ওসব ঝামেলায় ফেলোনা আর।

মাধবী সংসারের দায় থেকে মুক্ত হয়ে পুজো-আর্চা আর টুকটাক নিয়েই থাকে। মাধবী বলে,

—যা ভালো বোঝো করো ঊষা। ওর বিয়ে থা দিয়ে এবার সব দায়মুক্ত হতে চাই।

প্রশান্তরও প্রাকটিশ এখন জমজমাট। সেদিন নোতুন গাড়িও কিনেছে। ঊষা বলে,

—চলুন মা মহালক্ষ্মী মন্দিরে পুজো দিয়ে আসবো।

সুশান্ত হাসে—তূমি একটা ইডিয়ট বৌদি!

—হোয়াই? কাহে শান্ত? ঊষা অবাক হয়।

সুশান্ত বলে—সবুজ গাড়ি কিনলো ছোড়দা, দুজনে খাণ্ডলা না হয় ন্যাশনাল পার্ক,—পাওয়াই লেক এর দিকে বেড়াতে যাবে, তা নয় ছোড়দা রইল নথিপত্রের মধ্যে ডুবে আর তুমি চল্লে বুড়ি মাকে নিয়ে ওই মহালক্ষ্মীর মন্দিরে! কি টেস্ট তোমার?

হাসছে উষা—স্টপ ইট আই সে শান্ত! তুমাকে বহুৎ জোর মারবো। একডম্ যা টা বলছে তুমি!

মাধবী এমনি একটি পরিবেশের স্বপ্নই দেখেছিল। আজ বার বার মনে পড়ে তার স্বামীর কথা। দূর প্রবাসে এসে মারা গেছেন, এই শহরের উপর তাই একটা মায়া পড়ে গেছে। উষার ডাকে চাইল।

উষা বলেন—চলুন মা!

মাধবীর মনটা ভালো নেই। তবু এই শান্ত মেয়েটিকে দুঃখ দিতে চায় না। তাই সেও চললো গাড়িতে করে পুজো দিতে।

শিখা কলকাতায় ফিরেছে। নিশীথও ডুবে গেছে তার কাজের মধ্যে। একদিক থেকে নিশীথের মনের অতলে একটা বঞ্চনা আর ক্ষোভ রয়ে গেছে। কিন্তু তার কোন বহিঃপ্রকাশ নেই। তবু দুজনের মধ্যে দুরত্বটাই বেড়েছে।

শিখার মনে তখনও জেগে আছে বোম্বাই এর জগৎ। রীতা, কমলজিৎ, শিবদাসানির সেই উষ্ণতা, পিণ্টোর উদ্দাম হৈ-চৈ করে দিন কাটানো। সেই সবই রয়েছে। তবু তাকে সরে আসতে হয়েছে। এখানে মধু সোমানীও খুশি হয় ওকে দেখে। মধু কলকাতায় আটকে আছে। শিখা এখন বৈকালে বের হয় বাড়ি থেকে। মধু সোমানীর ফ্ল্যাটটা পার্ক স্ট্রীট এলাকার একটা মালটিস্টোরিড বাড়ির ন'তলায়। পথটা শিখার চেনা, ট্যাক্সি নিয়ে এখানে আসে। সোজা লিফ্‌টে উঠে যায়,

—হ্যাল্লো! বোম্বে থেকে কবে ফিরলে?

শিখা আবার বোম্বের সেই জগতেই ফিরে যায়। দুজনের মনে বোম্বের স্বপ্ন! মধু সোমানী বলে হ্যাভ সাম ড্রিঙ্কস্! জাস্ট এ ড্রপ জিন উইথ লাইম ফর ইউ!

শিখা বোম্বের কথাই ভাবছে। সে হাঁপিয়ে উঠেছে কলকাতার এই জীবনে।

নিশীথ একটু অবাক হয়। রাত্রি হয়ে গেছে, তখনও ফেরেনি শিখা, ভূষণ গজগজ করে,

—কোথায় যায় তুমি কিছু বলো না!

এমন সময় ট্যাক্সিটাকে এসে থামতে দেখে চাইল নিশীথ। নামছে শিখা। কেমন ঝড়ো উদভ্রান্ত চেহারা। শিখা এদিকে চাইল না। নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

হঠাৎ শিখার জীবনে এসেছে একটি নোতুন সংবাদ। বোম্বাইএ থাকার সময়েই কিছুটা বুঝতে পেরেছিল। আজ এখন নিশ্চিন্ত হয়েছে। শিখা বুঝেছে তার দেহের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন এসেছে। আর এই সংবাদে সে শিউরে উঠেছে।

নিশীথকে স্বামীর অধিকার সে দিতে বাধ্য হয়েছিল, আর নিশীথও সেই সুযোগ নিয়েই তার জীবনে এনেছে চরম বিপর্যয়।

শিখার শরীরটা কিছুদিন থেকে ভালো যাচ্ছিল না। আজ মধু সোমানীর ওখানেই একবার পাক দিয়ে উঠেছিল সারা গা, কিছুই খেতে পারেনি।

মধু ব্যস্ত হয় কি হয়েছে শিখা? ফিলিং সিক্?

শিখা নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দেয়,

—নাথিং!

একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে কোনমতে বের হয়ে এসেছে। সারাটা পথ কেটেছে একটা জমাট দুশ্চিন্তার মধ্যে। কালো আঁধার নামা ছায়াটা তার সব মনের স্বপ্নকে ঢেকে দিয়েছে। তার মুক্তির সব আশাই ব্যর্থ হয়ে গেছে।

বাড়িতে ঢুকে বাথরুমে গিয়ে বমি করছে, নিজেকে সামলাতে পারে না শিখা। ওর বমির শব্দে ছুটে আসে নিশীথ।

শিখার ফর্সা মুখ চোখ বিবর্ণ; কাঁপছে সে ক্লান্তিতে।

—শিখা! নিশীথ এগিয়ে এসে ওকে ধরে বিছানায় নিয়ে গেল। ভূষণও এসে পড়ে। নিশীথ বলে ভূষণ, ডাক্তারবাবুকে একবার ফোন করে দে!

শিখা প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে,

—ও কিছু না।

নিশীথ ওকে বসিয়ে দেয়—তুমি শুয়ে থাকো।

ডাক্তার ভদ্রলোক প্রতিবেশীই। সুতরাং আসতে দেরী হয় না। নিশীথ নিশ্চিন্ত হয় ওকে দেখে। ডাক্তারবাবুকে দেখে শিখার মুখচোখে বিরক্তিই ফুটে ওঠে। মনে হয় এরা সবাই তাকে আজ চরম বিপদে ফেলে কি আনন্দ পেতে চায়।

ডাক্তার দেখে শুনে বলেন হাল্‌কা স্বরে,

—তেমন ভয়ের কিছুই নেই। প্রথম মা হতে চলেছেন তাই এসব একটু হবে। দু একদিনের পর চেম্বারে আনবেন অন্য টেস্ট-গুলো করে রাখবো।

একটু সাবধানে থাকতে হবে। বেশী ঘোরাফেরা করা চলবে না, আর কোন উত্তেজনা এসময় ঠিক নয়।

ডাক্তারবাবু ওষুধপত্র কিছু দিয়ে চলে গেছেন।

নিশীথ চাইল শিখার দিকে। আজ নিশীথের সত্বারও যেন নবজন্মের সূচনা হয়েছে। দুজনে কি এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। তাদের সন্তান আসবে এই বাড়িতে। শিখাকে মনে হয় অন্য একটি সত্বা, যে তার সব ভবিষ্যৎ স্বপ্নের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে একটি নোতুন আবির্ভাবকে সূচিত করতে চলেছে।

শিখা এভাবে বাঁধা পড়তে চায় নি।

আজ মনে পড়ে বাবা-মায়ের কথা। ওকে তারা নির্বাসিত চিরবন্দী করে রেখে গেছে এই কঠিন বাঁধনে। আর আজ তার এই অসহায় অবস্থার জন্য দায়ী ওই নিশীথই।

কি দুঃসহ রাগে অভিমানে জ্বলে ওঠে শিখা, কিন্তু চীৎকার করে প্রতিবাদ জানাতে পারেনা। তার বুকের সব ব্যর্থতা চোখের জল হয়ে ঝরে পড়ে।

—শিখা! নিশীথ দেখছে ওকে।

বলে সে—কান্নার কি আছে? আমাদের ঘরে একজন আসছে নাতুন অতিথি, সব শূন্যতা ভরে উঠবে। শিখা—তুমি সুখী হবে!

…শিখার কাছে এসব আজ কঠিন নির্মম ব্যঙ্গের মতই শোনায়। আর্তনাদ করে ওঠে সে। এই সবকিছু থেকে মুক্তির কথাই ভাবছে শিখা! বলে সে,

—এ আমি চাইনি। না—না। এসব আপদ থেকে মুক্ত হতে চাই আমি! এ আমি মানিনা।

নিশীথ বলে—ছিঃ। ওসব কথা বলতে নেই। আমাদের প্রথম সন্তান, তাকে বুকে তুলে নিয়ে শান্তি পাবে। ও কথা ভেবো না।

শিখা দুঃসহ কান্নায় ফুলে ফুলে ওঠে।

এ সে চায় নি। সে এবার এক অতল অন্ধকারে হারিয়ে যাবে চিরকালের জন্য।

ক'মাস শিখার কেটেছে কি এক দুঃসহ যন্ত্রণার মাঝে। ইলা—মাসীমারা আসে খবর নিতে। নিশীথও কলেজ থেকে বিকালে ফেরে, আর রয়েছে ভূষণ এবাড়ির যেন সর্বেসর্বা।

ওই খবর শোনার পরদিন মাসীমাও এসেছিল।

বাসন্তী বলে—বোম্বাই-এ মাধুকেও খবরটা দিয়েছি। এখন থেকে একটু সাবধানে থাক বাছা ক'টা মাস। ওসব মার্কেটিং ফার্কেটিং-এর দরকার নেই। যা ভিড়। বেরুবি না একদম।

ভূষণ সায় দেয়—তাই বলুন মাসীমা, আমি বল্লে ওতো রাগ করে!

বাসন্তী শোনায়—এখন বের হবে না। ইলা আসবে মাঝে মাঝে তোর যা দরকার আনিয়ে দেবে।

শিখা বলে—বোম্বাইএ মাকেও জানাতে হবে কি এমন খবর মাসীমা?

বাসন্তী হাসে—ও তুই বুঝবি না রে! মেয়েদের প্রথম মা হবার খবরের দাম কত বড় তা বুঝবি না।

শিখা এর দাম কত বড় তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। ক'মাস ধরে একটা জেলখানায় বন্দী হয়ে আছে সে। বৈকালে চৌরঙ্গী-পার্কস্ট্রীট এলাকায় আলো জ্বলে, কত ছেলেমেয়ের মুক্ত মেলা—মধু সোমানী. আরও ওর বন্ধুদের কথা, পার্টির কথা মনে পড়ে।

আজ সেখানে তার ঠাঁই নেই।

আয়নায় দেখেছে শিখা তার চেহারাটা। সারা শরীরটা রোগা হয়ে গেছে, কোমর-বুক-সবকিছুর কোন শ্রী আর নেই, ফর্সা মুখে চোখের কোলে এসেছে কাল্‌চে দাগ। আসন্ন মাতৃত্বের ছোঁয়া তার দেহমনের সব শ্রী টুকুকে কেড়ে নিয়ে একতাল মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছে।

…নার্সিং হোম থেকে ফিরেছে শিখা, আজ সে মা হয়েছে ছোট নরম তুলতুলে একটি ফুলের মত মেয়ে—তারই আত্মজা অবাক হয় শিখা মা আর উষা এসেছে বোম্বাই থেকে। মাসীমাও এসেছে।

· উষাকে দেখেছিল আগে শিখা, এখন সে তাদেরই বাড়ির বৌ হয়ে এসেছে। উষা কচি মেয়েটাকে দেখে বলে,

—খুব সুন্দর হয়েছে শিখা, বড় হলে এ তোমার মত হবে জাস্ট বিউটিফুল লাইক ইউ!

শিখা তার বিধ্বস্ত ক্লান্ত দেহটার দিকে চেয়ে বলে,

—সব হারিয়ে গেল বৌদি! কি চেহারা হয়েছে দেখেছো?

মাধবী দেখছে মেয়েকে। ছেলেবেলা থেকেই দেখেছে শিখা তার নিজের শরীর—সৌন্দর্য সম্বন্ধে একটু বেশী মাত্রায় সচেতন মাঝে মাঝে এই বাড়াবাড়ি তারও বিশ্রী লেগেছে।

আজ মাধবী বলে, চেহারা আর রূপ কি চিরকাল থাকে শিখা মেয়েদের রূপ বাইরে নয়, ভিতরে। এখন মা হয়েছিস ওকে মানুষ কর।

শিখা মায়ের কথায় চুপ করে থাকে। কিন্তু ওই কঠিন কথাট

তার আদৌ ভালো লাগেনি। ঊষা সেটা বুঝে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বলে—নো—না। ওসব ঠিক হয়ে যাবে শিখা। টেক রেস্ট।

…মা, বৌদিরা ফিরে গেছে বোম্বাইএ।

শিখার মনে হয়েছে এসব আদিখ্যেতাই। মা এখন নিশ্চিন্ত হয়েছে, শিখাকে একেবারে পাকাপাকি ভাবে বেঁধেছে তারা। শিখার সারা মনে একটা কাঠিন্য জেগে উঠছে।

ওদের সকলের এই চেষ্টাকে ব্যর্থ করে নিজের পথেই চলবে সে। মুক্তির পথ সে করে নেবে।

নিশীথএর অবসর সময়টুকু এখন ভরে থাকে রেবাকে নিয়েই। শিখা ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। ছোট্ট মেয়েটা ঘরময় হামাগুড়ি টানে, এটা টানে ওটা ফেলে। কলরব করে আপনমনে।

নিশীথ ওকে কোলে তুলে নেয়।

বলে ওঠে নিশীথ শিখাকে—রেবার জামাটা বদলে দাও, ভিজে গেছে।

শিখা চাইল একবার। ইদানীং অবসর সময়ে সে ছবি আঁকার চেষ্টা করছে। স্কুলে আঁকতো—বাড়িতেও দু'একটা নিল রংএর ছবি এঁকেছে, আবার এই বন্দীদশায় সেই অভ্যাসটাকে রপ্ত করছে। শিখা বলে—ভূষণ বাচ্চাটাকে জামা বদলে দাও।

নিশীথ অবাক হয়—তুমি পারোনা ওর জন্য এটুকু করতে? প্রায়ই দেখি রেবা কাঁদে—তুমি ফিরেও চাওনা। ঝি চাকরদের কাছে রেখে দেবে ওকে?

শিখার মনের অতলে সেই বিদ্রোহটা এবার মাথা তুলছে। একবার ওকে বন্দী করেছিল তারা, আর সে ফাঁদে পা দিতে চায় না সে, শিখা চাইল নিশীথের ডাকে।

ওর গলার শব্দে ভূষণই এসে পড়ে, সে রেবাকে কোলে তুলে নিয়ে বলে—আমি বদলে দিচ্ছি। নিশীথদা তোমার কলেজের সময় হয়ে গেছে।

নিশীথ দেখছে শিখার এই অবহেলা। বাচ্চা মেয়েটাকে সে দেখতে পারেনা। এখন থেকেই তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, কাঁদলে বুকের দুধও দেয় না. ফিডিং বটল তুলে দিতে বলে বাচ্চা চাকরটাকে।

…ইদানীং একটু বড় হয়েছে রেবা, পা পা হাঁটতে পা[illegible]। এটা ওটা ভাঙ্গে—শিখার নজর নেই। নিশীথ কড়া কথাই আজ বলতে গেছিল, কিন্তু ভূষণের ডাকে থেমে গেল। বের হতে হবে তাকে। চলে গেল নিশীথ।

শিখাও দেখেছে নিশীথের চোখের সেই কঠিন চাহনি। ওব ভদ্রতার মুখোস ছাড়িয়ে চরম স্বার্থপর সত্বা জেগে ওঠে মাঝে মাঝে কি নির্মম কাঠিন্য নিয়ে। শিখাও এবার তৈরী হয়েছে।

…বোম্বাই থেকে রীতা—কমলজিৎও চিঠিপত্র দেয় শিখাকে। ওই চিঠিগুলোই তার কাছে কি আশ্বাস আনে। রীতা বলেছে শিবদাসানি নাকি এখনও শিখার প্রেমে ডুবে আছে।

…ওরা একসঙ্গে 'দমন' গেছিল। সুন্দর 'সি বিচ'…খুব এনজয় করেছে। আর দারুণ ভাবে মিস করছে শিখাকে।

মধু সোমানি কয়েকবার টেলিফোনে শিখাকে ধরতে চেয়েছিল। অনেক দিন দেখা নেই। বেশ কিছুদিন তবু এখানের নিঃসঙ্গ জীবনে শিখার সাহচর্য পেয়ে সে খুশী হয়েছিল। এবার খুশি হয় সে।

মধ সোমানী বোম্বেতে ফিরবে এখানের আপিসের চার্জ অন্যাকে দিয়ে। হিসেবী ছেলে সে। এখানের আপিসের কাজ এখন একটা ছকে এসে গেছে। মাস দুয়েকের মধ্যে বোম্বাই ফিরে নোতুন আপিসের চার্জ নেবে।

কলকাতা ম্লান ঠেকে তার কাছে।

সন্ধ্যার আগেই ফ্ল্যাটে ফিরে মধু স্নান সেরে হুইস্কি নিয়ে বসেছে, হঠাৎ বেলটা বেজে ওঠে। বেয়ারা দরজা খুলে দিতে ঢুকছে শিখা, চমকে ওঠে মধু সোমানি।

—হাই স্ট্রেঞ্জ শিখা! ক'বারই ফোন করেছি তোমা‹

বাড়িতে, কে একজন ভারি গলায় বলেছে উনি অসুস্থ, কথা বলা যাবে না।

—তাই নাকি!

শিখা অবাক হয়। তাকে একথা কেউ জানায় নি। জানতেও দেয় নি।

মধু বলে—আমার নামও বল্লাম, কিন্তু কোন জবাবই পেলাম না। মুখের উপর ফোনটা কেটে দিল 'রাদার রুড্‌লি'।

শিখার ফর্সা মুখচোখ রাগে অপমানে লাল হয়ে ওঠে।

মধু বলে ফরগেট অল দোজ! কাম অন্—হ্যাভ সাম্ শ্যামপেন। অনেকদিন পর আজ ফিরে পেলাম তোমায়, লেট আস সেলিব্রেট!

শিখা আজ দীর্ঘদিন পর যেন তার জায়গায় ফিরেছে। মধু সোমানী দেখছে ওকে। চোখে ওর গোলাবী নেশার আমেজ। ওই মাতৃত্বের পর আরও সুঠাম—ফর্সা আর সুন্দর হয়ে উঠেছে শিখা, মুখে ফুটে উঠেছে কমনীয় স্নিগ্ধতা। বুকের সুডোল রেখাগুলো আজ ভারি—সোচ্চার। সব মিলিয়ে এ যেন নোতুন এক শিখা।

শিখা দেখছে মধু সোমানীর চোখে সেই বিমুগ্ধ নেশার ঘোর, একটা ঝড় উঠেছে, দূরে দেখা যায় রাত্রির কলকাতার বিচিত্র রূপ। আশপাশে আকাশ ছোঁয়া বাড়ির এখানে ওখানে আলোর মালা, ময়দানের বুকে গাছের কালো ছায়া—

শিখা আজও হারিয়ে যায় নি। তার সেই আকর্ষণ আজও ফুরিয়ে যায় নি ওদের কাছে। শিখার নিটোল অনাবৃত কাঁধে মধু সোমানীর হাতের উত্তপ্ত স্পর্শ লাগে।

—শিখা!

শিখা উতরোল বাতাসে কান পেতে শোনে সেই বিচিত্র আহ্বান। তার অন্যমন খুশিতে ভরে ওঠে।

দুচোখে শাসনের কৃত্রিম কাঠিন্য এনে হাল্‌কা স্বরে বলে শিখা,

—ইউ সিলি বয় মধু!

হাসছে মধু সোমানী, শিখার কাঁধের সিল্কের শাড়িটা কখন খসে

পড়ে। ওর সুগঠিত বুক, ফর্সা-নিটোল অনাবৃত বাহুমূল—আজও তেমনি নেশা জাগায়।

শিখা আশ্বস্ত হয়—ফুরিয়ে যায় নি সে। প্রকৃতি তার দেহের কোষে কোষে কি এক দুর্বার প্রাণশক্তি এনেছে, তাই সে থামতে পারবে না তার জীবন ধর্মের তাগিদেই।

রেবা কাঁদছে।

নিশীথ লাইব্রেরী থেকে কাজ বন্ধ করে বেরিয়ে আসে। ভূষণ নীচে রান্নাঘরে ব্যস্ত। বাচ্চা চাকরটা কোথায় গেছে। চমকে ওঠে নিশীথ। রেবা একাই ঘুমুচ্ছিল তার ঘরে, ঘুম ভেঙ্গে কাউকে না দেখতে পেয়ে ভয়ে কাঁদছে।

কাউকে না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছে। ঘুম চোখে সে এগিয়ে চলেছে কাঁদতে কাঁদতে, একেবারে সামনের সিঁড়িতে আছড়ে পড়ে। দু'একটা সিঁড়ি গড়িয়ে পড়েছে—আরও গড়াতো, কোনরকমে নিশীথ এসে ওকে ধরে ফেলে!

কপালটা কেটে গেছে, ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে।

নিশীথের হাঁক ডাকে ভূষণ বের হয়ে এসে চমকে ওঠে.

—একি! রক্ত পড়ছে! এখানে এল কি করে রেবা?

রেবার জবাব দেবার মত সাধ্য নেই। যন্ত্রণায় কাঁদছে সে। রক্ত ঝরছে। ওই অবস্থাতেই ওকে নিয়ে ডাক্তারখানায় ছুটলো ওরা।

নিশীথ চটে উঠেছে ঝি চাকরদের উপরই। শিখার তখনও দেখা নেই। শিখা ইচ্ছে করেই তাকেও এড়িয়ে চলেছে, রেবাকে ও কষ্ট দিয়ে তৃপ্তি পেতে চায়। শিখার উপরের রাগটাই ফেটে পড়ে চাকরদের উপর।

এ বাড়ির ঝি মানদা সামনে চুপ করে থাকে। চাকরটা বলে-বাজারে গেছলাম।

নিশীথ ধমকায়—বাজারেই থাকবি, এদিকে বাড়িতে বাচ্চা খুন হয়ে থাকবে তোদের জন্য!

রেবা আহত—ভীত। মাকে খুঁজেও পায় না। দেখেছে সেই শিশু সে কাঁদলে বাবাই ছুটে আসে, বুকে তুলে নেয় তাকে।

খেলনাপত্র যা কিছু বাবাই আনে। ওকে নিয়ে পার্কে বের হয় নিশীথই। শিখা বড় একটা বের হতে চায় না এখানে।

আহত রেবা তাই বাবাকেই ছোট্ট দুটো হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে কি নির্ভর খোঁজে! নিশীথ বলে,

—কাঁদিস নে রেবা। ডাক্তারবাবুর কাছে যাচ্ছি এখুনিই ভালো হয়ে যাবে। আর একটুও ব্যথা থাকবে না।

নিশীথই ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়।

রাত্রি হয়ে গেছে।

ব্যাণ্ডেজ করিয়ে এনে নিশীথ রেবাকে নিজের খাটেই শুইয়েছে। শান্ত হয়েছে রেবা। বলে সে,

—তুমি যেও না বাপি! মা মণি আমাকে দেখতে এল না, মা মণি কোথায় গেছে! খুব দুষ্টু!

···হঠাৎ শিখাকে ঢুকতে দেখে চাইল নিশীথ।

রেবাও দেখছে মাকে। শিখা শুনেছে রেবার কথাগুলো। ওইটুকু মেয়ে এখন থেকেই যে মাকে এড়িয়ে চলে, তা বুঝেছে শিখা। আজ ওর কথাগুলো শুনে অবাক হয়।

নিশীথ দেখছে শিখাকে।

মুখচোখে অনেকদিন পর ফুটে উঠেছে সেই উদ্দামতা। মাথার চুলগুলো উড়ছে, শাড়িটা খসে গেছে কাঁধ থেকে, এতদিন পরে শিখাকে আবার এই বিচিত্র মূর্তিতে দেখে চমকে ওঠে সে! নিশীথ শুধোয়?

—কোথায় গিয়েছিলে?

শিখা দেখছে নিশীথকে। ওর কণ্ঠস্বরের কাঠিন্যতার নজর এড়ায় নি। শিখা আজ জানায়,

—সে কৈফিয়ৎও তোমায় দিতে হবে? এর আগেও আমার

বন্ধুবান্ধব দু'একজন ফোন করেছিল এবাড়িতে, তাদের অপমান করে ফোন কেটে দিয়েছিলে? কেন বলতে পারো?

নিশীথের মনে পড়ে কথাটা।

আজ শিখা সেই বন্ধুদের সমাজেই গেছিল আর ফিরে এসেছে অন্য এক মূর্তিতে। তার দেহের দামী সেণ্টের সুবাস ছাপিয়ে অন্য গন্ধ ছাড়ে ওর মুখে, চোখে দেখেছে কি উদ্দামতা।

নিশীথ বলে—তারা তোমার বন্ধু হলে নিশ্চয়ই দিতাম তোমায় কথা বলতে। তারা বন্ধু নয়—শত্রু! নিজের দিকে চেয়েও এখনও এ কথাটা বুঝতে চেষ্টা কর শিখা।

আজ তোমার মেয়ে একটা বিপদের মুখ থেকে অল্পের জন্য বেঁচে ফিরে এসেছে। তার জন্যে তোমার এতটুকু আপসোস নেই। নিজের মেয়ের কথাও যারা তোমায় ভুলিয়ে দেয় তারা আর যাই হোক তোমার বন্ধু নিশ্চয়ই নয়।

শিখা রাগে অপমানে জ্বলে ওঠে। আজ তার কাছে একটা কথা স্পষ্ট হয়েছে যে দরকার হলে নিশীথও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে, রুখে দাঁড়াবে।

আর শিখাও ওকে দেখিয়ে দেবে প্রতিকার সে করতে পারে।

শিখা রাগে অপমানে রেবার খোঁজ নিতেও ভুলে যায়, নিজের ঘরে এসে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে গর্জাচ্ছে মনে মনে। তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কাছে ওই মাতৃত্ব, সন্তানের জন্য কোন ভাবনা, উৎকণ্ঠা সবই মিথ্যা হয়ে গেছে।

ব্যাপারটা দেখে নিশীথও অবাক হয়েছে। কঠিন কথা বলতে সে চায়নি শিখাকে, কোন অপ্রিয় প্রসঙ্গ তুলতে চায়নি কিন্তু শিখার ব্যবহারই তাকে রূঢ় করে তুলেছে।

নিশীথ দেখেছে শিখা একবারও রেবার দিকে চাইল না, অসুস্থ মেয়েটারও খবর নিল না।

রেবার ডাকে চমক ভাঙ্গে।

ছোট্ট মেয়েটাও দেখেছে মায়ের ওই রুদ্রমূর্তি। বাবাকে কি বলে গেল। রেবা বলে—মা কি বলছিল বাপি? মা দুষ্টু! না!

নিশীথ মেয়েকে বলে—ওসব কথা বলতে নেই। মায়ের শরীর ভালো নাই।

শিশু মনের পরতে মায়ের একটা নিষ্ঠুর ছবিই ফুটে ওঠে। রেবা বলে—এখানেই শোব বাপি! তোমার কাছে।

নিশীথ বলে—ঠিক আছে। ঘুমোও তুমি। রাত হয়েছে।

বাড়ির এই ব্যাপার নিয়ে ঝি চাকর মহলেও আলোচনা হয়। বাচ্চা চাকরটা বলে—বৌদি কাল অনেক রাতে ফিরে যা করলো। মানদা শোনায়—ওর জন্য বকুনি খেয়ে আমরা মরছি শিবতুল্যি লোক দাদাবাবু, তার ঘরের বৌ এমনি নাচুনী হবে কে জানতো?

গলা নামিয়ে মানদা বলে,

—মদ ফদও খেয়ে আসে নাকি ওই কোন আড্ডায়! মাগো মা!

—চুপ করে থাকো না বাপু! ভূষণ ধমকে ওঠে।

সে সবই দেখে, দুঃখও পায়। কিন্তু এ নিয়ে এসব আলোচনা হোক ভূষণ তা চায় না। কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে।

শিখা নামছিল, এদিকের ঘরে ওই মানদা আর অন্যসকলের কথাগুলো কানে আসে তার। তাকে নিয়ে এর মধ্যে ঝি চাকর মহলে এইসব আলোচনা হয় সে জানত না। আর এসবের মূলে ওই মানদা আর ভূষণ!

কথাটা শুনে দপ্ করে জ্বলে উঠেছে শিখা, নিশীথও হয়তো নীরবে সমর্থন করে এদের! শিখা নামল না, উঠে আসে ওই কথাগুলো শুনে জ্বালা ভরা মন নিয়ে।

…রেবাকে দেখে চাইল শিখা।

ওর হাতে ছবির বই।

—রেবা! রেবা মায়ের কঠিন কণ্ঠস্বরে ভয় পেয়ে গেছে।

ভয়ে ভয়ে এসে বাবার ঘরে ঢুকলো। এইটুকুই তার একান্ত নির্ভর, আশ্রয়। শিখা দেখেছে ব্যাপারটা।

নিশীথের আজ ছুটি।

রেবাকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় যাবে। রেবাও তৈরী। কখন থেকে তাড়া লাগায়—চলোনা বাপি! বাঘ, হাতি, সিংহ ও সবাই ঘুমিয়ে পড়বে।

নিশীথ বলে—চলো!

ওরা বের হচ্ছে সামনে শিখাকে দেখে থামলো।

শিখা শুধোয়—কোথায় যাচ্ছো?

রেবা ভয়ে চুপ করে আছে। কাঁধে ওর ব্যাগ—ওয়াটার বটল। ঝাঁকড়া চুলগুলোয় মানদা ফিতে দিয়ে বেঁধেছে,…শিখার কোন স্পর্শ বিশেষ নেই ওকে ঘিরে।

…নিশীথ বলে—ক'দিন ধরে ওকে কথা দিয়েছি চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবো। তাই বেরুচ্ছি আজ।

শিখাকেও এসব কথা বলার প্রয়োজন বোধ করেনি তারা। রেবাও মাকে এড়িয়ে যায়। শিখার মুখে ফুটে ওঠে একটা কাঠিন্য, ওদের নীরব অবহেলার ভাবটাও শিখা দেখেছে। এ বাড়িতে কি চাকররাও শিখার বিরুদ্ধে, তার মেয়েও মা চেনে না। স্বামীও এড়িয়ে চলে তাকে।

শিখা কথা বলে না।

রেবা বাবার হাত ধরে বের হয়ে গাড়িতে উঠে এবার নিশ্চিন্ত হয়।

তখন থেকেই ওর কথা শুরু হয়। যেন এক ঝাঁক পাখি কল-কল করছে। গাড়িটা ছুটে চলেছে ময়দানের সবুজ গাছগাছালি পার হয়ে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এর দেওদার গাছগুলো কচি পাতার সাজ পরে ঝলমল করছে। রেবার শিশুমনে এই সোনা হলুদ উজ্জ্বল রোদ—পাতা কাঁপা দুপুর—পাখিদের জগৎ—বাবা সব মিলিয়ে কি এক নোতুন সুন্দর জগৎ গড়ে ওঠে।

এ জগতে বেঁচে আছে রেবা আর তার বাবা। মায়ের কোন ঠাঁই নেই!

চিড়িয়াখানা থেকে বের হয়ে রেবাকে নিয়ে চৌরঙ্গীপাড়ায় এসেছে নিশীথ। রেবার লোভ আইসক্রীমের উপর। এর আগে বাড়িতে দু'একবার রেবা বাচ্চা চাকর নন্তুকে দশ পয়সা ঘুষ দিয়ে রাস্তা থেকে ঠেলা গাড়ির বরফ কাঠি—সস্তা আইসক্রীম আনিয়ে খাবার চেষ্টা করেছে। দু-একবার খেতে পেয়েছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভূষণদা না হয় খোদ বাবার হাতে ধরা পড়ে অর্ধভুক্ত সেই মূল্যবান জিনিষটাকে ফেলে দিতে হয়েছে।

নিশীথ তখনই কবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল,

—চৌরঙ্গীতে গেলে ভালো আইসক্রীম খাওয়াবো। এসব বাজে জিনিষ খেতে নেই।

আজ রেবার খেয়াল ছিল। সে বলে—কবে বলেছিলে বাপি আইসক্রীম খাওয়াবে।

নিশীথ হাসে—ঠিক আছে চলো—

সুন্দর রেস্তোরাঁ, সারবন্দী ঝকঝকে টেবিল পাতা, উর্দি পরা বয়রা ঘোরাঘুরি করছে। রেবা হঠাৎ চমকে ওঠে।

—বাপি!

নিশীথ চাইল। হলের আলোগুলোকে ইচ্ছে করেই কমিয়ে রাখা হয়েছে। রেবার তবু চোখ এড়ায়নি। দেখছে সে ওদিকের টেবিলে তার মা আর অন্য দুজন লোক উঠে এগিয়ে যাচ্ছে বাইরের দিকে।

রেবা বলে—ওইযে মা মণি; কারা সঙ্গে রয়েছে, ওইযে—

নিশীথও দেখেছে। শিখাকে এ পাড়ায় ওই বিচিত্রবেশী তরুণদের সঙ্গে দেখবে ভাবেনি। সুইং ডোরটা খুলে ওরা বের হয়ে গেল। হাসিতে ভেঙ্গে পড়েছে শিখা, দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ওরা তিনজনে গাড়িতে উঠে গেল, শিখার কোমরে হাত দিয়ে বিশ্রী-ভাবে জড়িয়ে ধরেই ভিতরে ঢুকলো গাড়ির একজন।

নিশীথ রাগে অপমানে গুম হয়ে যায়। এমন জানলে সে বেন্নাকে নিয়ে এখানে আসত না। রেবা শুধোয়,

—ওরা কে বাপি লম্বা ইয়া চুল, মেয়েদের জামার মত জামা পরে?

নিশীথ বলে—মা মণির চেনা জানা কেউ হবে।

—কোথায় গেল ওরা? আমাদের বাড়িতে? রেবার শিশুমনে নানা প্রশ্ন জাগে। নিশীথ ওসব প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার জন্য বলে,

—খাও! রেবা!

রেবা বাবার থমথমে মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল। বাবার সেই হাসিখুশি ভাবটা একেবারে মুছে গেছে মুখ থেকে। মনে হয় রেবার, বাবা কোথায় কষ্ট পেয়েছে। কষ্ট পেলে অমনি মুখ হয় বাবার।

রেবা ছোট্ট হাতটা দিয়ে বাবাকে ডাকছে,

—বাপি! তুমি খাও!

নিশীথ চাইল রেবার দিকে। মেয়েটার মিষ্টি মুখে কি করুণ বিষণ্ণতা ফুটে উঠেছে। ওইটুকু মেয়ের স্পর্শে ফুটে ওঠে সমবেদনা সান্ত্বনার আশ্বাস। নিশীথের মনে হয় পৃথিবী নিষ্করুণ নয়।

হাসে নিশীথ—এইতো খাচ্ছি! কেমন আইসক্রীম!

রেবা খুশিভরে ঝাঁকড়া চুল নেড়ে বলে,

চমৎকার, নতুর জন্য একটা নেবেনা বাপি। ও বেচারী পচা আইসক্রীম খায়।

নিশীথ বলে—ঠিক আছে, যাবার সময় নিয়ে নেব ক'টা।

—হ্যাঁ! রেবা খুশিভরে ঘাড় নাড়ে।

দুজনের মধ্যে আগেকার সেই সহজ আনন্দমুখর পরিবেশটা আবার ফিরে আসে।

নিশীথের মনে হয় রেবাই তার জীবনের সব দুঃখকে ভুলিয়ে দিতে পারবে। রেবা জানে তার বাবাকে। ওই তার সবচেয়ে আপনজন। আজ এখানে মামণি যেন তাকে দেখেও দেখেনি। নীরব অভিমানই জেগে ওঠে ওর মনে।

তবু বাপিকে নিয়েই সে খুশি।

শিখা সেই রাত্রের পর থেকেই মনে মনে তার পথ ঠিক করে নিয়েছে। এখানের উপর আকর্ষণও কমে আসছে তার। আর মধু সোমানীও ফিরে যাচ্ছে বোম্বাই-এ।

মধু সোমানী বলে—তুমিও বোম্বাই চলো শিখা!

শিখা বৈকালে বের হয় এখন প্রায়ই। চৌরঙ্গীপাড়ায় আসে দুএকটা রেস্তোরাঁয়, মধু—আরও দু'একজন এসে জোটে। এখান-থেকেই মধু সোমানির গাড়িতে বের হয় শিখা, কোনদিন সুইমিং ক্লাবে আসে। ওখানে আড্ডা জমিয়ে দু'এক পেগ খেয়ে বাড়ি ফেরে। সুইমিং পুলের একপাশে ডেক চেয়ার টেনে নিয়ে বসে আড্ডা জমায়। জলে স্বল্পবাসা ছেলেমেয়েদের দেখা যায়, সুইমিং কস্টুম এর সামান্য আবরণ ভেদ করে দেহের যৌবন-উচ্ছল মাদকতা ফুটে ওঠে।

শিখা দেখে মধু সোমানির চোখমুখে কি নেশা।

মধু বলে—আমাদের নোতুন ফার্মেই জয়েন করবে শিখা। বোম্বাইএ তোমার জন্য স্পেশ্যাল পোস্ট ক্রিয়েটেড হবে। কলকাতায় পড়ে পড়ে ইউ উইল বি ফিনিশ্‌ড!

শিখা গ্লাসে চুমুক দিয়ে চলেছে, তার মনের কোষে কোষে সেই বিচিত্র অনুভূতি জাগে, নিজেকে সে আরও প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে বোম্বাইএ। এই আধুনিক সভ্যজীবনের স্রোতে সে হারিয়ে যাবেনা। নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে উঠতে পারবে বোম্বাইএ। সেখানের পরিধি অনেক বড়। চাই কি ওদের ফার্ম বা অন্য কোন সংস্থায় কাজ নিয়ে সে বিদেশেও যেতে পারবে, তার চেয়ে অনেক নিরেস জিনিষ কমলজিৎ কাউর, রীতা। ওরা বোম্বাই এ থেকে দু-একটা সংস্থার উপর ভর করে এর মধ্যে ইউরোপ, স্টেট্স ঘুরে এসেছে।

রীতা যাচ্ছে আবার ফিলিপাইন্‌স-এ।

কলকাতার উত্তরের একটা পুরোনো পাড়ার বাড়িতে বসে বসে

নিজেকে ওই মেয়ে, সংসার-এর মধ্যে হারিয়ে ফেলতে পারবে না শিখা! সেও একটা সুযোগ চায়।

শিখা ভাবছে কথাটা।

মধু সোমানি বলে—চলো শিখা, নো হ্যারি, ভেবে দেখো এখনও মাসখানেক সময় আছে, ইফ্ ইউ থিংক—ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম অ্যাট্ আওয়ার ফার্ম অ্যাট বোম্বে।

শিখা বলে—একটু ভাবতে দাও মধু!

মধু দেখছে শিখাকে। ওর মনের অতলের ঝড়টা মধু সোমানির নজর এড়ায়নি।

শিখার মনেও কথাটা সাড়া তুলেছে। বোম্বাই এ গেলে নিজের পায়ে দাঁড়াবার ভরসা সে পেয়েছে এর মধ্যে। তাই সাহস করেই এবার শিখা একটা সিদ্ধান্ত নিতে চায়, জানে সময়সুযোগ একবারই আসে, আর যৌবন রূপ থাকতে থাকতে না গেলে বোম্বাই শহরও তাকে পাত্তা দেবেনা।

আজ সন্ধ্যায় শিখা এসেছিল নিজেকে তৈরী করেই। সেই রাত্রে শিখা দেখেছে নিশীথের কণ্ঠস্বরে শাসনের সুর। দেরী করে বাড়ি ফিরেছিল বলে কৈফিয়ৎ চেয়েছে সে। শুনেছে ওই বাড়ির ঝি চাকরদের কথাগুলো। তার সম্বন্ধে সেখানে বিশ্রী ধারণা-গুলোকেই জিইয়ে রেখেছে নিশীথ, মায় ওই ভূষণ চাকর অবধি।

দেখেছে শিখা নিশীথ তার মেয়েকে দিয়েই ওকে অবজ্ঞা করিয়ে চরম অপমান করিয়ে চলেছে। বাবা মেয়ের জগতে তার কোন স্থান নেই। নিশীথ যেন চক্রান্ত করে চলেছে, ইচ্ছা করেই শিখার জীবন নীরব অবহেলা, উপেক্ষার বেদনায় বিবর্ণ করে তুলতে চায়।

শিখা মধু সোমানি আর কিষণলালদের সঙ্গে এই রেস্তোরাঁয় দেখা করেছে, এখান থেকে মধুর ফ্ল্যাটে যাবে। তার সঙ্গে আজ বোম্বাই এর ব্যাপারে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্ত নিতে চায় সে।

হঠাৎ ওদিকে নিশীথ আর রেবাকে ঢুকে ভিতরের টেবিলগুলোর

দিকে যেতে দেখেছে শিখা। ভেবেছিল নিশীথরা দাঁড়াবে, কিন্তু নিশীথ দেখেও দেখেনি শিখাকে। শিখার মুখচোখ কঠিন হয়ে উঠেছে।

রেবা দেখে কি বলছে নিশীথকে।

কিন্তু শিখা দেখে নিশীথ ওকে নিষেধ করে দিল, তাই বোধ হয় রেবাও সাড়া দেয়নি। বের হয়ে এসেছে শিখা। ওদের অবজ্ঞা শিখাকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

গাড়িতে এসে উঠেছে। মধু দেখছে শিখাকে।

—কি হ'ল শিখা ?

শিখা বলে—তোমার কথাটা ভেবে দেখলাম মধু, আই শ্যাল গো। বোম্বাই এ যাবো।

খুশিতে মধু সোমানি ফেটে পড়ে।

—ছাটস্ লাইক এ গুড গার্ল। সুমতি হয়েছে এতদিনে তোমার !

শিখা বলে,

—ভেবে দেখলাম মধু, কলকাতায় পচে মরতে পারব না। এখানে পদে পদে বাধা, পুরোনো সংস্কার, অধিকারের দাবী তুলে সবকিছু স্বাধীনতাকে এরা কেড়ে নিতে চায় ফিউড্যাল লর্ডদের মত। আমি এভাবে বাঁচতে চাইনা, পারব না মধু !

মধু সোমানি দেখছে নোতুন এক শিখাকে। তেজী-দৃপ্ত-সুন্দরী একটি মেয়ে যে আজকের সভ্যতার হাতছানিতে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় সেই উদ্দাম প্রবাহের মাঝে।

মধু বলে—ডোণ্ট ইউ ওরি শিখা। আমার ওখানে তোমার জন্য চাকরী রয়েছে।

শিখা মনে মনে জোর পায়। বলে সে,

—তা জানি মধু ! ইউ আর এ গুড ফ্রেণ্ড।

হাসছে মধু সোমানি।

নিশীথ শিখার ওই জীবনের খবর কিছুটা অনুমান করেছিল বাইরে কোথায় একটা নিবিড় আকর্ষণ ওর আছে, তাই শিখা ঘরের এই জীবন, স্বামী তার সন্তানের জন্য কোনরকম ভাবনা করার, দায়-দায়িত্ব নেবার কথাগুলোকে কোন গুরুত্বই দেয়নি। শুধু কি এক মোহে সেই আলোঝলমল জগতের পানে ছুটে চলেছে।

আজকের সভ্যতার এই গ্লানিকর বিকৃতিকে দেখেছে নিশীথ অনেকের জীবনেই। কিন্তু সেই যন্ত্রণা ঘনিয়ে আসবে তার আপন-জনদের মধ্যে এটা ভাবেনি নিশীথ।

শিখাকে দেখেছে বেশ কিছুদিন অন্যমূর্তিতে ফিরতে, আজ দেখেছে সেই সমাজের কয়েকজনকে। শিখা যেন ভুলই করছে আজ নিশীথ দেখেছে সেই ভুলটাকে।

রাত্রি নেমেছে।

রেবা সারাদিন ঘুরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভূষণ বার দুয়েক খোঁজ নিয়ে গেছে, বৌদি ফেরেনি তখনও। নিশীথের মনে হয় শিখার বাড়াবাড়িটা এবার দৃষ্টিকটুই ঠেকছে।

শিখাকে ফিরতে দেখে চাইল।

এ যেন অন্য কোন জন। নিশীথ শুধোয়,

—এত রাত্রি অবধি প্রায়ই বাইরে থাকো, এইভাবে ফেরো—

শিখা বলে,

—কোথায় কাদের সঙ্গে ঘুরি এসব দেখতে রীতিমত গোয়েন্দা-গিরি শুরু করেছো, তাও জানি। নিজেই তো দেখেছো কোথায়, কাদের সঙ্গে ছিলাম! সো হোয়াট!

নিশীথ চটে ওঠে ওর এই ঔদ্ধত্যে। নিশীথ বলে,

—এ বাড়ির, এই পরিবারের মানসম্মানের প্রশ্নও জড়িত আছে। রাত দুপুরে মত্ত অবস্থায় এ বাড়ির বৌ ঘরে ফিরবে বন্ধুদের সঙ্গে 'র‍্যাঁদেভু' করে এটা আমার ভালো লাগেনা। সহ্য করবো না।

শিখা আজ মুখোমুখি হয়েছে নিশীথের!

এতদিন ধরে শিখার মনে নীরব বিক্ষোভ আর বঞ্চনার যে

পাহাড়টা জমেছিল তাতে যেন ফাটল ধরেছে। কি ব্যর্থ আক্রোশে ফেটে পড়ে শিখা! বলে সে,

—নিজের অধিকার জানাতে চাও তুমি প্রথম থেকেই। বাবা মাকে হাত করে বিয়ের নামে ঠকিয়েছো তুমি আমাকে। আমার সব কেড়ে নিয়ে ঘরে বন্দী করে দাসী বাঁদীর পর্যায়ে আনতে চাও স্বামীত্বের অধিকারে?

নিশীথ দেখছে শিখাকে।

আজ নিশীথও বুঝেছে শিখাও রুখে উঠতে চায়। এই ভাবেই চলবে সে, নিশীথের সম্মানে তাই বাজে কথাটা। বলে সে,

—অন্যায়—ভুলকে ভুল বলতে চাই আমি! যে পথে আলোর পিছনে ছুটছো শিখা, সে আলো নয় আলেয়া। শুধু পথ হারিয়ে যন্ত্রণায় গুমরে মরবে শিখা, এই লোভের মধ্যে তৃপ্তি নেই। আছে শুধু হাহাকার!

শিখা নিশীথের কথায় বলে ওঠে,

—ছলাকলাও অনেকরকম জানো দেখছি। কখন শাসন—কখন দাবী, কখন ভয় সব পথ দিয়েই নিজেদের অধিকারটাকে কায়েম রাখতে চাও।

নিশীথ বিরক্ত হয়ে বলে,

স্পষ্ট করেই জানাচ্ছি—এসব চলবেনা। তুমি স্ত্রী—মা—তোমারও কর্তব্য আছে।

শিখা বলে—এই কর্তব্যের শাসন দিয়ে আটকাতে পারবেনা তোমার সাম্রাজ্যে। আমার নিজেরও স্বাধীনতা আছে। তোমার অত্যাচার-অবজ্ঞা—ওই চক্রান্ত সবকিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার আছে। তাই আমি ঠিক করেছি এখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

নিশীথ চমকে ওঠে!

—কি বলতে চাও তুমি?

আজ শিখা স্পষ্ট স্বরে জানায়—এ বাড়ি থেকে চলে যাবো।

তোমার স্ত্রীর পরিচয় দিতে যদি অসম্মান বোধ করো, সে দায় থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টাই করবো।

আমি বোম্বাই-এ ফিরে যাবো।

নিশীথ চাপাস্বরে ধমকে ওঠে—পাগলামি করোনা? কি যা তা বলছো?

রেবা জেগে উঠেছে ওদের বকাবকিতে।

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে শিখার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়,

—আমার নিজের পথে চলার অধিকার আমার আছে। তুমি বাধা দিতে এসো না। সে বাধা আমি মানবো না। আমি বোম্বাই-এ ফিরে যাচ্ছি। এখানে আর আসতে না হলেই সুখী হবো।

রেবা দেখছে তার মাকে। কঠিন একটি মেয়ে। চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে। ঘাড়ের উপর চুলগুলো কেশরের মত ফুলছে। চোখে কি কাঠিন্যের জ্বালা। রেবা দেখছে ভীত চাহনি মেলে মা শান্ত ওই লোকটিকে কি নিষ্ঠুরতা নিয়ে আক্রমণ করেছে।

রেবা উঠে আসে—বাপি!...

শিখা দেখছে রেবাকে। তার শাসন থেকে নিশীথকে যেন বাঁচাতে চায় মেয়েটি। মায়ের জন্য কোন সমবেদনা নেই। ওর চোখে ফুটে উঠেছে মায়ের প্রতি ঘৃণাই।

রেবা নিশীথের হাত ধরে ডাকছে।

—চলে এসো বাপি! মা—তোমার ঘরে যাও না!

শিখার সারা মন জ্বলে ওঠে মেয়ের ওই কথায়। এতদিন ধরে অনেক অবজ্ঞা সহ্য করেছে সে, আজ রেবার ওই প্রতিবাদ অসহ্য হয়ে ওঠে, এগিয়ে গিয়ে শিখা রেবার নরম গালে সজোরে একটা চড় মেরে গর্জে ওঠে—চুপ কর!

নিশীথ বাধা দেয়—কি করছো? মারবে না ওকে! ওকে কত-টুকু দেখো—ভালোবাসো যে এভাবে মারবে?

কাঁদছে রেবা। শিখা জ্বলে ওঠে,

—যতো কর্তব্য তুমিই করো, না? যতো ভালোবাসা উজাড়

করে দিয়েছো ওকে। তাই অসভ্য, বেয়াড়া হয়ে উঠেছে মেয়েটা। আমাকেও অপমান করাও ওকে দিয়ে। এই শিক্ষা তোমারই।

শিখা বলে,

—দেখছি এবার! তাই তোমার কাছ থেকেও সরিয়ে নিয়ে যাবো ওকে।

—শিখা! নিশীথ এবার চরম বিপদে পড়েছে। শিখা তার সব কিছু কেড়ে নিয়ে যেতে চায়। শিখাও হঠাৎ নিশীথের মনের চরম দুর্বলতাটার সন্ধান পেয়ে মনে মনে খুশি হয়েছে। এবার নিষ্ঠুর শিখা নিশীথকে চরম আঘাতই দেবে। আর ওই অবাধ্য মেয়েকেও শিখিয়ে দেবে—কাকে মানতে হবে তার। ওই নিশীথ নয়—তাকেই! শিখা বিজয়িনীর মত দৃপ্ত স্বরে বলে,

—হ্যাঁ! আমি ওকে নিয়েই বোম্বাই এ ফিরে যাবো।

নিশীথ অসহায় কণ্ঠে আর্তনাদ করে—না। তা হতে পারেনা শিখা। রেবাকে নিয়ে যেতে পারবে না। আর তোমারও যাওয়া হবে না।

রেবা হঠাৎ কি ভয়ে কান্না ভুলে গেছে।

দুচোখে তার নীরব ভয়। শিখা চলে গেছে ওঘরে তার কথা-গুলো শুনিয়ে।

স্তব্ধতা নামে!

নিশীথ কি সব হারাবার বেদনায় ঘাবড়ে গেছে। মুখে চোখে ফুটে উঠেছে তার অসহায় হতাশা।

—বাপি!

রেবার ডাকে চাইল নিশীথ। ছোট্ট মেয়েটা ওকে জড়িয়ে ধরে বলে,

—আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না বাপি?

নিশীথ ওকে সান্ত্বনা দেয়,

—নারে! না!

রেবা বলে—মা খুব দুষ্টু না বাপি! শুধু বকে আমাকে!

—না! না!

রেবা বলে—মারলো!

নিশীথ ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। রাত্রির স্তব্ধতা নামে। রেবার সারা মনে জাগে অজানা একটা ভয়, সব তার হারিয়ে যাবে।

রেবা মায়ের কথা শুনে অবাক হয়।

শিখা মনস্থির করেই ফেলেছে। বলে সে,

—রেবা আমরা এই সোমবার বোম্বাই যাচ্ছি।

আগে দু'একবার গেছে বোম্বাইএ মামা দিদিমার ওখানে। বাবা উৎসাহী হয়ে কেনাকাটা করেছে, রেবাও আনন্দ পেয়েছে কতো তখন।

আজ দেখেছে বাবা চুপচাপ হয়ে গেছে। রেবা বাবাকে বলে—আমি যাবো না বাপি। 'মামণি, তুমি ঘুরে এসো। আমি বাবার কাছেই থাকবো।

ধমকে ওঠে শিখা—না। অবাধ্য হবে না। যা বলছি শোনো।

রেবা চুপ করে যায়।

তবু ভয়ে ভয়ে শুধোয়—বাপি যাবে না?'

নিশীথ চাইল মেয়ের দিকে। নিশীথ শেষ চেষ্টা করেছিল শিখাকে থামাবার। বারবার বলেছিল নিশীথ,

—এ কাজ করো না শিখা। দুচারদিন ঘুরে এসো, ঠিক আছে। ওখানে থাকার কথা ভেবো না। আমাদের মেয়ের মুখ চেয়ে সমাজের সংসারের এই বাঁধনটাকে মেনে নাও।

তোমার স্বাধীনতায় বাধা দিই নি, দেব না। তবে ভুলটাকে শোধরাবার চেষ্টাই করেছিলাম মাত্র। তার জন্য আমাকে ভুল বুঝে রেবার জীবনটা নষ্ট করে দিও না।

শিখা বলে,

—আমার দায়িত্ব আমি পালন করতে পারবো। রেবা আমার

গছেই থাকবে। এ নিয়ে কোন কথা আর ন । বল্লে খুশী হবো!
আমি সব ঠিক করে ফেলেছি।

নিশীথ তবু বলে—তোমাদের খরচা পাতির ও প্রশ্ন আছে।

শিখা বলে,

—নিজের যোগ্যতায় আমার সেটুকু অর্জন ক রার সাধ্যও আছে। তামার কাছে হাত পাতবো না কোনদিনই।

নিশীথ চুপ করে যায়। তবু কি ভেবে বলে,

—তোমার সঙ্গে বোম্বাই অবধি যাই, রেব । তবু কিছুটা শান্ত াকবে।

—না। শিখা বলে—রেবার সব ভাবনা আমাকেই ভাবতে াও। তোমার যাবার কোন দরকার হবে না।

আজ রেবার এই প্রশ্নে নিশীথ অসহায় চাহ নি মেলে দেখছে শিখাকে। শিখা গোছগোছ করছিল, হাতের কাজ বন্ধ রেখে শিখা বলে ওর জরুরী কাজ আছে রেবা। এখন যেতে পারবে না। আমরা দুজনেই যাবো।

ম্লান মুখে চাইল রেবা।

উঠে ঘরে চলে গেল। দুচোখ ছাপিয়ে জল না মে তার।

হাওড়া স্টেশনে বাপি এসেছিল তাদের তুলে দিতে। রেবা হাতে বাবাকে জড়িয়ে ধরে,

তুমি আসবে বাপি আমাকে আনতে।

—যাবো মা! নিশীথ অসহায় মেয়েকে আ শ্বাস দেয়। তবু রবার চোখের জল বাধা মানে না। ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে—কি াহাকারে ফেটে পড়ে রেবা। বাবাকে ফেলে রে খে যেতে হচ্ছে াকে। মা তাকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছে ।

জীবনে বাবাকে পেয়েছিল সব থেকে আপন করে, কিন্তু মা তার াছ থেকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে চলেছে। কেড়ে নিয়েছে তার প্রয়জনকেও।

—চোখ মোছে রেবা।

মায়ের কঠিন কণ্ঠস্বরে চাইল মায়ের দিকে। ফার্স্ট ক্লাশের তুই বার্থের একটা কূপে, তাতে আর কেউ নেই। মা আর সে।

শিখা বলে—কাঁদেনা এমন করে। ইউ লুক অ'ফুল্। চোখ মোছো।

চোখ মুছে চুপ করার চেষ্টা করে রেবা।

ট্রেনটা ছুটে চলেছে রাতের অন্ধকারে। নির্জন অতল অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেছে রেবা। বাবা নেই—আজ সে একা। মায়ের জন্য সেই সুন্দর স্বপ্নটা হারিয়ে গেছে।

মাধবী ভাবতে পারেনি যে এমনি আচমকা শিখা এসে পড়বে বোম্বাই-এ মেয়েকে নিয়ে। ট্যাক্সি থেকে ওদের নামতে দেখে এগিয়ে আসে সুশান্ত—ছোড়দি! আরে রেবা, ইস্ কতো বড় হয়েছিস। নিশীথদা কোথায়? এল না?

উষাও নেমে আসে—এসো শিখা। রেবা—

রেবাকে জড়িয়ে ধরে উষা।

মাধবী বলে—খবর নাই হঠাৎ এসে পড়লি! নিশীথ এল না? মেয়েকে দেখছে দ। রেবার মুখে হাসি নেই।

শিখা আপাততঃ অপ্রিয় প্রশংসা এড়িয়ে যাবার জন্য বলে,

—তার কি স ব লেকচার, ক্লাশ পরীক্ষা-টরীক্ষা রয়েছে। আসতে পারলো না। পরে আসবে হয়তো।

উঃ ট্রেনে যা ধকল গেছে!

মাধবী বলে—স্নান খাওয়া করে একটু জিরিয়ে নিবি চল!

রেবাকে উষা নিয়ে গেছে তার ঘরে।

শিখা দেখছে এ সংসারের মানুষদের। উষা বলে মাধবীকে,

—মা, আপনি স্নান করে পূজা সেরে নিন। শিখা স্নান করছে চা খেয়ে।

মাধবী চলে গেল।

শিখা বলে—তুমিও দেখছি মায়ের দলেই। পুজো-ঠাকুর-সংসার এ সব নিয়েই ডুবে আছো?

উষা হাসে। শান্ত মধুর সেই হাসি। উষা বলে,

—বেশতো আছি। সবাই খাটছে—আমি ওদের দেখভাল করছি। সব নিয়ে সংসার।

শিখার এই সংসার আর বাঁধনটাকে ভালো লাগে না। বলে সে—যতোসব হ্যাক্‌নিড ব্যাপার।

উষা শোনায়—নিজেও তো ওই নিয়েই ডুবে আছো ভাই। মেয়ে হয়েছে, স্বামী-সংসার কি জিনিষ নিজেও তো বুঝেছো?

শিখা চুপ করে থাকে।

উষা বাঈ এর ডাকে চাইল—রসুই কি কি হবে আর ভাবিজি?

উষার খেয়াল হয়। বলে সে,

—রান্নাঘর থেকে আসছি শিখা। তুমি স্নান করে নাও।

মাধবীর তবু নজর এড়ায় নি ব্যাপারটা।

হঠাৎ শিখার এভাবে মেয়েকে নিয়ে চলে আসাটা ভালো লাগেনি তার। শিখাও মাকে এড়িয়ে গেছে। মাধবীর চোখে পড়েছে সেটা। দেখেছে রেবাও চুপচাপ হয়ে রয়েছে।

পরদিন শিখা বের হয়েছে, অনেকদিন পর আবার বোম্বাইএ ফিরেছে শিখা। তার স্বপ্নজগতে ফিরে এসে বের হয়েছে তার সেই সমাজে।

শিবদাসানি বোম্বেতে নেই। কন্‌টিনেণ্টে কোথায় গেছে। মধু সোমানিকে তার নোতুন আপিসেই পেয়ে যায়।

সাততলার পুরো ফ্লোর নিয়ে ওর অফিস। এর মধ্যে সাজানো গোছানো হয়ে গেছে। রিসেপসনে গিয়ে নাম বলতে ভদ্রমহিলা ইণ্টারকমে মিঃ সোমানিকে খবরটা দিতে মধু বলে—ওকে নিয়ে এসো।

বয়স্কা মহিলা দেখছে শিখাকে। ফর্সা তন্বী ধারালো চেহারা

শিখার। দেহে মেদ নেই। ডাগর টানা চোখ নিটোল গালএর লালিমার মাঝে চোখদুটোতে কি নেশা আনা চাহনি ফুটে ওঠে। উন্নত বুকের রেখাগুলো সোচ্চার।

মহিলার চোখেও দেখছে শিখা তার রূপের নীরব প্রশংসা।

খুশি হয় মনে মনে।

দর্পিনীর ভঙ্গীতে চলেছে শিখা হলের মধ্য দিয়ে, মাঝখানে গদরেজের হাল্কা চেয়ার টেবিল পাতা, ওদিকে কয়েকটা টাইপ-রাইটারে কর্মীরা ব্যস্ত। একপাশে দামী ম্যাসনেট বোর্ড। ঝকঝকে থ্রি পিশ দিয়ে বানানো চেম্বারগুলো।

সারা হ'লটাই এয়ারকন্‌ডিশন্‌ড।

ওদিকের ছোট ঘরটার সামনে বোর্ড লাগানো—'মধু সোমানি, ম্যানেজিং ডাইরেকটার'।

রিসেপসন ক্লার্ক সাবধানে দরজাটা খুলে শিখার প্রবেশপথ করে দেয়।

...শিখা পুরু কার্পেটের উপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আলোর উৎস দেখা যায় না, আলোর আভায় উলসে রয়েছে চেম্বারটা। ঠাণ্ডা মনোরম পরিবেশ।

—হ্যাল্লো শিখা!

শিখা এগিয়ে যায় মধু সোমানির টেবিলের দিকে।

ফোনটা বাজছে, মধু ফোন তুলে ইঙ্গিতে ওকে বসতে বলে ফোনে কথা বলছে।

শিখা দেখছে এই জগৎকে। এবার সেও নিজের পায়ে দাঁড়াবে, কারোর অধীনে নয়, স্বাধীন ভাবেই বাঁচবে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে সমাজে।

মধু সোমানিই কথা রেখেছে।

ওকে দেখে বলে মধু—গ্ল্যাড টু মিট ইউ শিখা, নাও ইউ ক্যান জয়েন আস্ ফ্রম টুমরো, এনিডে। ধরো মাসে হাজার দুয়েক টাকা পাবে।

শিখা নিশ্চিন্ত হয়।

দুহাজার টাকার চাকরীটার এত সহজে ব্যবস্থা করে দেবে ভাবেনি শিখা। কিন্তু মনে হয় শিখার মায়ের ওখানে থাকা ঠিক হবে না। মা এটা পছন্দ করবে না। উষাকেও দেখেছে, সে সমর্থন করবে না তাকে। স্বামীর ঘরে ফিরে যাবার জন্যই জ্বালাতন করবে।

মধু সোমানি দেখছে শিখাকে। শুধোয় সে,

—এনি প্রবলেম ?

শিখা বলে—চাকরী তো হ'ল, থাকার আশ্রয় তো চাই মধু! মায়ের ওখানে থাকতে চাই না!

মধুও খুশি হয় মনে মনে।

সেও চেয়েছিল শিখাকে আরও নিবিড় করে পেতে, তাই ওর হাতের মধ্যে আনার কথাই ভাবছিল সে। এবার বলে মধু,

—তোমার যদি অসুবিধা না হয় বান্দ্রার ওদিকে আই ক্যান এ্যারেঞ্জ এ ফ্ল্যাট। টু রুম ফ্ল্যাট—

শিখা যেন হাতে চাঁদ পায়। চাকরী—নিজের একটা ফ্ল্যাট! বলে শিখা—কিন্তু টাকা এত কোথায় পাবো এখন মধু! কতো চায় তারা ফ্ল্যাটের জন্যে ?

মধু সোমানিদের এমন স্বনামে বেনামে অনেক ফ্লাটই আছে বোম্বাই শহরে ছড়ানো। কালো টাকাকে এই ভাবেও কিছুটা কাজে লাগিয়েছে।

মধু বলে—ডোণ্ট ইউ ওরি। লিভ ইট টু মি!

বেয়ারা কফি এনেছে। মধু বলে—কাজকম্মো কাল পরশু থেকে সে বুঝে নাও।

ঘাড় নাড়ে শিখা।

মধু সোমানিই আজ তার পরিত্রাতা। ওর জন্য সময়ের অভাব খন হবে না। মধু বলে—চলো, আজ ফ্ল্যাটটা তোমাকে দেখিয়ে বিটা দিয়ে দেব। ওখানে কিছু ফার্ণিচার অবশ্য আছে, বিধেমত শিফট করে নাও।

শিখা মনে মনে নিশ্চিন্ত হয়।

মধু সোমানী মিথ্যা আশ্বাস তাকে দেয় নি, আজ সে নোতুন করে বাঁচতে পারবে।

ঝড়ো হাওয়া বয়, উথলপাথাল হাওয়া কাঁপছে নারকেল গাছের পাতায়, বান্দ্রার এদিকে টিলার গায়ে বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে বড় বাড়িটা মাথা তুলেছে, একটা রাস্তা টিলার গা থেকে নেমে গিয়ে মিশেছে সমুদ্রের ধারে কার্টার রোডে। বড় রাস্তাটা এঁকে বেঁকে চলে গেছে সমুদ্রের ধার ঘেঁসে ওপাশে ডাঙার দিকে। একদিকে সারবন্দী সাজানো বাংলো—বড় বড় বাড়ি, অন্যদিকে মুক্ত আরব সমুদ্র, ভাঁটার সময় রাস্তার নীচে থেকে সমুদ্রের জল সরে যায়, জেগে ওঠে কাল্‌চে জমাট পাথরের বুক, ঠাঁই ঠাঁই জল—মান্‌গ্রোভ গাছের ঝোঁপ—পলিকাদা জেগে ওঠে। দু একটা জেলেদের ডিঙ্গি নৌকা পড়ে থাকে পাথরের ওপর।

এদিকে আধুনিক বোম্বাই।

ফ্ল্যাটটা সমুদ্রের দিকে। এখানে সমুদ্রের দিকে মুখকরা বাড়ি—ফ্ল্যাটের কদর বেশী, দামও অনেক। চারতলার উপর সুন্দর ছিমছাম ফ্ল্যাট, এদিকটা এখনও নিরিবিলিই। মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে কিছু গাড়ি যাতায়াত করে, দুচারজন পথচারীকে দেখা যায় মাত্র।

…দুটো বেডরুম, সামনে ডাইনিং স্পেস, ওদিকে একটা এ্যান্টি রুম মত, সেটাকে ছোট ড্রইং রুমে পরিণত করা যায়। কিচেনে কুকিং রেঞ্জ, গ্যাসও আছে, বাথরুমটাও বেশ ঝকঝকে, শিখার কলকাতার বাড়ির তুলনায় অনেক ছোট, কিন্তু এটা আরো আধুনিক।

বাথরুমে গরমজলের গিজার, বাথটাব সবই আছে। প্যাণ্টাইলের ঘন রং বাহারএর টালি বসানো। দেখেই পছন্দ হয়ে যায় শিখার।

—ভেরি ফাইন মধু! চার্মিং!

মধু সোমানি দেখছে শিখাকে। খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে শিখা।

মধু সোমানি এ ফ্ল্যাটে মাঝে মাঝে আসার ব্যবস্থাই রেখেছিল। ক্যাবার্ড থেকে মধু ড্রিঙ্কস্ সোডা বের করেছে। কাজু বাদামও বের হয়। মধু বলে এসো শিখা। জাস্ট এ ড্রপ টু সেলিব্রেট ইয়োর হোম্ কামিং!

মধু আজ শিখাকে কাছে টেনে নেয়। আজ মধু সোমানিও মনে মনে সাহসী হয়ে উঠেছে। কলকাতার সেই ভীরুতা তার মনে আর নেই। শিখাকে আজ সে হাতের মধ্যে পেয়েছে। অবশ্য তার জন্য অনেক কিছুই করেছে মধুও।

···চোখে ওর হুইস্কির তরল মাদকতা।

শিখার বুভুক্ষু বেপরোয়া দেহে মনে সমুদ্রের মত্ত মাতন উঠেছে।

—শিখা!

শিখার নবজাগ্রত বুভুক্ষু একটি সত্বা আজ এই জীবনের সব গরল আনন্দকে নিঃশেষে পেতে চায়। কি উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সে।

অন্ধকার নামছে—সেই অন্ধকারে দুটি প্রাণী কোন আদিম চেতনার পরম পরিতৃপ্তির গভীরে হারিয়ে যায়। সমুদ্রের জোয়ার এসেছে—মত্ত তাণ্ডবে ঢেউগুলো আছড়ে পড়ে পাথরের স্তূপে।

ছোট্ট রেবা একাই এবাড়িতে রয়েছে। মা বের হয়ে গেছে দুপুরে। এখনও ফেরে নি। ওদিকের ঘরে দিদা মামীমায়ের গলা শোনা যায়। রেবার এই নিঃসঙ্গতা বিষময় ঠেকে।

কলকাতায় ভূষণ দা, মানদা—বাচ্চা চাকর নন্থু সকলে ছিল। ভূষণদা রাজপুত্র, বাঘ, আরও কত কি গল্প শোনাতো। বৈকালে এমনি সময় নন্থুর সঙ্গে পার্কে খেলতে যেতো, না হয় তাদের বাড়িতে আসতো ইভা, সুরমা, লিলি—ওরা বাগানে ব্যাডমিণ্টন, চোর পুলিশ খেলতো। নন্থুটা বোকা—কেবল চোর হয়ে যেতো।

আর বকুনি খেতো রেবার কাছে।

—তুই হাঁদারাম নন্থু!

নন্থু হাসতো! আবার কোন দিন বৈকালে নন্থুর সঙ্গে ট্রাম-

লাইন পার হয়ে সোজা রাস্তা ধরে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যেতো। অনেক ছেলেমেয়েরা ভিড় করে সেখানে।

গঙ্গার বিস্তারের দিকে চেয়ে থাকতো রেবা। নৌকাগুলো পাল তুলে ভেসে চলেছে, গঙ্গা গিয়ে নাকি সমুদ্রে মিশেছে। নন্তু বলে—বিরাট বিরাট ঢেউ সমুদ্রে।

রেবা শোনে বিচিত্র সেই সব কাহিনী, ঝালমুড়ি—ফুচকাও খেতো তারা। সেদিন ভূষণদা নন্তুকে মেরেছিল—কোথায় নিয়ে যাস রেবাকে ? একদিন পথ হারিয়ে তুজনেই বুঝবি মজা।

রেবা শুধোয়—পথ হারালে কোথায় যাবো ভূষণদা ?

ভূষণ বলে—ছেলেধরারা ধরে নিয়ে কোথায় কোন মুলুকে চলে যাবে তার ঠিকানা আছে! বাবা তখন খুঁজেও পাবে না, আর এ বাড়িতে ফিরতেও পারবে না।

···রেবার এমনি বৈকালে মনে পড়ে ভূষণদার কথাগুলো। মনে হয় সত্যিই যেন পথ হারিয়ে গেছে রেবার। বাড়িব সেই পরিবেশ থেকে সে আজ নির্বাসিত। সেই বাড়িতে, বাবার কাছে ফেরারপথ তার জানা নেই। ভূষণদা, নন্তু ওরাও সব হারিয়ে গেছে।

বাবা!

রেবার তুচোখে জল নামে।

হঠাৎ দিদাকে দেখে চাইল রেবা। মাধবীও অবাক হয়।

—একা একা ছাদে কি করছিস রেবা ? ওমা কাঁদছিস তুই ? কি হল রে ?

রেবার চাপা কান্না এবার অঝোর ধারে ঝরে পড়ে।

দিদার বুকে মাথা রেখে কাঁদছে রেবা, ফুলে ফুলে ওঠে তার দেহ।

মাধবী বলে—বাবার জন্যে মন খারাপ করছে ?

মাথা নাড়ে রেবা। মাধবী বলে,

—ছিঃ, কান্না কিসের! আবার তো ফিরে যাবি বাপির কাছে।

বাপি আসবে তোদের নিয়ে যেতে। ক'টা দিন বাপকে ছেড়ে থাকতে পারবি না? পাগলি?

রেবাও তেমনি স্বপ্ন দেখেছিল।

কিন্তু মায়ের সেই কলকাতার রূপটা—তার কথাগুলো মনে পড়ে। রেবা জেনেছে মা বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেই সরে এসেছে। জানিয়ে এসেছে আর কলকাতায় ফিরবে না। মেয়েকেও ফিরতে দেবে না।

রেবা বলে দিদিমায়ের কথায়,

—মা আর ওখানে ফিরবে না দিদা। আমাকেও ফিরতে দেবে না বাপির কাছে কোনদিন!

মাধবী অবাক হয়।

উষাও উঠে এসেছিল ছাদে। সে দেখেছে ওদের। রেবার কথাটাও শুনেছে উষা। মাধবীর মনে হয় কোথায় একটা গোলমালই হয়ে গেছে। শিখা সেকথা জানায় নি মাকে, কিন্তু তার অমনি হঠাৎ চলে আসায়, ওর চুপচাপ থাকায় মায়ের কিছু সন্দেহ হয়েছিল।

তাই রেবার কথায় মাধবীদেবী শুধোয়—সে কি রে রেবা?

রেবা বলে,

—হ্যাঁ দিদা। মা বাবার সঙ্গে আগেও ঝগড়া হতো। মা যখন তখন রাতে বাড়ি ফিরতো। সেদিন মা বাবাকে স্পষ্ট বলেছে, ওখানে সে থাকবে না। আমাকেও থাকতে দেবে না। বাপিও আসতে চেয়েছিল। কিন্তু তাকেও আসতে দেয়নি। মা জোর করে আমাকে নিয়ে ওবাড়ি থেকে চলে এসেছে।

মাধবী উষাকে দেখে চাইল। রেবার ওই কথাগুলো তাদের মধ্যে কি একটা ঝড় তুলেছে। মাধবী তবু রেবাকে থামাবার চেষ্টা করে।

—চুপ কর রেবা। একটা ব্যবস্থা হবেই। তুই আবার ফিরে যাবি বাবার কাছে। তোর বাবাকে আমি চিঠি দিচ্ছি।

রেবা বাবাকে কখনও চিঠি লেখেনি। বাবার কথা বার বার মনে পড়ে। বলে সে—বাপিকে আমিও চিঠি দেব দিদা!

মাধবী দেখছে মেয়েটাকে।

বাবার জন্য তার বুক ভরা ভালোবাসাটাও মাধবীর নজর এড়ায় নি। বেশ বোঝে মাধবী, রেবা মাকে কাছে পায়নি। পায়নি তার স্নেহ। যা পেয়েছে তা ওই বাবার কাছেই। তাই বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না সে। আর সেটা জেনেই শিখা মেয়েকে সরিয়ে এনেছে জোর করে বাবার কাছ থেকে শুধুমাত্র নিজের দখল, প্রতিষ্ঠা কায়েম করার জন্যই।

মাধবী তবু এ নিয়ে শিখার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

ঊষাও বলে—আমি কিছু বলবো না মা!

মাধবী চাইল ওর দিকে—কেন? এতবড় ভুল করবে শিখা, তাকে শুধরে দেবে না?

ঊষা বলে—ব্যাপারটা খুবই ব্যক্তিগত মা। আমি পরের মেয়ে বেশী চাপ দিলে শিখা ভাববে আমরা তাকে এখানে থাকতে দিতে চাই না। অন্য রকম ভাববে, আপনি বললে এটা ভাববে না সে।

মাধবীও বুঝেছে কথাটা।

বলে সে—ঠিক আছে। যা বলার আমিই বলবো। এমন স্বামীকে ছেড়ে এখানে থাকবে ওই নরকে, এখান থেকে ওকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম মা, তবু সেই পরিবেশকে সে মানিয়ে নিতে পারলো না। মেনে নিতে পারবে না নিশীথের মত ছেলেকে এ কেমন কথা?

মাধবীর কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই বিশ্রী ঠেকে। সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, রাত্রি নেমেছে। সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়া এসে লাগে দেওদার গাছে, পাহাড়ের উপর আকাশ ছোঁয়া বাড়িগুলোয় আলোর আভা

জাগে, আকাশের বুকে লাল আলোর ছটা নিয়ে মাথা তুলেছে বোম্বাই দূরদর্শনএর টাওয়ারটা।

প্রশান্তও শুনেছে ব্যাপারটা।

শিখা এসে নামছে ট্যাক্সি থেকে। চোখমুখে একটা খুশীর আবেশ। ওর কাঁধের বব্ড চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে। সিল্কের শাড়িটা দেহের রেখাগুলোকে সোচ্চার করে তুলেছে। আজ শিখা নিজের পথ পেয়েছে। চাকরী, নিজের আশ্রয় সবকিছু।

—শোন!

বারান্দা দিয়ে ওদিকের ঘরে চলেছে শিখা, মায়ের গম্ভীর গলার ডাকে থমকে দাঁড়ালো। মাধবীর চোখে চশমা, কি বই পড়ছিল। মাথার চুলগুলোয় রূপালী রং ধরেছে, মুখটা গম্ভীর। শিখা একটু অবাক হয়। তবু এগিয়ে আসে এ ঘরে।

—কি!

মাধবী বলে—নিশীথের সঙ্গে কি হয়েছে তোর? ওখান থেকে ঝগড়া করে চলে এসেছিস?

মাধবীর কথায় শিখা অবাক হয়। এসব কথা সে মাকে—কাউকেই জানায় নি। নিজেই নিজের পথ করে নিয়ে জানাবে ভেবেছিল। কিন্তু তার আগেই মা এসব জেনে গেছে। শিখা শুধোয়,

—কোত্থেকে শুনলে এসব কথা? ও কলকাতা থেকে চিঠি দিয়ে সাতখান করে লাগিয়েছে বুঝি? ননসেন্স—

মাধবী মেয়ের কথায় এবার ধমকের সুরে বলে,

—না। নিশীথ এত ছোটলোক নয়, সে চিঠিই দেয়নি। মান-সম্মান বোধ তার আছে।

শিখা ভাবছে কথাটা। তাহলে রেবাই হয়তো কিছু বলেছে।

মায়ের নামে ওইটুকু মেয়ে এখন থেকেই এসব কথা লাগাতে পারে ভেবে চটে উঠেছে সে। শিখা শুধোয়,

—রেবা বলেছে তাহলে?

মাধবী বলে—যেই বলুক। এ কি করেছিস তুই? নিজের ওই মেয়েটার এতবড় সর্বনাশ করবি? একটা সত্যিকার ভালো মানুষের উপর এতবড় অবিচার করবি কেন? কিসের নেশায়? ছিঃ ছিঃ। মুখ দেখাবি কি করে? আর মেয়েটার ভবিষ্যৎ আছে!

শিখা মায়ের কথায় জবাব দেয়,

—ওসব আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার মা। বাইরে থেকে যা দেখেছো নিশীথের, কাছ থেকে তার রূপটা সম্পুর্ণ বিপরীত। নিজেকে তার তাঁবে রাখতে পারলাম না। তাই সরে এসেছি।

মাধবী চমকে ওঠে।

—কি বলছিস শিখা? এতবড় ভুল করবি? ওরে না, না। এ হয় না। মেয়েটার মুখ চেয়েও তোকে সইতে হবে।

শিখা বলে—অনেক সয়েছি। আর নয়। আমার পথ আমি দেখে নিতে পারবো মা। তোমাদের কারোও বোঝা হয়ে থাকছি না। আর আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ? সে সম্বন্ধে তোমরা মাথা নাইবা ঘামালে! ওটা আমাকেই ভাবতে দাও।

কালই এবাড়ি ছেড়ে আমি নোতুন ফ্ল্যাট পেয়েছি সেখানেই উঠে যাবো রেবাকে নিয়ে।

উষা চমকে ওঠে। শিখা যে এই ভাবে নিজের পথে এগোবে তা ভাবতে পারেনি। বলে সে,

—একি করছো শিখা! মেয়েটা ওখানে যাবে? তুমিও—

শিখা বলে—হ্যাঁ চাকরীও পেয়েছি, নিজের সব দায়িত্ব নিজেই নিতে চাই, স্বাধীন ভাবে বাঁচতে চাই মা। এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, এখানে মাথা গলিয়ো না। রেবা চলে এসো!

শিখা কথাগুলো ঘোষণা করে চলে গেল বীর দর্পে নিজের ঘরে। রেবা মায়ের ওই কঠিন মূর্তির দিকে চেয়ে ভয়ে শুকিয়ে গেছে। মা চলে যাবার পর দিদাকে জড়িয়ে ধরে। বেশ বুঝেছে মা এবার তাকেও ছাড়বে না।

ভয়ে দুচোখ জলে ভরে আসে ছোট মেয়েটার।

মাধবীও বোবা হয়ে গেছে। এমনি একটা চরম আঘাত আসবে তার মেয়ের কাছ থেকে এ কোনদিনই ভাবে নি।

প্রশান্তকে দেখে আর্তকণ্ঠে বলে মাধবী,

—কি হবে প্রশান্ত!

প্রশান্ত বলে—আইনের কথাই বলেছে শিখা। ওকে বাধা দিতে পারবে না মা।

মাধবী আর্তনাদ করে ওঠে,

—আইন! এ কোন আইন রে? ধর্ম-সংস্কার-মানবিকতা-এসবও মানবে না ওরা?

এর জবাব প্রশান্তও জানে না।

মাধবীর সারা মন কি নীরব হাহাকারে ভরে ওঠে। তবু বলে সে, —প্রশান্ত এ আমি ভাবতে পারছি না। একবার নিশীথকে এখানে আসতে লেখ বাছা, বল আমি তাকে আসতে বলছি। তবু শেষ চেষ্টা করে দেখবো যদি এই সব্বোনাশ এড়ানো যায়।

প্রশান্ত জানে শিখাকে। ওর মেলামেশার সমাজের খবরও রাখে।

বলে প্রশান্ত—বলছো লিখছি নিশীথদাকে; কিন্তু কি লাভ হবে জানিনা মা।

শিখা কি এক জেদের বশেই এসব করে চলেছে। দেখেছে মা-ঊষা-প্রশান্ত কেউই তার এই কাজটাকে সমর্থন করে নি। মেনে নিতে পারেনি রেবাও। ছোট মেয়েটার চোখে দেখেছে শিখা কি একটা কাঠিন্য।

প্রতিবাদ করতে পারেনি, কিন্তু খুশী মনে মেনে নিতেও পারেনি এই ব্যাপারটাকে রেবা। মা তাকে সব কিছু থেকে সরিয়ে এনে যেন বন্দী করে রেখেছে এখানে।

নোতুন ফ্ল্যাটে উঠে এসেছে শিখা তার পর দিনই। জিনিষপত্র বেশী কিছু আনেনি কলকাতা থেকে। মাত্র কয়েকটা সুটকেশ,

ট্রাঙ্ক। পরদিন সকালেই ট্যাক্সি ডেকে এনে শিখা মালপত্র তুলে, রেবাকে নিয়ে উঠেছে ট্যাক্সিতে।

মাধবীর চোখে জল নামে, শেষ মুহূর্তেও নিষেধ করে,

—এ কি করছিস শিখা? মেয়েটাকে রেখে যা এখানে, একা ওখানে কোথায় থাকবে বেচারা?

শিখা মায়ের কোন কথাই শোনেনি। রেবা আশা করেছিল মা অন্ততঃ তাকে দিদার কাছে, মামীমার কাছে থাকতে দেবে এই বাড়িতে। তবু এদের সঙ্গে ভালোই থাকবে সে।

কিন্তু শিখা ধমকে ওঠে—চলো রেবা। দিনদিন বেয়াড়া হয়ে উঠছো। এসব সহ্য করবো না। কাম অন্!

মাধবী চুপ করে থাকে। শিখা তার মেয়েকে নিয়ে এখান থেকে চলে গেল। সরবে ঘোষণা করে গেল শিখা কাউকে তার দরকার নেই। রেবা সেই মুহূর্ত থেকে নিজেকে নির্বাসিত নিঃসঙ্গ মনে করেছে। কেউ তার পাশে নেই।

তার সব প্রিয়জনদের রেবার কাছ থেকে তার মা কেড়ে নিয়েছে। মায়ের এই চরম স্বার্থপর রূপটাই রেবার শিশুমনের পরতে গভীর ভাবে রেখাপাত করে।

রেবাও কঠিন হয়ে ওঠে। দেখছে সে বিচিত্র জগতের রূপটাকে।

রেবা এখন একাই এ বাড়িতে রয়েছে। মা সকাল বেলায় কাজে বের হয়ে যায়, বাড়িতে থাকে বুড়ি অম্বা বাঈ।

কালো পেটা চেহারা, বান্দ্রার সমুদ্রধার ঘেঁসে ঘুরে ঘুরে যে যে রাস্তাটা গেছে সেটা বান্দ্রা ছাড়িয়ে বালুচর, কিছু উষর পাহাড়ের পাশ দিয়ে আরও এগিয়ে গেছে। ওদিকে দেখা যায় জুহুর সমুদ্র তীর। ফাঁকা জায়গায় একটা ছোট এয়ারস্ট্রিপ, ছোট ছোট প্লেনগুলো ওখানে নামে ওঠে।

তার এদিকে সমুদ্রের ধারে বালিচর—রুক্ষ পাহাড়ের গায়ে ঝুপড়ির ভিড়। সারবন্দী ঝুপড়িগুলো এসে সমুদ্রের ধারে শেষ

হয়েছে। নীচে সমুদ্রের মরা ভাটিতে ভিড় করে ছোট বড় মাছ-ধরা নৌকাগুলো। ওখানে জেলেদের বিরাট বসতি। মাছ ধরে আনে সমুদ্র থেকে। বেশ কিছু মাছ বাজারে চলে যায়। অনেক ছোট মাছকে বালিতে শুকিয়ে স্টকি করে।

বাতাসে ওঠে মাছের আঁশটে গন্ধ। ঝুপড়ির আশপাশে দুএকটা চা-খানা, জেলেরা কোমরে বিরাট রঙীন একটুকরো কাপড় জড়িয়ে খালি গায়ে বসে চা খায়, চোলাই মদও গেলে। জোয়ারের মুখে সারবন্দী নৌকা বের হয়ে যায় দূর সমুদ্রে, নৌকাগুলোর অনেক-গুলিতেই মটর ইঞ্জিন লাগানো। দাঁড় টানে—দরকার হলে আবার ইঞ্জিনেও চলে।

অম্বাবাঈ ওই পাড়ারই মেয়ে।

স্বামী রমেশ মাছ মারতে যায়, এককালে নিজের নৌকা ছিল, কিন্তু মদের নেশায় সব উড়িয়ে দিয়ে এখন রমেশ অপরের নৌকায় মাছ মারতে যায়, আর অম্বাবাঈ ঝগড়া করেই ওই বাঈ এর কাজ নিয়েছে।

অম্বাবাঈ এর পেটা চেহারা। রেবার প্রথম দিন দেখে ওকে ও ভয় করতো।

গলাটা ভরাটি, আর তেমনি দাপট ওর। শিখা বলে,

—কাজকম্মো সব করনে হোগা বাঈ, দিদিমণিকো দেখভাল করনা।

রেবা দেখছে অম্বা বাঈকে।

অম্বাবাঈ দেখছে রেবাকে। বলে সে—জী দিদি। সব হো যায়েগা। কোঈ ফিকির মৎ করিয়ে!

অম্বাবাঈ বাড়িতেই থাকে। রেবাকেও শিখা এখানের স্কুলে ভর্তি করিয়েছে। ছাত্রী হিসাবে রেবা ভালোই, তাই ভালো মিশনারী স্কুলে ভর্তি হতে অসুবিধা হয় নি।

তবু কিছুটা সময় কাটে রেবার স্কুলে গিয়ে। শিখা সকালেই স্নান সেরে ব্রেকফাস্ট নিয়ে বের হয়ে যায় অফিসে, রেবাকে অম্বাবাঈ স্কুলে দিয়ে আসে বান্দ্রার পালিহিলের ওপাশে।

রেবা বলে—একাই যেতে পারবো বাঈ। অম্বাবাঈ ধমকে ওঠে—চলো, হম ভি সাথ চলেগা।

বৈকালেও রেবা বের হয় অম্বাবাঈ'এর সঙ্গে। কার্টার রোড ধরে কোনদিন অম্বাবাঈদের ডাণ্ডার জেলে পাড়ার বসতিতেও যায়। সেদিন অম্বাবাঈকে দেখে অন্য মূর্তিতে।

লোকটা ঠাব্‌রা খেয়ে টলছে। কালো লম্বা লোকটা। রেবা মাতালদের দেখলে ভয় পায়। অম্বা ও লোকটাকে কাছে আসতে দেখে চাইল।

রেবা দেখছে লোকটা এসে অম্বাবাঈকে কি বলছে। ছু-একটা কথার পরই চমকে ওঠে রেবা। অম্বাবাই লোকটাকে একটা চড় কসেছে।

লোকটাও রুখে ওঠে, কিন্তু অম্বাবাঈ ততক্ষণে আরও ছুটো চড় কসে এক ধাক্কায় তাকে বালিতে ফেলে ছুহাত কোমরে দিয়ে বেশ বীরাঙ্গনার মত ভঙ্গীতে শাসায়।

—ফিন তন্‌ করেগা—জান্‌সে মার দেগা!

রেবা ভয় পেয়ে গেছে। আশপাশের বস্তির লোকজনও বের হয়েছে, হাসছে অনেকে। বাতাসে ওঠে স্টুটকি সামুদ্রিক মাছের বিটকেল গন্ধ। জাল শুকুচ্ছে বালিতে।

রেবা ডাকে—বাঈ!

লোকটা মারধোর খেয়ে বালিতে বসেছে। অম্বাবাঈ ওর দিকে চেয়ে বলে—চলো রেবা।

রেবার ভয় যায় না। শুধায় লোকটা কে বাঈ?

—হামারা ঘরবালা, মাতোয়ালা হারামজাদ কাঁহিকা। ঠাব্‌রা পিবে—দেগা দো চার ঝাপ্পড়!

লোকটা ওর স্বামী দেবতাকে অবলীলাক্রমে ছুচার ঘা চড় থাপ্পড় কসে বের হয়ে এল। অম্বাবাঈ বলে,

—হামি আপনা কামাই করে, উ'কে কোন পুছবে? সরাবী কাঁহিকা।

রেবা অম্বাবাঈ'এর স্বামীকে দেখেছে।

তার মায়ের কথা মনে পড়ে। অম্বাবাঈ এর স্বামী মাতাল, ওকে খেতে পরতে দেয়না তাই ওর এত রাগ, সরে এসেছে ওর কাছ থেকে।

কিন্তু রেবার বাবাতো এমন নয়। তবে কেন মা চলে এল বাবার কাছ থেকে? কতো দিন! প্রায় মাস-তুয়েক হয়ে গেল বাবার ওখান থেকে এসেছে! চিঠি দিয়েছিল বাবাকে—এখানের ঠিকানায় বাবার চিঠি আসতে সেটা মায়ের হাতে পড়ে।

মায়ের সেই চেহারাটা ভুলতে পারেনা রেবা। সন্ধ্যার পর একটু বেশীরাত্রে কোন কোন দিন ফেরে মা। রেবা পড়ছে সেদিন, মায়ের ডাকে চাইল।

ওর হাতে একখানা চিঠি। রেবা খুশীতে কলকলিয়ে ওঠে!

—বাবার চিঠি! কি লিখেছে মা আমাকে! দাও—

চিঠিখানা লাফিয়ে নিতে আসে। রেবার সারা মনে বাবার সম্বন্ধে চিন্তার আলোড়ন জাগে।

কিন্তু শিখা চিঠিখানা নিজের হাতে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলে, চোখের সামনে ওই সর্বনাশ দেখে চীৎকার করে ওঠে রেবা।

—মা! একি করলে মা! না—

রেবার গালেই চড়টা পড়েছে। শিখা মেয়ের এই অবাধ্যতায় চটে উঠেছে। গর্জায় সে—আমাকে না জানিয়ে কলকাতায় চিঠি দেওয়া হয়। শেষবারের মত বলছি ওসব করবে না। এ চিঠির নিকুচি করেছি আমি! ওসব আমি কোন দিন সহ্য করবো না।

রেবার গালে চড়টা যত না জোরে বসেছে তার চেয়ে জোরে বসেছে মায়ের ওই কথাগুলো। বাবার কাছ থেকে সরিয়ে এনেও খুশী হয়নি, তার সঙ্গে চিঠির সম্পর্কটুকুও রাখতে দিতে রাজী নয়।

রেবা মাকে দেখছে। তার চোখের জলটা কি তুঃসহ জ্বালায় পরিণত হয়েছে।

বাবার কোন খবর এখানে আর আসে না। স্কুল থেকে বের

হয়ে ছু'একদিন চলে যাবে দিদার ওখানে, কিন্তু ভয় হয়। পথ চেনে না। লিংকিং রোড একটু দূরে, আর গাড়িগুলো এখানের রাস্তায় ঝড়ের বেগে যাতায়াত করে।

দিদিমাদের ওখানেও মন চাইলে যেতে পারে না। আর একটু বড় হলে সে যাবেই।

তার ক্লাশের ছু'একজন মেয়ের সঙ্গে ক্রমশঃ পরিচয় হয়েছে। বাঙ্গালী মেয়েও বেশ কিছু আছে। তবে এখানের স্কুলে সকলেরই একরকম পোষাক আর ক্লাশ টিচার থেকে স্থরু করে সকলের সঙ্গে এখানে ইংরাজীতেই বেশী কথাবার্তা বলতে হয়।

তবু গৌরীকে চিনতে দেরী হয়নি তার।

গৌরী বলে—তোমাকে দেখেছি এর আগে। ফোরটিন্থ রোডে তোমার মামার বাড়ি তো ?

রেবা খুশি হয়—হ্যাঁ !

গৌরী বলে—প্রশান্তবাবু তোমার মামা ! ওদের বাড়ির পাশেই আমাদের ফ্ল্যাট, নারকেল গাছওলা বাড়িটা।

রেবার সঙ্গে তার ভাব জমতে দেরী হয় না।

দেখেছে রেবা গৌরীকে স্কুল থেকে নিতে ওদের গাড়ি আসে।

রেবা বেশ বুঝেছে মা তাকে দিদার ওখানেও যেতে দিতে চায় না। তাই বোধ হয় অম্বাবাঈ'এর উপর কড়া হুকুম, ওকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে যাবে আবার নিয়ে আসবে।

সেদিন রেবা বলে—বাঈ বৈকালে তোমাকে স্কুলে যেতে হবে না। আমি ক্লাশের এক বন্ধুর বাড়ি হয়েই, ফিরবো।

বাঈ'এর বাজার হাট করতে হবে, একটু ফুরসৎ পেলে সে আজ বাড়িতেও যাবে। সেদিন মারধোর করার পর লোকটার জন্য মন খারাপ করে, যেতেও পারেনি ক'দিন। রেবার কথায় খুশী হয়।

রেবা বলে—ওই যে পালি হিলের উপর বাড়ি ওদের, ওদের গাড়িতেই ফিরবো মা চলে আসার আগেই।

বাঙ্গীও নিশ্চিন্ত হয় ঠিক আসবে, আমিও ততক্ষণে ফিরে আসবো বাজার শেষ করে।

রেবা আজ স্কুলের ছুটির পর গৌরীদের গাড়িতেই বের হয় দিদার কাছে যাবার জন্য। ওখানে একা একা ভালো লাগে না। পড়া আর বাঙ্গী-এর সঙ্গে মাছ ধরার গল্প করা না হয় জানলা থেকে মুক্ত সমুদ্রের অসীমে চেয়ে থাকা এছাড়া করার কিছুই নেই।

রেবা অনেকদিন পর লুকিয়ে চলে এসেছে এ বাড়িতে।

মাধবী অবাক হয়। জড়িয়ে ধরে রেবাকে।

—তুই! তোর মা জানে তো এখানে এসেছিস? একা এলি—না কারোর সঙ্গে!

মামীমাও এসে হাজির হয়েছে।

স্কুলের পোষাকে রেবাকে অনেক স্মার্ট দেখায়, রেবা বলে,

—ওইতো পাশেই গৌরীদের বাড়ি। গৌরী আমার ক্লাশেই পড়ে। ওদের গাড়িতেই চলে এলাম! মাকে বলে আসিনি দিদা, মা আসতে দিতে চায় না!

মাধবী চাইল রেবার দিকে। বলে সে,

—মা জানতে পারলে বকাবকি করবে।

রেবা শোনায়—করুক। মুখ বুজে একা একা থাকা যায়? বাবার একখানা চিঠি এসেছিল, আমাকে দিয়েছিল বাবা। মা চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে দিল, দেখতেও দিল না।

বাবার জন্য মন কেমন করে না!

উষা দেখছে মেয়েটাকে। রেবার ছুচোখ জলে ভরে আসে।

মাধবীও বুঝেছে ওর বেদনাটা। এই ভয়ই করেছিল মাধবী। শিখাকে চেনে; তার সমাজে—তার জগতে সে হুল্লোড় নিয়ে মেতে আছে। একা একা মরছে কচি মেয়েটা।

বলে মাধবী—তোর বাবা ছু'একদিনের মধ্যে বোম্বাই আসছে। মাধবীও লিখেছিল নিশীথকে এখানে আসতে, কিন্তু নিশীথ মাস-

খানেক বাইরে ছিল, ফিরে এসে সেও এখানে আসার কথ
জানিয়েছে।

রেবা খবরটা শুনে উচ্ছল কণ্ঠে বলে—

সত্যি দিদা! আমি বাবার সঙ্গে ফিরে যাবো, মা না যায় ন
যাক!

মাধবী বুঝেছে রেবার ব্যাকুলতা।

বাবাই ওর সব, একান্ত নির্ভর। আজ তাকে হারিয়ে ও
রেবার জীবন ব্যর্থ হতে চলেছে। মাধবীও খুশী হবে শিখা যদি
রেবাকে যেতে দেয় নিশীথের সঙ্গে।

মামীমা একরাশ খাবার এনেছে।

পাটিসাপটা, বেনারসীর দোকানের সন্দেশ, রসগোল্লা। রেব
বলে—ওমা কতো খাবো!

সন্ধ্যা নামছে।

খুশিভরা মন নিয়ে আসছে রেবা মামীমার সঙ্গে। উষা ওকে
পৌঁছে দিতে আসছে। উষাও ভাবে কথাটা। মনে হয় শিখাকে
বুঝিয়ে বল্লে সে বোধ হয় রাজী হবে ফিরতে।

রেবা বলে—তুমি আমাদের বাড়ি যাবে মামীমা?

উষা চাইল—কেন রে?

রেবা চেনে তার মাকে। বলে সে,

—তোমাকে আমার সঙ্গে দেখলে মা আমাকেই বকবে মামীমা
ভাববে আমিই তোমায় ডেকে এনেছি।

উষা রেবার কথাটা শুনে কি ভাবলো।

ট্যাক্সিটা ওদের বাড়ির কাছে এসে গেছে। উষা বলে,

—তুমিই চলে যাও রেবা। কাল রবিবার আছে, আমি কাল
পারি তবে আসবো।

রেবা খুশি হয়! মামীমা ওই ট্যাক্সি নিয়েই ফিরে গেল, রেব
উঠে যায় লিফ্‌ট দিয়ে তাদের ফ্ল্যাটে।

মা তখনও ফেরেনি।

বাঈ এগিয়ে আসে—আগিয়া দিদি।

সেও নিশ্চিন্ত হয়। রেবা মাকে লুকিয়ে এবার দিদার ওখানে যাবার পথটা বের করে মনে মনে খুশী হয়।

মা ফেরেনি।

রাতের খাবার আটটার সময় খেয়ে নেয় রেবা। পড়তে বসে মনোযোগ দিয়ে। রেবার মনে জাগে সেই ছবিটা,

বাবা আসবেন, তাকে কলকাতায় নিয়ে যাবে।

ভূষণদা, নন্থ—মানদা কি সবাইকে দেখতে পাবে। মাসীমার বাড়িতে গিয়ে হৈ চৈ করবে, বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাবে কতো জায়গা।

শিখা নিজের জগৎ নিয়ে মেতে উঠেছে।

মধু সোমানির এক্সপোর্ট-এর কারবার বেড়ে চলেছে: শিখা এককালে আঁকতো—কিছুদিন আর্ট কলেজে পড়েছিল। এখনও ছবির ব্যাপারে তার নজর আছে।

মধু সোমানির ফার্মের সেইই পাবলিক রিলেসন অফিসার, বিজ্ঞাপনের দিকটাও দেখে। আর্টিস্টদের দিয়ে তাদের বিভিন্ন মালপত্রের বিজ্ঞাপন লে আউট, ডিজাইন সবই করাতে হয়।

মধু সোমানিকে বুদ্ধিটা দেয় শিখাই।

কাজের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ওকে ম্যানেজিং ডিরেক্টার সোমানির ঘরে থাকতে হয়। এয়ার কন্ডিশনড ঘরে সেদিন কফি খেতে খেতে বলে শিখা—আমরা বিদেশে এত জিনিস এক্সপোর্ট করছি। হোয়াই নট দি পিকচার্স অব কারেন্ট আর্টিস্ট!

মধু সোমানির একটা রীতি আছে।

বিদেশের ভালো ভালো কাস্টমাররা অনেকে আসেন। শিখা তাদের হোটেলে দেখাশোনা করে, তারাও খুব খুশি, সুন্দরী-একটি মহিলা তাদের জন্য ব্যস্ত।

মধু সোমানি ব্যবসা বোঝে।

ঝকঝকে ফাইভস্টার হোটেলের রিসেপশন লাউঞ্জে মধু সোমানিও এসেছে।

সব ঠিক আছে শিখা ?

শিখা বলে—ও. কে! ওরা আজই চলে যাবেন ইভ্‌নিং ফ্লাইটএ ফ্রাঙ্কপুর্ট। ওদের জন্য কিছু গিফ্‌ট এনেছি।

মধু বিদেশী কাস্টমারদের খুশি রাখতে চায়। বলে সে—কি এনেছো ? লেট আস্‌ সি।

ওদিকে তিনটে লিফট ওঠা নামা করছে, পায়ের পাতা ডুবে যাওয়া কার্পেটের উপর দিয়ে ওরা লিফ্‌টে উঠে চলেছে বাইশতলায় ওদের কোম্পানীর এপার্টমেণ্টে।

—মধু প্রথমে একটু অবাক হয়।

—পিকচার্স! মডার্ণ আর্টিস্টদের ছবি!

হাসে শিখা—ইট ইজ হট ফেভারিট অব দেম! ফেলোজ ফ্রম স্টেটস্‌, ইউরোপ লাইক ইট ভেরি ম্যাচ!

মধু হতাশ হয়—গড নোজ!

তবু শিখাই গেস্টদের দু'একটা করে ছবি দিতে ওরা খুশিতে ফেটে পড়ে।

মিঃ জোনস্‌ চিকাগোর ব্যবসায়ী। মটর পার্টস-এর কারখানা ওর, এখানের বেশ কিছু কাঁচা মাল সে নেয়। মিঃ হাউজদার জার্মানীর লোক। ওরা খুশিতে ঝলমল করে।

—রিয়েলি উই আর গ্ল্যাড মিঃ সোমানি। ইট ইজ সামথিং গ্রেট! মিঃ জোনস বলে—আই ওয়াণ্ট টু হ্যাভ এ লট অব ইয়োর মডার্ণ পিস অব আর্ট। ইট ইজ এ ডিল।

অর্থাৎ হাজার হাজার ডলার এর ছবি তারা কিনবে। মিঃ জোনসও সেখানে এর ব্যবসা করেও বেশ কিছু রোজকার করার স্বপ্ন দেখে। মিঃ লা' মেয়ার ফ্রান্স-এর বনেদী পরিবারের লোক। তিনিও বলেন,—আই এ্যাম অলসো ইনটারেসটেড সোমানি। লেত্‌ মি নো দি' ডিটেটস্‌।

মধু সোমানি কথাটা ভাবছে।

হঠাৎ তার এক্সপোর্ট-এর বাজারে নোতুন একটা পথ পেয়েছে সে। সমুদ্রের এদিকটা বুজিয়ে বিরাট হোটেল তৈরী হয়েছে। বাইশতলার মধ্যে বিরাট এলাকা জুড়ে লবি—ওদিকে দোকান পশার। ব্যাঙ্কেট হল, ক্যাবারে—তিনতলার বিরাট এলাকা জুড়ে সুইমিং পুল, কাচের জগৎ, ঝকঝক করছে চারিদিক। টবে বানসাই করা গাছগুলো আলোয় রঙ্গীন হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যা নামছে।

মধু সোমানি, শিখা গেস্টদের সি অফ্ করতে চলেছে এয়ারপোর্টে। সারবন্দী চারখানা দামী বিদেশী গাড়ি ওদের নিয়ে চলেছে হাইওয়ে দিয়ে। মাহিম ক্রিকের সমুদ্রে তখন জোয়ার এসেছে। দূরে দেখা যায় সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টের ওদিকে বান্-এর পাহাড়শ্রেণী, একটা প্লেন আকাশে চক্কর দিচ্ছে। বাঁপাশে বান্দ্রার পাহাড়ের উপর থাকে থাকে সাজানো আকাশ ছোঁয়া বাড়িগুলো।

মিঃ লা'মেয়র বলে ওঠে,

—ইট লুক লাইক সাম ফরেন ল্যাণ্ড। সি হিলস—গুড আউটলাইন।

শিখা চাইল ওর দিকে।

লা'মেয়র ফ্রান্সের লোক। রসিক ব্যক্তি, সুন্দরী আর সুরার কদর বোঝে। ক'দিনে দেখেছে শিখাকে।

বলে সে—মিসেস শিখা, আই ইন্‌ভাইত ইউ ইন মাই ল্যাণ্ড এ্যাট বিউটিফুল ফ্রান্স, প্যারি—সাউথ ফ্রান্স—সানি বিচ। কাম তু মাই ল্যাণ্ড।

শিখা কি স্বপ্ন দেখছে বিদেশের ওই নিমন্ত্রণ এর।

দূরের হাতছানি তাকে বার বার ডাক দেয় অদেখা কি ব্যাকুলতা নিয়ে। বলে সে—লেট আস হোপ সো!

ফরেন কাস্টমস্ চেকিং হয়ে গেছে, অতিথিরা লাউঞ্জ ছেড়ে

সিকিউরিটি চেক পার হয়ে দূরে রাখা জাম্বো জেটটার দিকে এগিয়ে গেল।

মধু সোমানি নিশ্চিন্ত হয়।

কয়েকদিন তার খুবই ধকল গেছে। আর দেখেছে শিখাকে। সব দিকে ওর নজর।

লাউঞ্জ এর ওদিকে কফি বারে গেছে দুজনে।

মধু এই ব্যাপারে লাখ দেড়েক টাকা ক্লিন লাভ করেছে। আর দেখেছে ছবির এক্সপোর্ট মার্কেটও। দরকার হয় নিজে গিয়ে বিদেশের বাজার ঘুরে আসবে।

মধু বলে—এসময় কফি?

হাসছে শিখা—দেন?

মধু সোমানী আজ খুশী। বলে সে,

—ইউ হ্যাভ ডান্ মাচ শিখা! লেট আস্ হ্যাভ সাম ড্রিঙ্কস্!

সবুজ ঘাস রাখা বোম্বাই-এ খুবই কঠিন। রোজ জলদিয়ে ঘাস ছাঁটিয়ে এই সবুজ দাক্ষিণ্য বজায় রাখতে হয়। চারিদিকে সবুজ কালো ঝাউবন, ওপাশে সবুজ ঘাসের বুকে লাল হলুদ ক্যানা-জিরানিয়া—মেরিগোল্ডের হলুদ লাল সমারোহ, রাতের নীলাভ মার্কারি ল্যাম্প এর আলোয় স্বপ্নপুরীই বোধ হয়।

মধু আর শিখা ড্রিঙ্কস নিয়ে বসেছে।

মধু বলে—ওদের কাছে এই সব বাজে ছবির এত কদর তা জানতাম না।

ইউ গেভ মি এ সারপ্রাইজ শিখা! ইউ আর রিয়েলি গ্রেট! নাউ হোয়াট এবাউট দি পিকচার্স?

শিখা শুনছে ওর কথাগুলো। এখন ছবি সংগ্রহের কথা ভাবতে হবে। মধু সোমানি এবার মডার্ণ আর্ট—এদেশের শিল্পীদের আঁকা ছবি নিয়েই ব্যবসা করার কথা ভাবছে।

শিখার এই ছবির ব্যাপারটা মাথায় দিয়েছিল শিবদাসানি। এর মধ্যে ওর কার্মও দেশবিদেশে বেশ কিছু ছবি, কিউরিও—

পুরানো আমলের পাথরের, ব্রোঞ্জের মূর্তি কিছু লক্ষ লক্ষ টাকা দামে বিদেশে পাঠাচ্ছে।

শিখা বলে,

—বোম্বে, মাদ্রাজ—ক্যালকাটা—দিল্লী—বরোদায় এমন কয়েক-শো আর্টিস্ট পাবে, তাদের ছবিও বহু পড়ে আছে। যা হয় দাম দিয়ে, কিছু দাম পরে দেব বলে তুলে আনতে হবে।

মধু সোমানি জানে এ দেশে শিল্পীদের অবস্থা। অনেককেই দেখেছে তার আপিসে এসে বিজ্ঞাপনের ছবি আর লেটারিং করার জন্য ধর্ণা দিতে।

তাদের দিয়েই কিছু হাবিজাবি ছবি আঁকবে বিদেশের বাজার পেলে। প্রতি ছবিতে দুশো পাঁচশো টাকা হিসেবে দিয়েও পাঁচ হাজার টাকা গড় হিসাবে বিদেশে দাম পাবে। পার্শেণ্টেজ কষতে গিয়ে চমকে ওঠে মধু সোমানি।

তাজা জিন-এর কিক্ লাগে সারা মনে। শিখা তাকে এই টাকার জগতের সন্ধান দিয়েছে।

—শিখা!

শিখা দেখছে মধুকে। ওর চোখে মাছের আঁশের মত অস্বস্তি ভাব, গালদুটো লাল্‌চে হয়ে উঠেছে। ওর হাতটা শিখার অনাবৃত পিঠ ছাড়িয়ে বুকের দিকে আসছে। শিখা হাল্‌কাস্বরে বলে—মধু, ইউ আর টেপসি! লেট আস্ গো হোম!

বিড় বিড় করছে মধু।

কয়েক পেগ ওর পেটে পড়লেই মধুর সারা দেহে কি দুর্বার ক্ষুধা জাগে। গাড়িতে বসে শিখার নরম দেহটাকে যেন কাদার তালের মত চট্‌কে মুচড়ে দিতে চায়।

শিখা মধুর এই নিবিড় উত্তেজনার অনুরণন শোনে তার দেহে মনে। ঘড়ির দিকে চেয়ে অবাক হয়।

—রাত দেড়টা বাজে মধু!

মধু বিড় বিড় করে—বাজুক!

…রেবার ঘুম ভেঙ্গে যায় 'বাজারের' শব্দে। অম্বাবাঈ ঘুমুচ্ছে মেজেতে। ওকে ডাকলো না। রেবা উঠে এসে বাইরের সুইচ দিয়ে আলোটা জ্বেলে দরজায় লাগানো পিন্ হোল-এর কাঁচ দিয়ে দেখতে থাকে। এতরাত্রে হঠাৎ না দেখে দরজা খোলা ঠিক হবে না।

বাইরের ল্যাণ্ডিং এ হঠাৎ আলোর ঝলকে চমকে ওঠে শিখা।

মধু সোমানি এই রাতের নির্জন ল্যাণ্ডিং-এ তাকে ব্যাকুলভাবে জড়িয়ে ধরেছে, ওর স্পর্শে কি সাড়া তোলে শিখার সারা মন।

হঠাৎ আলোর রূঢ়তায় শিখার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, দরজা খুলছে রেবা। ওদের দুজনকে ওই অবস্থায় দেখে এক নিমেষে থমকে দাঁড়িয়ে রেবা ভিতরে চলে এল।

মধুকে ওখান থেকে শুভরাত্রি জানিয়ে লিফ্টে তুলে ঘরে ঢুকেছে শিখা। বেশবাস অসংযত, গায়ের জামাটাও প্রায় খোলা।

শিখা শুধোয়—বাঈ কোথায় ?

রেবা জানায়—শরীর ভালো নেই। ঘুমুচ্ছে। ওকে ডাকিনি তাই !

শিখা নিজের ঘরের দরজাটা জোরে বন্ধ করেই রাগটা প্রকাশ করে। রেবার সামনে তার এই জীবনের কিছুটা মত্ততা প্রকাশ পেয়েছে, তাই এ রাগের প্রকাশ।

রেবা এদিকে নজর দেয়নি। নিজের বিছানায় গিয়ে বেডসুইচ নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে সে। বাইরে সমুদ্রের কলকল্লোল জাগে।

ক্রমশঃ রেবার কাছে এই জীবন বিশ্রী ঠেকছে। বাবার আসার কথা। তারই পথ চেয়ে আছে রেবা।

পরদিন রবিবার। বোম্বাই শহরের দ্রুতগতির জীবনে এই একটা দিন সপ্তাহে বেশ আয়েস আনে। সকালে বেলা অবধি দেখা যায় সমুদ্রের ধারে অনেক লোকজন—বাচ্চাদের ভিড়। আপিসের তাড়া নেই। অনেকে 'খার' মার্কেটে যায় বাজার সারতে। ঠেলাগাড়িতে করে আনাজপত্র সাজিয়ে ফেরিওয়ালারা

বের হয়। কলকাতার মত টাটকা রকমারী তরকারীও দেখেনি এখানে রেবা।

শুকনো বারোমেসে এইটুন সাইজের ফুলকপি, বাঁধা কপি—সাদা মুলো, শুকনো মটর সুঁটি—টম্যাটো, চিমসে লাউ—তু একফালি কুমড়ো!

হাঁকে বিচিত্র স্বরে—বটাটা—ভোপলা—পালন্ টমাটর-র-র—

রেবা নীচের লনে নেমে এসেছে, তুচার জন বান্ধবীও জুটেছে এখানে।

শিখা কালরাতে দেখেছে মধু সোমানির চোখে সেই নেশাটাকে। দেখেছে লা' মেয়ারের চোখে কি সাড়া। সমুদ্রপারের বিচিত্র দেশের আহ্বান, শিখা ধাপে ধাপে উঠবে। বোম্বাই-ই নয়—সে বিদেশেও নাম প্রতিষ্ঠা করবে।

এগিয়ে যাবে সে আরও। তাই ওর দরকার এই মধু সোমানি, শিবদাসানি, পিন্টোর মত লোকদের। এই ব্যস্ততার জগতে নিশীথ বাতিল একটা প্রাণী। ছবির ব্যবসাতে মধু সোমানির পার্টনার হবে সে। মূলধন যোগাবে মধু, আর তার বিজনেস ম্যানুপুলেশন দিয়ে সে নোতুন এক সমাজ গড়ে তুলবে।

বাইরের আকাশে ঝকঝক করছে সোনা রোদ, সমুদ্রের স্নিগ্ধ হাওয়ায় উড়ছে পর্দাগুলো। হঠাৎ কার কলরব, চীৎকার শুনে চাইল শিখা।

চমকে ওঠে সে! ভাবতে পারেনি এত কাণ্ডের পরও লোকটা এতদূরে আসবে তার ফ্ল্যাটে, তার জীবনে আবার ওর বিরক্তিকর আবির্ভাব ঘটবে।

তাই ঘটতে দেখে নীরব রাগ আর ঘৃণায় শিউরে উঠেছে শিখা।

রেবা খুশিতে ঝলমল করছে।

সকালে লনে খেলছিল, ট্যাক্সিটা এসে থামতে খেয়াল করেনি। হঠাৎ পথের দিকে চেয়ে চমকে ওঠে। ধুতি পাঞ্জাবী পরা লোক এখানে বড় একটা দেখা যায় না।

রেবা দেখেই চিনতে পারে। চীৎকার করে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে।

—বাপি! তুমি এসেছো?

নিশীথ দেখছে রেবাকে। ফুটফুটে সুন্দর হয়েছে দেখতে, মাথার এক রাশ চুল লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা। কয়েক মাসের মধ্যে রেবা অনেক বড় হয়ে গেছে বলে মনে হয়।

ওইই নিয়ে এসেছে বাপিকে তাদের ফ্ল্যাটে, মায়ের কাছে। বাবার আসার পথ চেয়েই সে বসেছিল এতদিন। কিন্তু ঘরে ঢুকে রেবা থমকে দাঁড়িয়েছে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে। কঠিন হয়ে উঠেছে মুখটা, চোয়াল—চোখগুলো যেন জ্বলছে।

নিশীথ প্রথম থেকেই আসতে ঠিক চায় নি। রেবার চিঠি পেয়েছিল, উত্তরও দিয়েছিল। কিন্তু রেবার কোন জবাব পায়নি, পরে জেনেছিল ব্যাপারটা। তবু মাধবী দেবীর কথাতেই এসেছে সে, আর এসেছে রেবার জন্য।

কিন্তু শিখার ঘরে ঢুকে ওই বিচিত্র বেশবাস—বিছানার পাশে সিগারেট, হাতে সোনালী পানীয় দেখে চমকে উঠেছে নিশীথ। শিখা আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সেখান থেকে কলকাতায় তার ছোট্ট ঘরের সীমায় ফেরা সম্ভব নয় বলেই বোধ হয়েছে।

শিখা শুধোয়—হঠাৎ! এত কাণ্ডের পরও এখানে আসবে তা ভাবিনি।

নিশীথ বলে—তবু এসেছিলাম শিখা। মাও বললেন—হয়তো তুমি তোমার ভুল বুঝতে পারবে।

—ভুল! শিখার মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে। গ্লাশের তলানিটা এক চুমুকে শেষ করে গ্লাশটা নামিয়ে ঘোষণা করে,

—ভুল আমি করিনি। তোমার শাসন—ওই পরিবেশ মানতে পারি নি। ওই পরিচয় মুছে ফেলে নোতুন করে বাঁচতে চেয়েছি। তাই চলে এসেছি তোমাকে ছেড়ে। তোমার কাছে কোন দাবীও আমার নেই। আর চলে আসার অধিকার আমার আছে।

নিশীথ কথা বলে না। রেবা পায়ে পায়ে ওদের সামনে থেকে সরে এসেছে। তবু ছোট ফ্ল্যাট, ওদের কথাগুলো রেবার কানে আসে।

নিশীথ বলে—তাহলে ফেরার ইচ্ছে তোমার নেই?

শিখা জানায়—না। দরকার হলে সেপারেশন নিতে পারো। বিয়ে থা করে সংসার পাতো নোতুন করে।

নিশীথের স্বপ্নটা ভেঙ্গে গেছে আগেই। তবু কি আশা নিয়ে সে এসেছিল এখানে। বলে সে,

—রেবার ভবিষ্যৎ আছে। ওর এখানে থাকতে অসুবিধা হচ্ছে। তাই ওকে কলকাতা নিয়ে যেতে চাই।

শিখা সোজা হয়ে উঠে বসে বিছানায়। মাথার চুলগুলোকে ঠিক করে নেয়, হাতের সুডোল ছন্দ এখন আরও সোচ্চার। বুকের বাঁধন অটুট রয়ে গেছে, সারা দেহে উদ্দাম লাস্য—নিশীথ ওই সুন্দর দেহটার অতলে আদিম স্বার্থপর হিংস্র মনটাকে দেখেছে আজও।

শিখা রেবার অসুবিধার কথা শুনে দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

মনে হয় রেবা তার অগোচরে নিশ্চয়ই তার বাবাকে কলকাতায় চিঠি দেয়, অনেক খবরও জানায়। হয়তো এখানে তার মায়ের বাড়িতেও যাতায়াত করে।

শিখার সেদিনের চিঠি ছিঁড়ে শাসন করাব পরও রেবা তার কথাটা মানেনি। নিশীথ শিখাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে,

—তুমিও কাজে ব্যস্ত থাকো, ফিরতেও অনেক রাত্রি হয়ে যায়, ও বেচারা একা থাকে, এভাবে রাখা ঠিক নয়, তাই ভাবছি ওকে আমার সঙ্গে কলকাতায় নিয়ে যাবো আমার কাছে।

রেবা বাইরের করিডরে দাঁড়িয়ে শুনছে বাবার কথাগুলো। বাবা তাকে নিয়ে যাবার কথা বলছে, এখান থেকে ফিরে যাবে সে কলকাতায়, বাবা তাকে নিতেই এসেছে এতদূরে।

হঠাৎ রেবার সব স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

শিখা এতক্ষণ নিশীথের কথাগুলো শুনছিল। এবার তার কাছে পরিষ্কার হয়েছে নিশীথের এখানে আসার কারণটা। নিশীথ তার জন্য নয়, এসেছে তার মেয়ে রেবাকে নিয়ে যাবার জন্যই। তার এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে তার মাও।

জানে শিখা আইনতঃ নিশীথ জোর করতে পারে, আর শিখাও সহজে এই কর্তৃত্ব ছাড়বে না। এ তার অধিকারের প্রশ্ন। শিখা বলে ওঠে,

—না আমার মেয়েকে আমার কাছেই রাখবো। তাকে মানুষ করার সামর্থ্যও আমার আছে। তোমার কাছে এ নিয়ে কোনদিন হাত পাতবোনা। তুমি এরপর আবার বিয়ে থা করলে ভালোই করবে।

নিশীথ চমকে ওঠে। সে রকম কোন কথাও সে ভাবেনি রেবাকে নিয়েই সে শূন্য ঘর পূর্ণ করে তুলবে।

নিশীথ বলে—কি বলছো তুমি ?

শিখা শোনায়—ঠিকই বলছি। পুরুষ জাতকে চিনতে বাকী নেই। তুমি বিয়ে থা করবে আর আমার মেয়ে তাদের দয়ায় পড়ে থাকবে এ হতে দেব না। রেবা আমার কাছেই থাকবে।

নিশীথ অবাক হয়। বলে সে,

—রেবার মতামত নিয়েছো ?

এবার শিখা কঠিন কণ্ঠে বলে,

—তার মতামত নিতে হবে নাকি ? ভেবেছিলাম এখানে সরিয়ে এনে তবু ওকে রেহাই দেবে, আমার উপর সব শাসন করেও খুশী হও নি, এবার এসেছো ওর মন ভাঙ্গিয়ে দিতে আমার বিরুদ্ধে আমার সব কিছু এমনি ভাবে কেড়ে নিতে চাও তোমরা তা জানি আর আমিও শেষ কথা বলে দিচ্ছি—ও যাবে না। না !

নিশীথ অবাক হয় শিখার এই মূর্তি দেখে।

বলে সে—অকারণে এত উত্তেজিত হয়ো না। এটা আলোচনা করে ঠিক করতে পারি। মায়ের ওখানে চলো একদিন।

—না। আলোচনার কিছু নেই। আর মায়ের ওখানে যাবার কোন দরকারই আমার নেই।

শিখা হাঁপাচ্ছে কি উত্তেজনায়।

নিশীথ চুপ করে যায়। কি ভেবে বলে সে,

—কিন্তু কথাটা ভেবে দেখো শিখা। ও আমারও মেয়ে। দু'একদিন আছি বোম্বাইএ, সে কদিন আমার সঙ্গে বের হতে দেবে তো?

শিখা যেন দয়া করছে ওকে।

বলে—ঠিক আছে। এখানেই সন্ধ্যা বেলা পৌঁছে দিয়ে যাবে।

রেবা চুপ করে বসে আছে গাড়িতে।

নিশীথের সঙ্গে বের হবার অনুমতি পেয়েও খুশী হতে পারেনি রেবা। বাবার বুকে সে কি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। নিশীথ ওকে কি আশ্বাস দেবে জানে না। তবু বলে সব ঠিক হয়ে যাবে মা, পড়াশুনো কর মন দিয়ে। তারপর কলেজে ভর্তি হয়ে যাবি! ভালো রেজাল্ট করলে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবি!

রেবা স্বপ্ন দেখছে, বলে সে,

—না বাপি, আমি বড় শিল্পী হবো। ছোট মামার ওখানে গেছলাম সেবার, কি সুন্দর ছবি এঁকেছে ওরা। স্কুলে ড্রইং এ আমি ফার্স্ট হয়েছি।

নিশীথ ওকে নিয়ে ঘুরছে।

বোম্বাই শহরে এতদিন এসেছে রেবা তবু এই রূপটাকে দেখেনি। তিনদিকে পাহাড়ের আশপাশে সমুদ্র, নিশীথ বলে,—সাতটি দ্বীপ নিয়ে এই দ্বীপপুঞ্জের নাম পাওয়া যায় টলেমির লেখায়, তখন এর নাম ছিল হেপ্টানেশিয়া অর্থাৎ সাতটি দ্বীপের সমষ্টি, তাদের নাম হ'ল কোলাবা, ফোর্ট, বাইকুল্লা, প্যারেল, ওর্লি, মাতুঙ্গা, মাহিম।

রেবা এখন খুব খুশি। একরাশ রং তুলি কার্টিজ পেপার আরও কি সব কিনেছে। ঘুরেছে অনেক। বলে সে,

দ্বীপ বলছো কেন ? এখন কোলাবা—কোর্ট—গ্যারেজ সবতো এক লাগোয়া শহর, এই তো গাড়ি চলেছে মাহিমের উপর দিয়ে।

হাসে নিশীথ—সে বহু শতাব্দী আগেকার কথা। তখন আলাদা দ্বীপ ছিল, ক্রমশঃ সব বুজে গেছে এখন টানা শহর হয়ে উঠেছে। ওই তো দেখলে মালাবার হিলস্ এর পিছনে সমুদ্র বুজিয়ে বড় বড় বাড়ি উঠছে।

রেবা মাথা নাড়ে। বোম্বাই সম্বন্ধে এসব কথা শোনেনি সে : বৈকাল হয়ে আসছে। ওরা এসেছে বান্দ্রার এদিকে পাহাড়ে, সমুদ্রে এখন ভাঁটা চলেছে। অনেক পিছিয়ে গেছে জল, কালো পাথরগুলো বের হয়ে আছে, এদিকে উঠেছে পাহাড়ের উপর ভাঙ্গা কেল্লা।

পর্তুগীজ ভাষায় কি লেখা আছে পাথরে।

কেল্লার কামান বসানোর তু একটা চত্বর রয়েছে এখনও, আর কিছু ধ্বংসস্তূপ।

নিশীথ বলে—অতীতে এই অঞ্চল ছিল অশোকের সাম্রাজ্যের অধীন। তখন বৌদ্ধপ্রভাবও ছিল। বোম্বাই-এর আশপাশে অনেক পার্বত্য চৈত্যও ছিল। আজও রয়ে গেছে কার্লা কেভস্—অজন্তা—ইলোরা। তারপর হাত ফেরতা হয়ে এই রাজ্য আসে মৌর্য বংশ, তারপর এল চালুক্য বংশের হাতে। সমুদ্রের মধ্যে এ্যালিফ্যাণ্টা কেভ যে দ্বীপে সেখানে আগে ছিল রাজধানী।

তারও পরে এল শিলহারা রাজ বংশ, ভীমদেব এখানে নোতুন রাজ্য গড়ে তুললেন মহিমাবতী নামে।

রেবা মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনে চলেছে আজকের বোম্বাই-এর অতীতের অন্ধকারাচ্ছন্ন কাহিনী। রেবা বলে,

—মাহিম এর নামে কি মহিমাবতী বাপি ?

হাসে নিশীথ—তা হতে পারে। এই ভীমদেব খুব জনপ্রিয় রাজা ছিলেন, পণ্ডিত ধার্মিক। তিনিই বোম্বাই এর ওয়ালেকেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায়।

এরপর গুজরাটের বাহাদুর শা দখল করে এই এলাকা। এল মারাঠারা। তখন তাদেরই প্রতিপত্তি। কিন্তু এবার তাদের মুখোমুখি হতে হ'ল পর্তুগীজদের। ইউরোপ থেকে তারা জাহাজে চড়ে এলো নোতুন মুলুকে। জলদস্যুরা এসে প্রথমে সমুদ্রতীরে এই দ্বীপ বন্দর দেখে তাদের ভাষায় নামকরণ করলো বোম্ববেম্!

—মানে কি? রেবা শুধোয়।

নিশীথও মনোযোগী ছাত্রী পেয়ে তার ইতিহাসের কথা বলে চলেছে। নিশীথ শোনায়—বোম্ববেম্ মানে 'ভালো বন্দর'।

পর্তুগীজরা তার আগেই গোয়া—দমন দুটো জায়গা দখল করে নিয়েছে, এবার বোম্বাইও দখল করবে, তাই ভেবে গুজরাটের বাহাদুর শা দেখলো যা পাওয়া যায়—ও পর্তুগালের রাজাকে বন্দোবস্ত দিয়ে দখল দিল বোম্বাই-এর, সেটা ধরো ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে। ওই পর্তুগালের রাজা বছরে মাত্র পঁচাশি স্টারলিং খাজনায় ডা গ্রেসিয়া ড্যা ওর্টা নামে একজন পর্তুগীজকে বন্দোবস্ত দিয়ে দেন।

সন্ধ্যা নামছে।

কালো জমাট পাথরগুলো উঠে গেছে, উপরের টিলায় কিছু তালগাছের জটলা, ওদিকে সমুদ্রের উপর গড়ে উঠেছে আজ আধুনিক 'রক হোটেল' মাথার উপর বাতিজ্বলা ঘূর্ণায়মান রেস্তোরাঁ, দূরে মাহিম ক্রিকের উপর দিয়ে সারবন্দী আলো জ্বেলে হাজারো গাড়ি চলেছে। ওদিকে দেখা যায় সমুদ্রের ধারে আকাশছোঁয়া বাড়িগুলোর আলো ঝকমক করছে। আজ বোম্বাইএর রূপ বদলে গেছে।

রেবা শুধোয়—পর্তুগীজদের থেকে ইংরেজরা পেল কি করে? যুদ্ধ করে তারা দখল করে নিয়েছিল?

নিশীথ বলে—না, না! ১৬৬১ খৃঃ ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগালের এক রাজকুমারীকে বিয়ে করেন, যৌতুক তো দিতে হবে? এই বোম্বাই তখন ইংরেজ রাজা যৌতুক হিসেবে পেয়েছিল পর্তুগালের রাজার কাছ থেকে।

তারপর থেকে ইংরেজরাই ছিল এর মালিক, স্বাধীনতার প·
আমাদের হাতে।

···রাত্রি হয়েছে।

নিশীথ বলে—চলো রেবা। বাড়ি ফিরতে হবে।

রেবার সারাদিন কোনদিকে কেটে গেছে। ক্লান্তি বোধ করে
গাড়িতে ঘুরেছে সারাদিন। বাইরে কোন বড় রেস্তোরাঁয়
চাইনিজ খেয়েছে।

রেবা বলে—কাল ন্যাশন্যাল পার্ক নিয়ে যাবে তো বাপি
পাওয়াই লেক!

নিশীথ হাসে—ঠিক আছে।

নিশীথ ফিরতে মাধবী শুধোয়—শিখার সঙ্গে দেখা হয়েছিল·
নিশীথ এতক্ষণ রেবার সঙ্গে ঘুরে কি একটু শান্তি পেয়েছিল
ভুলে ছিল শিখাকে, তার সেই উদ্ধত কথাগুলোকেও। মাধবীর
কথায় চাইল নিশীথ। বলে সে—রেবাকে আমার কাছে রাখতে ও
রাজী নয়।

চুপ করে বসেছিল প্রশান্ত। আইনের লোক সে। বলে ওঠে
—কেন? তোমার দাবী রেবার উপরই বেশী। ও মাঝে মাঝে
দেখে আসতে পারে, বড় জোর আনতে পারে।

তুমি ওর কথা শুনবে না। যদি জোর করে—আইনতঃ স্টেপ
নিতে পারো তুমি।

মাধবী চাইল প্রশান্তের দিকে।

বলে সে ক্লান্ত স্বরে—সব কেলেঙ্কারীই তো হয়েছে, এবার
কোর্ট ঘরই হোক! ছিঃ ছিঃ এখানের সমাজেও মুখ দেখাতে
পারবো না।

নিশীথও ভেবেছে কথাটা।

তার দুঃখ হয়, তবু বলে সে,

—ওসব নাই বা করলাম। রেবাও বড় হচ্ছে, তারপর ও মেজর

হলে নিজে যা ভালো বুঝবে করবে। এখন এখানেই থাকুক। পড়াশোনা করুক।

মাধবী একটু নিশ্চিন্ত বোধ করে। তবু মেয়ের উপর রাগ তার যায় নি। বলে সে,

—আমার মেয়ে হয়ে এইভাবে চলবে, এমনি কাজ করবে ভাবতে পারিনি বাবা। সবই আমার অদৃষ্ট!

চুপ করে থাকে নিশীথ।

প্রশান্ত বলে—অ্যাজ ইউ প্লিজ।

নিশীথ বলে মাধবীদেবীকে—ওখানে কিছু পাঠানো যাবেনা হয়তো রেবাকে। মাসে মাসে কিছুটা এখানে পাঠাবো, রেবার যদি দরকার লাগে দেবেন।

মাধবী ওর এই স্নেহের দাবীকে উপেক্ষা করতে পারে না। নিশীথের জন্য কি সমবেদনায় তার দু'চোখ জলে ভরে আসে, দুঃখ হয় শিখা এমন একটা মানুষকেও ভুল বুঝে কি নেশার ঘোরে চলে এল। মেয়েকেও এমনি স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয়েব ছোঁয়াটুকুও পেতে দিল না।

মাধবী জীবনের নানা অভিজ্ঞতা থেকে আজকের এই সভ্যতার জ্বালাটাকে দেখেছে। নিজের বড় ছেলেও চলে গেছে বিনা কারণে এ বাড়ি থেকে নিজের ফ্ল্যাটে। স্বার্থপর একটি যুগ, এখানের আশপাশে—অনেক সংসারেই দেখেছে এই ভুলটাকে।

এখানে ভুলই। কেউ আর পাঁচজনের কথা ভাবে না, কোন প্রীতি কর্তব্যের বাঁধন নেই। সবাই স্বতন্ত্র, নিজের নিজের চারিপাশে যন্ত্রণা-বঞ্চনার দুঃখের সমুদ্রে হারানো দ্বীপের মত, মিথ্যাই শান্তির স্বপ্ন দেখে, ওদের চারিদিকে দুঃখের সফেন সমুদ্র।

তবু এই জীবন থেকে ফেরার পথ তাদের নেই।

মাধবী চেয়েছিল শেষ বয়সে স্বামীকে নিয়ে গ্রামের সবুজে ফিরে যেতে, সামান্য নিয়েই খুশী থাকতো। সবুজ আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠে নামতো সন্ধ্যার ম্লান ছায়া। দিঘীর ধারে বট গাছে

ফিরতো দিন শেষের পাখিরা। সন্ধ্যাদীপ জ্বলে গ্রামের মাটি তুলসীমঞ্চে।

কিন্তু সেই পথও হারিয়ে গেছে। এই সত্যতা তাদের সবকিছু কেড়ে নিয়ে কঠিন উষর জগতের মরুভূমিতে এনে ছেড়ে দিয়েছে। এখানে মরুদ্যানের স্নিগ্ধতা নেই, আছে মরিচীকার দিশাহারা যন্ত্রণা।

শিখাও সেই মরিচীকার সন্ধানেই ছুটে চলেছে। সবুজ ছোট ঘর ছেড়ে—হারিয়ে যাবে মৃগতৃষ্ণার জগতে। রেবার জন্যও ভাবনা হয়।

কিন্তু তার মুক্তির পথও জানেনা সে।

রেবা অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। প্রশান্ত এসেছিল নিশীথকে ক্যালকাটা মেলে তুলে দিতে। রেবাও ছাড়েনি।

নিশীথকে জড়িয়ে ধরে কি অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে রেবা।—আমাকে নিয়ে চল বাবা!

নিশীথ ওকে আশ্বাস দেয়—আবার আসবো মামণি!

প্রশান্ত দেখেছে ব্যাপারটা। রেবার অসহায় অবস্থা দেখেছে বলে প্রশান্ত—নিশীথদা মেয়েটার উপর তুমি অবিচার করছো বলো আমি কোর্টের অর্ডার করাচ্ছি।

নিশীথ বলে—মাকে এ বয়সে দুঃখ দিতে চাইনা প্রশান্ত তোমরা রইলে রেবাকে একটু দেখো। আমিও খোঁজ খবর নেব।

ট্রেনটা বের হয়ে যাচ্ছে। হাত নাড়ছে নিশীথ।

রেবা আর তার বাবার মধ্যে দূরত্ব বেড়ে চলেছে, ট্রেনটা বের হয়ে গেল প্ল্যাটফর্ম থেকে সুদূর কলকাতার দিকে। রেবার চোখে জল নামে।

উষার ডাকে চাইল,

—চলো রেবা।

শিখা তার জগতে হারিয়ে গেছে কি নোতুন নেশায়।

কমলজিৎ বিয়ে করেছে, তার স্বামীর ইরানে কি সব ব্যবসাপত্র আছে। ইদানীং তেল মালিক দেশের মানুষও বোম্বাই শহরে ভিড় করেছে, তাদের অফুরন্ত ডলার নিয়ে আসে এ দেশে।

কমলজিতের স্বামী সেখানেই ব্যবসাপত্র করে। এখানে বিরাট বাংলোও রয়েছে, সামনের লনের চারিদিকে দেওদার—অমলতাস পাম গাছের সাজানো প্রহরা, মৌসুমীফুলের বেড় ওদিকে। বাঙ্গালোর থেকে দামী ফুলের গাছ এনে সাজিয়েছে।

লনে পার্টি জমেছে।

রীতা, পিন্টো, শিবদাসানি, মিঃ মঙ্গেশ, মধু সোমানি প্রকাশ মেহরা—আরও অনেকে এসেছে। এসেছে শিখাও। এ পার্টির সেই যেন মধ্যমণি।

ইদানীং শিখা মধু সোমানির হয়ে মডার্ণ আর্ট-ইণ্ডিয়ান আর্ট এর নিদর্শন যোগাড় করার কাজে নেমেছে। প্লেনে দিল্লী, মাদ্রাজ, যাচ্ছে—কলকাতাও গেছে দু'একবার। কিন্তু উত্তর কলকাতার সেই নোংরা ঘিঞ্জির মধ্যে যায়নি।

চৌরঙ্গী এলাকার নামী হোটেলে ওঠে, এয়ারপোর্ট থেকে ভি-আই-পি রোড ধরে বেলেঘাটার ঘিঞ্জি এলাকায় ঢুকে কেমন বিরক্তি বোধ করে। এখন শিখা ক'বছরেই বদলে গেছে।

দেখেছে শিবদাসানিও তাকে এবার তার পার্টনার করতে চায়।

—হ্যাল্লো! শিবদাসানি এগিয়ে আসে ওকে দেখে।

পুরোদমে পার্টি চলেছে। রীতা এগিয়ে আসে।

—এতো দেরী!

শিখা আজ না এসে পারেনি।

রেবার স্কুলের ফ্যাংশান। রেবা এখন বেশ বড় হয়েছে। মেয়েদের বাড়, কয়েক বছরেই তাকে চেনা যায় না। শিখা দেখেছে রেবা কোথায় যেন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। চুপচাপ থাকে,

মা আর মেয়ের মাঝে নীরব একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে। অম্বাবাঈও দেখেছে সেটা।

শিখা শুধোয়—বাঈ রেবা আজ স্কুল থেকে ফিরেছে কখন?

রেবা মাঝে মাঝে এখন দিদার ওখানেও যায়। অম্বাও দেখেছিল নিশীথকে। রেবার কান্নাও দেখেছিল। তার অশিক্ষিত মনেও শিখার এই কাঠিন্যটা ভালো ঠেকেনি।

অম্বার স্বামী রমেশ মদ খায়—তাকে মারধোরও করে, অম্বাও অবশ্য নীরবে অনুগত স্ত্রীর মত মারধোর হজম করে না। দু-চার দিন সরে আসে অম্বা, কিন্তু থাকতে পারে না, লোকটা কোথায় রইল খেলো না খেলো—দেখতে আবার যায়।

স্বামী-স্ত্রী বলে কথা।

তাই অম্বা বাঈও অবাক হয়েছিল শিখা দিদিমণির ব্যবহারে। আজকাল দেখেছে সেও বোম্বাই শহরে মেয়েদের হাল। তারা শরাবী হয়ে পুরুষদের সঙ্গে হুল্লোড় করে। রাত করে বাড়ি ফেরে, নিজেরা রোজকার করে তাই যা খুশী করছে।

অম্বাও নিজে রোজকার করে, কিন্তু শরাব খায় না। তাদের বস্তির রজনী বাঈ, কোয়েল অনেকেই আজও অম্বাকে বলে—রমেশের সঙ্গে ছোড়ছাড় করে দে।

তবু অম্বা রমেশকে ছাড়েনি।

আর দিদিমণি অমন লোকটিকে হেনস্থা করে বিদেয় করেছে। রেবাকেও নিয়ে যেতে দেয় নি।

অম্বা বলতে চেয়েছিল রেবার কথা।

—একা একা থাকে ওকে পাঠাও না দিদি।

শিখা ধমকে ওঠে—রেবার দেখছি অনেক উকিল জুটেছে। এ্যা! তোমার কাজে যাও বাঈ!

সরে গেছিল অম্বা।

দেখেছে রাতের বেলায় দিদিকে অনেকদিন টলতে টলতে ফিরতে। ইদানীং শাড়ি ছেড়ে স্ল্যাকস্-পাঞ্জাবীও পরতে দেখেছে।

শাড়িতে কতো স্থন্দর দেখায়, আর ওই পোষাকে সারা দেহ যেন ঠেলে ওঠে। অম্বা তাও—দেখেছে।

এখন দেখেছে মেয়ের সম্বন্ধে খোঁজ নিতে।

অম্বা বলে—কেন সিধে স্কুল থেকেই ফিরেছে।

—আর কেউ এসেছিল ?

অম্বা শোনায়—সাত নম্বর ফ্ল্যাটের দিদি, নীচের ফ্ল্যাটের মতি এরাই এসেছিল রেবার কাছে।

রেবাও শোনায়—কে কে আসবে সব শিখে রাখবো এবার মা।

শিখা জবাব দিল না। দেখছে মেয়েকে।

এ যেন তারই কৈশোর যৌবনের দিনের ছবি। তার মাও শিখার সম্বন্ধে প্রথম প্রথম এই সব প্রশ্নই করতো। শিখা সেই দিনের নিজের মূর্তিটাকেই দেখেছে রেবার মুখে, ওর সত্মজাগর দেহে মনে।

কয়েকদিন ধরেই স্কুলের অনুষ্ঠানের আয়োজন চলেছে। রেবাকেও গান গাইতে হবে। রেবা বলে,

—তুমিও যাবে মা। সব গার্জেনরা আসবেন—আমারও পার্ট আছে।

শিখা কার্ডখানা দেখছে।

বলে সে—ইস্! সেদিন যে কমলজিতের পার্টি।

রেবা আশা করেছে তার মাও যাবে। বন্ধুদের কাছে ব'বার সম্বন্ধে বলে বাবা বাইরে থাকেন, ম্যাম্মির কাছেই থাকি এখানে। মাও আসবে ফ্যাংশানে!

শিখার স্কুলের সেই নীরস অনুষ্ঠানের কোন মোহ নেই। মেয়েদের নাচ গান—আর তাদের বাবা মায়ের দামী গাড়ি, মেক্ আপ্ এর প্রদর্শনী। শিখার জগৎ স্বতন্ত্র।

রেবা বলে—আসবে কিন্তু।

হলটা ভরে গেছে। অন্য মেয়েরা সাজগোজ করেই বাবা মাকে

দেখাতে যাচ্ছে। অনেকের বাবা-মা এসে ভিড় করে গ্রীনরুমে। ক্লাস টিচারই তাদের অনুরোধ করে এখানে ভিড় না করতে।

রেবাও এর মধ্যে খুঁজেছে তার মাকে। দু'একজনকে জিজ্ঞাসাও করেছে মায়ের কথা। কিন্তু কেউ খবর দিতে পারে না। রেবার মেজাজটাই খারাপ হয়ে তাসে।

তবু অনুষ্ঠানে গাইছে সে অপূর্ব। দু'চোখ দিয়ে খুঁজছে ওই দর্শকদের ভিড়ে তার মাকে।

হাততালির শব্দ ওঠে। রেবা গেয়েছে চমৎকার।

ক্লাসটিচার-রেকটার নিজে এসে কনগ্রাচুলেশন জানান। রেবার সারা মনে তবু মেঘ নামে।

উৎসব শেষ। তখনও দর্শকরা রেবার সহপাঠীরা আনন্দ কলরব করছে, বাবা মা'দের সঙ্গে অনেকেই গিয়ে গাড়িতে উঠছে ফুলের তোড়া-গুলদস্তা পুরস্কার নিয়ে।

রেবাও সুন্দর ফুলের তোড়া পেয়েছে। তার এই আনন্দে কৃতিত্বে আজ মাও আসেনি। নিঃসঙ্গ—একা সে।

ওদের নজর-কোলাহল এড়িয়ে বের হয়ে আসছে রেবা। সন্ধ্যা নেমেছে। একাই হেঁটে চলেছে বাড়ির দিকে, পথের ধারের ডাস্টবিনে রাগ করে ফেলে দেয় ওই ফুলের তোড়াটা। তার এই পুরস্কার, সব আনন্দ মা ইচ্ছে করেই ব্যর্থ করে দিয়েছে।

গুম হয়ে এসে বাড়িতে ঢুকলো রেবা।

অম্বা জানতো ওর অনুষ্ঠানের কথা। কিচেন থেকে বের হয়ে এসে শুধোয়—গানা বাজা কেমন হল রেবা?

রেবা শুধোয়—মা ফেরেনি?

অম্বা চাইল ওর দিকে। বলে সে—ফোন করেছিল। ফিরতে রাত হোবে। কোন পার্টিতে গেছে। তুম্ নাহা লেকে খানা খা লেও। মা আজ ওখানেই ডিনার সেরে আসবে।

রেবা দেখেছে মা যেন ইচ্ছে করেই তাকে এড়িয়ে গেল।

ায়ের নিজের জগতের ডাকটাই বড়। সেখানে রেবার জন্য কোন াই নেই।

রেবা বলে—খাবো না কিছু?

অম্বা বাঈ জানে ওর জীবনের দুঃখটাকে। কাছে এসে রেবার ায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে,

—ঝুটমুট কার উপর গোস্‌সা করে ভুখা থাকবে রাতভোর! চলো—

রেবা চাইল অম্বার দিকে। মায়ের কোন ভাবনা নেই তার জন্য, দিনরাত মা ব্যস্ত নিজেকে নিয়েই। তবে রেবা কেন বাবার কাছে সেই পরিবেশে ফিরে যেতে দেয়নি! বাবার উপর তার াগের শোধটা নিয়ে চলেছে সে রেবার উপরই।

গুম হয়ে কি ভাবছে রেবা।

মাঝে মাঝে নিজের নিঃসঙ্গতা ভোলার জন্যই রেবা এখন ছবি আঁকার চেষ্টা করে। বাড়িতে দেখেছে দুচারজন আর্টিস্টও আসেন ায়ের সঙ্গে ছবি আঁকার ব্যাপারে। তাদের ছবিও নাকি মায়ের কাম্পানী কেনে দাম দিয়ে।

রেবা দামের আশায় নয়, নিজের জীবনের দুঃখটাকে ভোলার জন্যই ছবি আঁকে। দু'একটা এগ্‌জিবিশনেও যায়। জীবন সম্বন্ধে একটা ধারণা—দৃষ্টিভঙ্গী তার নিজস্ব রয়েছে। সমুদ্র-পাথরের বুকে ঢেউ'এর আছড়ে পড়া ভাব, নিঃসঙ্গ নৌকা-উড়ন্ত সি সায়ালোর ঝাঁক নিয়ে দুচারটে ছবি এঁকেছে।

শিখা দেখে মাত্র। খুব উৎসাহ সে দেয় না। ববং বলে—পড়াশোনা করো মন দিয়ে, ওসব ছবি এঁকে কি হবে?

রেবা জবাব দেয় না।

আজও রেবা তার অসমাপ্ত একটা ছবি নিয়ে বসে। ঝড়ের সমুদ্রের রূপ আঁকছে সে।

অম্বা বাঈ বলে—হ্যাঁ। তুফানের সময় দরিয়া এইসা হো(
যায়। কত বোট গায়েব হোয়ে যায়, জান লুকসান হোয়।

শিখা তার নিজের জগতে হারিয়ে যেতে চায় না। দু'চে
মেলে সব দেখে তার নিজের ঠাঁই করে নিতে চায়, আরও পে(
চায় সে।

মধু সোমানি এখন ছবি রাজ্যেও আসছে, শিবদাসানি (
ব্যবসায় এর মধ্যে মধু পেয়ে গেছে। সেও জানে এ ব্যাপা(
শিখাই সোমানির ডান হাত। বিদেশে তাদের বেশ কিছু ক্লায়ে(
রয়েছে। শিবদাসানিও চালু ব্যবসাদার, তাই এ ব্যাপারে (
একচেটিয়া বাজার পাবার চেষ্টা করছে।

—হ্যালো শিখা! কোথায় ছিলে ক'দিন?

শিখা জানে শিবদাসানি আসল খবরটা জানতে চায়
রাজস্থানের জয়পুরে গেছিলো, সেখানের ছাত্রদের দিয়ে রাজপুতনা
রীতিতে কিছু ছবি করানোর জন্য।

শিখা বলে—দিল্লী ঘুরে এলাম। হাউ আর ইউ?

শিবদাসানি বলে,

—ফাইন! ইউ লুক চার্মিং সোনি। বয়স সকলেরই বা(
আই অ্যাম গেটিং ফ্যাটি—আর তোমার বয়স দেখছি কমছে।

হাসছে শিখা।

কলরব ওঠে। ওদিকে জাজ এর সুর ওঠে। কয়েকজ
জোড়ায় জোড়ায় নাচছে। কমলজিৎ ঝকমকে পোষাকে ঘুরে ঘু(
অতিথিদের তদারক করছে।

শিবদাসানি ইউ আর স্টিল আফটার হার! এখনও শিখ
আশা ছাড়োনি? মধু উইল কিল ইউ?

হাসছে শিখা।

হাসলে শিখার গালে টোল পড়ে। মসৃণ কমনীয় ত্বকে মু(
চোখের তারায় ঝিলিক তোলে সেই হাসির আভা।

শিবদাসানি বলে,

—শিখার জন্যে শহীদ হলেও আনন্দ পাবো কমল! তোমরাতো দেখলে না। শিখা তবু আছে আমাদের পুরোনো বন্ধু!

মধু সোমানি দেখেছে শিখাকে শিবদাসানির সঙ্গে হেসে কথা বলতে, মধু সোমানি ঠিক পছন্দ করেনা এটা।

—হাই শিখা!

মধু এগিয়ে আসতে শিবদাসানির আসল কথাটা আর বলা হোল না। মধুর সঙ্গে এগিয়ে গেল শিখা। মধু ওকে কোন বড় কটন মিল মালিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। বয়স্ক টাক মাথা মিঃ প্যাটেল কয়েকটা বিরাট মিলের মালিক। মিঃ প্যাটেল বলে,

তোমার নাম শুনেছি সেদিন। আমার মিলের আর্টিস্টরা তোমার খুব নাম করে। এ রিয়েল কনোসার অব আর্ট। আমি ভি কিছু ছবির কলেকসন করেছি, কাম্ ওয়ান ডে। মধু ব্রিংগ হার অ্যাট মাই বাংলো অ্যাট ভিলে পার্লে স্কিম!

আর্ট—মডার্ন আর্ট—ফাইন আর্টস নিয়ে বক বক করে চলেছে বুড়ো আর সমানে হুইস্কি গিলে চলেছে।

শিখা!

মিঃ প্যাটেলের থ্যাবড়া হাতখানা যেন পিঠের নীচে তার অনাবৃত কোমরে এসে ঠেকছে।

শিখা হাসছে—মিঃ প্যাটেল!

মধু সোমানি বলে চলেছে—মিঃ প্যাটেলের মত শিল্পরসিক লোক হয়না শিখা।

মিঃ প্যাটেলের চোখের দিকে চেয়ে থাকে শিখা।

রাত্রি নামছে।

মিঃ প্যাটেলের ঠিক চলার মত অবস্থা আর নেই। মধু-সোমানি শিখা নিয়ে গিয়ে ওকে গাড়িতে তুলে দিল। বিরাট

জার্মান ড্যামলার গাড়ি। ভিতরে নানা বিলাসের আয়োজন। মিঃ প্যাটেল বলে,

—মধু আমি শিখাকে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি।

শিখা এড়াতে চায় আবার আপনি এতটা ঘুরে যাবেন! মধু সোমানিও যেন মিঃ প্যাটেলকে খুশী করতে চায়। মিঃ প্যাটেল বলে,

—নাথিং। কাম অন্ সোনি।

মধু বলে—যাও, উনি বলছেন। কাল দেখা হবে। গুডনাইট! গাড়ির চারিদিকে দামী কুশনের মোড়ক, নরম গদি—আর ভিতরে জায়গাও বেশ খানিকটা, মিঃ প্যাটেল তবু শিখার গায়ে যেন এলিয়ে পড়তে চায়, শিখারও একটা খেলা বোধ হয়। মিঃ প্যাটেলের কেশ বিরল মাথায় দু এক গাছি পাকা চুলে বিলি কাটার চেষ্টা করে, আদুরে বেড়ালের মত ঘড়ঘড় করছে লোকটা।

—সত্যি তোমাকে খুব পছন্ করেছে আমি। আমার আর্ট ডিপার্টমেণ্টে জয়েন করো শিখা। মধু সোমানিকে হামি বলে দিব? বাংলো—গাড়ি—এ গুড্ স্যালারি—

শিখা এত সহজে ধরা দিতে চায় না। লোকটার টাকা প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা অনেক। মদের ঘোরে এমন সব প্রলোভন দেখায়, আবার নেশা ছুটলেই ওরা অন্য মানুষে পরিণত হয়, এ জগতের অনেককে দেখেছে শিখা।

তবু ওকে চটাতে চায়না। এসব মক্কেলদের নিয়েই শিখার সাম্রাজ্য গড়তে হবে। শিখার গায়ে, মিঃ প্যাটেলের কুলোর মত থ্যাবড়া হাতটা কিসের সন্ধান করছে,

শিখা বলে—পরে ভেবে দেখবো মিঃ প্যাটেল!

রেবা তখনও জেগে আছে। এদিকটা সন্ধ্যার পর থেকেই নিশুতি হয়ে যায়। সামনে সমুদ্রের বুকে ফস্‌ফরাস ছড়িয়ে পড়ে, ঢেউ-এর মাথায় যেন তারা ফুল ফুটেছে। গাড়ির শব্দে চাইল।

একটা মোটা ভালুকের মত লোকও নেমেছে, রেবা দেখছে লোকটাকে, এগিয়ে এল শিখা।

বাঈ দরজা খুলে দিয়েছে, এখনও ঘুমোস নি ?

রেবা মায়ের দিকে চাইল, প্রসাধন আর ওই পোষাকে শিখাকে বিচিত্র দেখায়, রেবা বলে,—এইবার ঘুমুতে যাবো,

শিখা রেবাকে তাদের অনুষ্ঠানের কথাও শুধোয় না। রেবাও মাকে এ নিয়ে কিছু বলতে চায় না। মায়ের ঘর থেকে বিদেশী গানের চটুল সুর ওঠে।

শিখা শোবার আগে গিজার খুলে গরম জলে হাতমুখ ধুয়ে মুখে নাইট ক্রিম মাখে, দেহ রূপের চর্চায় তার কোন ত্রুটি নেই। আয়নার সামনে নিজেকে যাচাই করে নেয়, খুশি হয়। প্রকৃতি তাকে একদিক দিয়ে অনেক কিছু দিয়েছে। এই জীবনের আনন্দকে সে লুটে নিতে চায়।

দেখেছে পুরুষের চোখের নেশাটাকে। এ যেন তারই সাম্রাজ্যের বিজয় কেতন, সে বিজয়িনীর মতই বাঁচতে চায় নিজের জগতে।

রাত্রি একটা বাজে প্রায়। বোম্বাই শহরে একটা তেমন কিছু রাত্রি নয় শিখার সমাজে। এবার ফোমের বিছানায় বালিশটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে সে। সমুদ্রের কলকল্লোল জাগে, শিখা স্বপ্ন দেখে ওই সমুদ্র পারে কোন দূরে কোথায় চলেছে সে।

মাধবী পুজো সেরে উঠেছে, ইদানীং চোখে কম দেখছে, তাই চশমা নিয়েই সবসময় চলাফেরা করে, হঠাৎ কাকে দুমদাম ছন্দে উত্তাল ভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে দেখে চাইল।

উষাও এসেছে। রেবা এসে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে,—দিদা গ্রেড ওয়ান নাম্বার পেয়ে স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট পেয়েছি!

মাধবী খুশী হয়, রেবা প্রণাম করে ওকে।

মাধবী বলে ছুঁয়ে দিলিতো ?

রেবা শোনায়—দিলাম। বলো তো ঠাকুরকেই ছুঁয়ে দিই তোমার ?

হাঁ হাঁ করে ওঠে মাধবী সে কি রে ?

হাসছে রেবা—তোমার ঠাকুরও তোমার মতই হেল্পলেস্ দিদা, ছুঁয়ে দিলেই অশুদ্ধ হয়ে যাবে না ? কই পেসাদই দাও।

মাধবী বলে মাকে খবর দিইছিস ?

হাসে রেবা—মা! মা কোথায় রাজস্থানে গেছে কি কাজে, কাল পরশুর প্লেনে ফিরবে বোধ হয়।

মাধবী চাইল রেবার দিকে। রেবা বলে,

—বাপিকে কলকাতায় একটা টেলিগ্রাম করে এলাম খবর দিয়ে, কথাটা তোমাকেই বললাম। তোমার মেয়েকে অবশ্যি বলবো না।

হাসছে রেবা।

মাধবীর বুকের অতলে দুঃখটা জমাট হয়ে আসে। এই মেয়েটার জীবনের আনন্দের দিনেও মা, বাবা কেউ পাশে নেই। ওরা আজকের অভিশাপ নিয়ে জন্মেছে। মাধবী তার ছেলেদের পরীক্ষার খবরে কত আনন্দ করেছে।

আজ রেবার জীবনে মা বাবার স্পর্শই নেই। সব কিছু থেকেও এই সমাজ তাকে কিছুই দেয়নি।

মাধবী বলে—বাড়ি যেতে হবে না। এখানেই দুপুরে খাবি রেবা বলে—মামী আগেই বলেছে দিদা। আর দুপুরে একটা সিনেমা দেখতে যাবো বান্দ্রা টকিজে, মামী নিয়ে যাচ্ছে।

মাধবী খুশি হয়—বেশ তো! যাবি।

প্রশান্ত, সুশান্তও ফিরেছে বৈকালে। উষা-রেবা ফিরেছে ছবি দেখে। প্রশান্ত রেবার মার্কসিট দেখে শুধোয়,

—কি পড়বি ঠিক করেছিস ?

রেবা বলে—দেখা যাক। আর্ট কলেজে ভর্তি হবো।

সুশান্ত বলে—ও অন্য কিছু কি পড়বে ? মাথায় কিছু তো নেই ! তাই পট আঁকতে যাবে।

মাধবীও খুশি হয় না। বলে সে—ওসব কি রে?

হাসে রেবা—চাকরী বাঁধা দিদা। কাপড় কলে ছিট এর ডিজাইন করবো। চাদরে ফুল আঁকবো নিদেন, মায়ের সঙ্গে নাকি অনেক আর্টিস্ট, কাপড়ের কল মালিকদের জানা শোনা আছে।

মাধবী ধমকে ওঠে,

—মরণ! অন্য পড়া কতো আছে, তাই পড়বি!

হাসছে রেবা।

ভাবনাতে পড়েছে রেবাও। ছবি আঁকাটা তাকে পেয়ে বসেছে, এর মধ্যে এগ্‌জিবিসনে দু'একটা ছবিও দিয়েছে। অম্বাবাঈ এর ছবি একটা এঁকেছে। বাঈতো দেখে মহা খুশি! শিখা না থাকলে অম্বাবাঈ-এর সেই পতিদেবতা রমেশও আসে। কালো রং—চুলগুলো সাদা কালোয় মেশানো। সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়ায় সর্বদাই এলোমেলো হয়ে আছে। মুখে বয়সের তুলনায় কুঞ্চন রেখা ফুটে উঠেছে।

চোখে সমুদ্রের আহ্বান। মানুষটার ছবি একটা এঁকেছিল রেবা। জীবন যুদ্ধের সৈনিক মাত্র, সমুদ্রে যায় প্রাণ হাতে করে, ঢেউ তুফানের সঙ্গে লড়াই করে তারা।

ছবিটা প্রাইজ পেয়েছিল।

রেবা অবসর সময়ে ছবি নিয়ে পড়েছে। মা ফেরেনি। সকালে একটা ক্যানভ্যাস নিয়ে ডাঙার বালুচরে এসে বসেছে। নারকেলের গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ঝড়ে মাথা নোয়ানো বাবলা গাছ, জেলেদের ঝুপড়ি—ভাঁটার সমুদ্র। নৌকা দু'একটা পড়ে আছে জনহীন বালুচরে।

একমনে জীবনের এই স্তব্ধ শূন্যতার রূপটাকে ধরার চেষ্টা করছে রেবা তার ক্যানভ্যাসে। আকাশে মেঘ জমেছে—কালো মেঘস্তর উঠে আসছে সমুদ্রের অসীম থেকে, আলো আঁধারির মাঝে এক সর্বনাশা রূপ রেবার তুলিতে ফুটে ওঠে।

হঠাৎ বালিতে কার শব্দ পেয়ে চাইল।

একটি তরুণ। পরনে সাধারণ কর্ডের প্যান্ট সার্ট—নিবিষ্টমনে সে রেবার ইজেলের দিকে চেয়ে আছে।

ভরাট বলিষ্ঠ চেহারা, অল্প দাড়ি ফর্সা গালে কালচে আভাস আনে।

বলে ওঠে তরুণটি—একি! বৃষ্টি নামছে আপনার ক্যানভ্যাস যে ধুয়ে যাবে!

বোম্বাই এর বৃষ্টির রূপই আলাদা। মেঘগুলো থেকে অঝোরে বৃষ্টি ঝরে আর সমানে চলে ঝড়ো হাওয়া। নারকেল গাছগুলো মাথা নাড়ছে, সমুদ্রের দিক থেকে সাদা হয়ে এগিয়ে আসছে বৃষ্টির জমাট যবনিকা, তীরভূমিতে এসে আছড়ে পড়বে।

রেবা ইজেলটাকে গায়ের শাড়ির আঁচল দিয়ে জড়িয়ে ধরে বালির উপর থেকে দৌড়ে আসছে, ঝুপড়িগুলো দূরে। দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। এত কষ্টে আঁকা সুন্দর ছবিটা জলে ধুয়ে মুছে যাবে।

তরুণ ভদ্রলোক এর মধ্যে তার গাড়িটা রাস্তা ছাড়িয়ে কিছুটা এনে দরজা খুলে ডাক দেয়,

—উঠে আসুন গাড়িতে। সব ভিজে যাবে!

রেবারও ভাবার সময় নেই। বৃষ্টিতে তার গা মাথা ভিজে গেছে। কোনরকমে এসে ছবিটাকে গাড়ির মধ্যে পুরে এবার নিজেও উঠে বসে রেবা,

বাইরে যেন আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে। ঝড়ো হাওয়ার দাপটে কাঁপছে নারকেল বন, গাড়িটাও নড়ছে। মুক্ত সমুদ্রের হাওয়া এসে ঝাপট মারছে থেকে থেকে গাড়িটায়।

রেবার খেয়াল হয় গা মাথা সব ভিজে গেছে।

তরুণটি বলে—শাড়ির আচল দিয়ে গা মাথা মুছে নেন।

অবশ্য নিজেও ভিজেছে সে। বলে ছেলেটি,

—আমার নাম বিভাস রায়।

এরপর ভদ্রতার খাতিরেই জানায় রেবা তার নামটা। বিভাস বলে,

সুন্দর ছবি আঁকেন তো? আর্ট কলেজ থেকে পাশ করেছেন বুঝি? কোন ইয়ারে?

রেবা শোনায়—এখনও পড়ছি, এই ফিফথ্ ইয়ার চলছে—ফাইন আর্টসে।

—তাই নাকি! আপনার ব্রাশ ড্রইং, কালার কম্পোজিশনও সুন্দর!

রেবা সলজ্জভাবে দেখছে ওকে। শুধোয় সে,

—আপনি ছবি টবি আঁকেন!

হাসে বিভাস। বলে সে—ওই এখন জীবিকা বলতে পারেন। ফাইন আর্টস-এর ছাত্র ছিলাম, এখন পেটের দায়ে কমার্শিয়াল কাজ করি!

বিভাস রায়! হঠাৎ মনে পড়ে রেবার ওর দু'একটা ছবি এগ্জিবিশনে দেখেছে। ওয়েল—এগ্ টেম্পারার কাজ। বলে সে,

—আপনার ছবি তো দেখেছি। সানসেট ইন মাড আইল্যাণ্ড! দি টয়লার্স অব সি—

বিভাস অপ্রস্তুত হয়ে বলে,

—ওসব এমন কিছু ভালো ছবি নয়। অবশ্যি সোমানি প্রজেক্টস ওই ছবিগুলো ভালো দামেই কিনেছিল। তবে কি জানেন, ভালো ছবি যা মন দিয়ে আঁকি সে সব কেউ কেনে না।

বৃষ্টি সমানে চলেছে। আকাশ ছেয়ে গেছে জমাট মেঘে মেঘে। বিভাস বলে,

—চলুন আজ আর সূর্যদেখা যাবে বোধ হচ্ছে না। কোনদিকে থাকেন—পৌঁছে দিয়ে যাই।

রেবা বলে—আবার আপনাকে কষ্ট দেব, তার চেয়ে বড় রাস্তার

দিকে চলুন কোন ট্যাক্সি পেলে ধরে নেব। বেশীদূরে নয় বান্দ্রাতে থাকি!

বিভাস শোনায়—আমি তো 'খার' যাবো, চলুন পৌঁছে দিয়ে যাই।

বেলা পড়ে আসছে।

তখনও বৃষ্টি চলেছে সমানে। বিভাসের গাড়িটা এসে পোর্টিকোতে দাঁড়িয়েছে। রেবা বলে—তিনতলায় আমাদের ফ্ল্যাট, একটু কফি খেয়ে না গেলে—

বিভাস বলে—প্রতিদান দিতে চান!

কি ভেবে বলে সে—চলুন! তবে জাস্ট ফিউ মিনিটস্! আমাকে একবার মহালক্ষীতে যেতে হবে জরুরী কাজ আছে।

রেবার মনে হয় তার ছোট ঘরখানা যেন ভরে উঠেছে ওই প্রাণ উচ্ছল একটি শিল্পীর উপস্থিতিতে। সামনে বেশ খানিকটা খোলা ছাদ। তিনতলা অবধি উঠে এখানে বেশ খানিকটা ছাদ ছেড়ে বাড়িখানা সোজা দশতলা অবধি উঠে গেছে। সামনের ছাদে রেবা কিছু ফুলের টবে গাছ গাছালি করেছে, বৃষ্টির জলে সবুজ সতেজ গাছে এসেছে ফুলের কুঁড়িগুলো।

বিভাস ওর ছবিগুলো দেখছে।

বলে সে—সুন্দর হাত কিন্তু।—এটার ড্রইং এ পারস্পেকটিভটা একটু গোলমাল আছে। আর মডেলিং করেন দেখছি!

অম্বাবাঈ কপি আর ওমলেট এনেছে। গরম কফিতে চুমুক দিয়ে বিভাস বলে—এবার ছাদের একদিকে একটা শেড বানিয়ে নিজের স্টুডিও করে নিন। কাজ করতে গেলে এটাব দরকার।

রেবাও ভাবছে কথাটা।

বিভাসের খেয়াল হয়—উঠবো এইবার।

পরিচিত হয়ে খুশী হলাম! একদিন আসুন না আমার ওখানে!

কার্ডটা বের করে দেয় বিভাস। বলে সে,

—সকালের দিকে থাকি। 'খার' রামকৃষ্ণ মিশনের কাছাকাছি ছোট্ট একটা আস্তানা। এলে খুশী হবো।

রেবা ওকে নীচে অবধি এসে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেল।

আজ সারা মনে নীরব খুশির সাড়া, ঘরে ফিরে আলো জ্বেলে আবার সেই ক্যানভ্যাসটা নিয়ে বসলো। এই কাজ করেছে এতদিন রেবা একাই নিজের মনের তাগিদে। আজ বিভাসের কথা মনে পড়ে। হঠাৎ সমুদ্রের ধারে এক দুর্যোগের মুহূর্তে সে যেন ত্রাণকর্তার মতই এসে পড়েছিল।

গুণগুণ সুর ওঠে রেবার মনে।

অম্বাবাঈ দেখেছে রেবার মনের এই পরিবর্তনটাকে। অম্বা শুধোয়,—ছেলেটি কে রে?

রেবা চাইল ওর দিকে। অম্বাবাঈ এখানে দীর্ঘদিন আছে, ওর চেহারায় এখন বয়সের ছাপ পড়েছে, চুলগুলোও পেকেছে। রেবা বলে,—বৃষ্টির সময় সমুদ্রের ধারে দেখা হয়ে গেল, সব ভিজে যেতো ওর গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল।

—হ্যাঁ! অম্বাবাঈ বলে—ছেলেটা ভালোই তাহলে। কি করে?

রেবা বলে,—বললো তো ছবি আঁকে। কোন বড় ফার্মের কমার্শিয়াল আর্ট ইন্‌চার্জ!

অম্বাবাঈ শুনে খুব খুশী হয়েছে তা বোঝা গেল না। বলে সে,—রাত হয়েছে, দিদির ফিরতে দেরী হবে ক'দিন। সকাল-সকাল খানা খেয়ে নাও।

শিখা এখন বোম্বাই এর একটা সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। আর্ট সোসাইটি গড়ে তুলেছে মধু সোমানি, মিঃ প্যাটেলদের নিয়ে। মিঃ প্যাটেলই চেয়ারম্যান। আরও কিছু

তাবড় ব্যক্তি জুটেছে। বিদেশী ছবির বাজার নিয়ে ভাবছে, বেশ কিছু ছবিও যাচ্ছে প্যাক হয়ে বাইরে। ভালো টাকা আসছে।

শিখা ঠিক বুঝতে পারে না এদের এত আগ্রহ কেন! টাকাও দিয়ে চলেছে! তারাই ওকে পাঠিয়েছে জয়পুরে।

শিখা ক'দিন জয়পুরে এসে রামবাগ প্যালেস হোটেলে উঠেছে। সুন্দর শহর, স্টেশনটাই বিশেষ ঢঙে গড়া। রাস্তাগুলো সোজা চলে গেছে, এক একটা চৌপল, সেখান থেকে চারিদিকে তীরের মত সোজা সুন্দর রাস্তা বের হয়েছে। দুপাশের বাড়িগুলো গোলাপী রং করা। সারা শহর গোলাপী, তাই একে বলা হয় পিঙ্ক সিটি।

এককালে রাজা মানসিং এর আমল থেকেই এখানে শিল্পকলা—নানা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। মিউজিয়ামে তার অজস্র পরিচয় ছড়ানো। দেশ বিদেশের বহু মূল্যবান ছবি, নানা ঘটনার ছবি, স্কেচ রয়েছে। নিজামের নিজস্ব মিউজিয়াম সালার জং এর পরই বলা যেতে পারে সিটি প্যালেস মিউজিয়াম এর সংগ্রহ।

এখনও বেশ কিছু শিল্পী এখানে কাজ করছে, রাজস্থানী স্টাইল অব পেন্টিং এর বেশ কিছু ছবিও পেয়েছে শিখা।

আজ নিজেই বের হয়েছে অম্বরের দিকে। জয়পুর শহর ছাড়িয়ে পাহাড়ের উপর মানসিং এর আমলের প্রাচীন দুর্গ, পথটা পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে, নীচে দেখা যায় ছোট্ট লেকটার টলটলে জলধারা। অনেকে কলরব করে হাতির পিঠে চেপে রাজকীয় ভঙ্গীতেই উঠে চলেছে।

—হাই শিখা!

হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠের কার ডাক শুনে চাইল শিখা।

কাঁধে দামী ক্যামেরা চোখে সানগ্লাস সফরী স্যুট পরণে, উঠে আসছে শিবদাসানি!

শিখা অবাক হয়—তুমি! এখানে?

হাসে শিবদাসানি—একটু নার্ভাস হয়ে গেলে দেখছি। মৎ ঘাবড়ো জী। কালকের ইভনিং ফ্লাইটে এসেছি। অবশ্য প্রায়ই আসি কাজে। শিবদাসানি বলে,

—লেট আস্ গো। চলো—দেখবে সেকালের রাজা মহা-রাজাদের ব্যাপার। আমরা তো তার তুলনায় চুনোপুটি!

শিখা সহজ হয়ে উঠেছে। বলে সে,

—ও কথা বলো না শিবদাসানি। রাজারা তো এখন ফৌত। এখন রাজত্ব চালাচ্ছো তোমরাই।

হাসে শিবদাসানি।

শিবদাসানি রাজস্থানের জয়পুর, চিতোর, দৈলওয়ারা, যোধপুর সর্বত্র চষে বেড়ায় তার কিউরিও, ছবি, রাজস্থানী পিতলের কাজ, জিঙ্ক-এর কাজের সন্ধানে। এর এসবের চালু ব্যবসা।

সারা ভারতের পুরোনো জায়গাগুলোয় ওর অনুচরদের যাতায়াতের ব্যাপার আছে। বাইরে ভালো দামে এসব পাঠায়।

শিখা শুনেছে ওরা নাকি পুরাতত্ত্বের সামিল এসব বৌদ্ধ মূর্তি এবং আরো অনেক মূর্তিই নানা উপায়ে সংগ্রহ করে নানা পথে দেশের বাইরে পাঠায়।

কি করে তা জানে না, তবে শিবদাসানির ফার্ম যে প্রচুর টাকা রোজকার করে তা শিবদাসানিকে দেখলেই বোঝা যায়। অন্য সব ব্যবসাও আছে।

…শিখা ফিরছে শিবদাসানির গাড়িতে। এখানের রহিস আদমী লালসিং শিবদাসানির বন্ধু। তারই গাড়ি।

সহরের এ দিকটা বেশ খোলামেলা। এককালে রাজাদের প্রাসাদই ছিল, সেখানেই গড়ে উঠেছে বাগানঘেরা সুন্দর বাড়িটায় আজকের আধুনিক হোটেল।

শিখা শুধোয়—এখানেই উঠেছো নাকি?

শিবদাসানি বলে—এখানেই তো উঠি। ভালোই হল তোমার পিছনে এখানেও আর ঘুরতে হবে না।

শিখা হাসে—আমার পিছনে আর ঘোরার দরকার আছে নাকি?

শিবদাসানি চাইল ওর দিকে। বৈকাল নামছে। পাখিদের কলরব জাগে। বাতাসে ওঠে বকুল অমলতাস ফুলের মিষ্টি সুবাস। শিবদাসানির চোখে কি নেশা। বলে সে,

—আছে শিখা। সত্যিই তোমাকে আমার দরকার। দু'জনেরই দরকার!

সন্ধ্যাবেলায় স্নান সেরে শিখা চেঞ্জ করে হাল্‌কা বোধ করে। রাজস্থানের সন্ধ্যাগুলো মনোরম। নির্জন বাগানের এদিক ওদিকে ফ্লাওয়ার বেডের ধারে গার্ডেন আমব্রেলার নীচে চেয়ার টেবিল পাতা।

বোম্বাই-এর সেই দৌড়ঝাঁপ, উৎকণ্ঠা নেই। শান্ত পরিবেশে শিখা শেরি নিয়ে বসেছে। খুঁজে খুঁজে শিবদাসানিও এসে হাজির হয়।

—তোমাকেই খুঁজছিলাম। রুমে দেখলাম নেই—

হাসে শিখা—ভাবলে কোনও চক্করে বের হয়েছি?

শিবদাসানি চেয়ারটা টেনে নিয়ে আরাম করে বসে বলে,

—না, না। ওসব চক্কর তো লাগাই আমি। তোমার ব্যবসা অনেক সাফ! লোকে তাই বলে!

লেট আস্ হ্যাভ সাম্ হুইস্কি! কি শেরি খাচ্ছো? লেডিজ ড্রিংক্।

শিখা বলে—আফটার অল্ আমিও তো লেডি।

শিবদাসানি শোনায়—ল্যাডদের কান কাটো তুমি! মধু সোমানির মত একটা বাজে মালকে এ বাজারে দাঁড় করিয়ে দিলে।

হুইস্কি এসে গেছে। শিবদাসানি দু-এক পেগ খেয়েছে, শিখাও তাজা হুইস্কিতে চাঙ্গা বোধ করে। কাজু, চিকেন রোল, চিকেন

তন্দুরী এসেছে। শিবদাসানি অবশ্য নিরামিষ। তার চাঁট এসেছে বেশমী কাবাব, কাজু, চীজ পকৌড়া এইসব। মদ খেলেও সাত্ত্বিক ধবণের ব্যক্তি সে।

শিবদাসানি বলে—আমার ফার্মেই এসো শিখা—নট অ্যাজ অ্যান এম্প্লয়ি, বাট অ্যাজ এ পার্টনার। মাসে এলাউন্স নেবে ধরো পাঁচহাজার, কার—ফারনিশ্‌ড বাংলো—

শিখা হেসে ওঠে।

—এ যে একেবারে রাজত্ব দিচ্ছো শিবদাসানি! আমি কি তার যোগ্য?

শিবদাসানি বলে—ইউ ওয়ার্থ মাচ্‌ মোর দ্যান দ্যাট! মধু তোমাকে সবদিক থেকেই এক্সপ্লয়েট করছে।

কি ভাবছে শিখা।

সব ভাবনাগুলো যেন মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যায় ওর ওই প্রস্তাবে। মধু সোমানি আজ লাখ লাখ টাকা রোজকার করছে, সে পায় মাত্র তিনহাজার টাকা মাসে, আর ওই ফ্ল্যাটটা। ওখানে ঠিক থাকা যাচ্ছে না।

শিখা স্বপ্ন দেখে একটা বাগান ঘেরা ছোট বাংলোর। বাগান করার ইচ্ছা তার অনেক দিনের। কিন্তু মধু সোমানির কথাও ভাবছে সে।

শিবদাসানি দেখছে শিখাকে।

জানে সে মিঃ প্যাটেল আরও অনেকেই এখন শিখার ভক্ত। শিখাকে নিয়েই সে আলাদা অর্গানাইজেশন্‌ গড়ে তুলবে।

শিবদাসানি বলে—ইউরোপেও ব্রাঞ্চ খুলছি, দরকার হয় তোমাকে গিয়ে সেখানেই অর্গানাইজ করতে হবে। প্যারিতে।

শিখা ভাবছে লা' মেয়ারের কথা। ভদ্রলোক এখনও চিঠি পত্র দেয়। শিখা এবার ভারতবর্ষেই নয় সারা পৃথিবীর সংস্কৃতির পীঠস্থান প্যারিসেও যেতে পারবে। তার মনের অতলের সেই অতৃপ্ত সত্ত্বা আরও অনেক পেতে চায়।

তবু শিখা সেটাকে প্রকাশ করতে চায় না।

বলে সে, শিবদাসানি, মধুও তোমার বন্ধু!

হাসে ধূর্ত লোকটা—সো হোয়াট! বিজনেস ইজ বিজনেস। এতে বন্ধুত্বের ঠাঁই নেই। আমরা বিজনেস এর বাইরে বন্ধু ছিলাম, থাকবো।

শিখা চাইল ওর দিকে। বন্ধুত্ব ভালোবাসারও কোন দাম এই ব্যবসার জগতে নেই। আজকের সমাজে ওসব মিথ্যা হয়ে গেছে। বেঁচে থাকার লড়াই এই আধুনিক সভ্য সমাজেও আদিম মনোভাব নিয়েই টিকে আছে। তা আরও ভীষণ, আরও রক্তাক্ত, নির্মম।

শিখার চোখের সামনে উজ্জ্বল ঝকমকে একটা ছবি ফুটে ওঠে। শিখা বলে—কিন্তু আমার কাজে নিজের স্বাধীনতা থাকবে তো?

শিবদাসানি দেখছে শিখাকে। এ টোপ ও ধরবে তা জানে। শিবদাসানি খুশি হয় বলে—সিওর। ইউ ক্যান বিলিভ মি!

বিশ্বাস!

শিখা এদের বিশ্বাস করে না। এরা কেউ কাউকে ভালোবাসে না, বিশ্বাস করে না। এ জগতে ওই সব দুর্বলতার কোন স্থান নেই।

শিখা বলে—একটু ভাবতে দাও শিবদাসানি।

শিবদাসানি ঘাড় নাড়ে। জানে শিখার জবাব সে পেয়ে গেছে। তাই বিজয়ের আনন্দে আজ ডবল পেগ একসঙ্গে গিলতে থাকে নিরামিষ পবিত্র চাট দিয়ে।

শিখা ভাবছে ওর প্রস্তাবটা।

মধু সোমানি জানে না এ ব্যাপারটা। মধু সোমানিকে এবার শিখা ছেড়ে আসার কথা ভাবছে। তাকে আরও উপরে উঠতে হবে। উপরে উঠতে গেলে একটা সিঁড়িতে পা দিয়ে তবে উপরের সিঁড়িতে উঠতে হয়। তাই মধু সোমানিকে ডিঙ্গিয়েই সে উপরে উঠবে। এখানে অন্তরের কোন বাঁধনই বড় নয়। শিখা নিজের স্বার্থে নির্মম হতে পারে।

…মনের অতলে মধুর বিরুদ্ধে তাকে ছেড়ে আসার পথগুলোও ভাবছে সে।

রাত ঘনিয়ে আসে।

জয়পুর সহরের চারিদিকের রুক্ষ পাহাড়সীমা বাধাপ্রাচীরের মত কালো জমাট অন্ধকার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে অম্বর দুর্গের উপরের অচলগড় পাহাড়ের দুর্ভেদ্য কেল্লাটা চাঁদের আলোয় একটু শ্বেতবিন্দুর মত মনে হচ্ছে।

শিবদাসানি দেখছে শিখাকে।

শিখার সারা মুখে পানীয়ের ঔষ্ণ আবেগ, চোখদুটো চকচক করে। শিবদাসানি হিসেবী লোক। মদ খেলেও সে দিশা হারায় না। জানে কোনখানে থামতে হবে তাকে। শিবদাসানি বলে— কাল যোধপুর যাচ্ছি শিখা। মিট ইউ ইন বোম্বাই।

রেবা ক'দিন নিজের কাজ নিয়েই রয়েছে। পর পর ছবি এঁকে চলেছে। কলেজে ক্লাশ সেরে সেদিন কি খেয়াল বশেই চলেছে থার-এ বিভাস এর স্টুডিওতে।

ক'দিন ওর কথাই ভেবেছে রেবা। সেই ঝড়ের কালো মেঘ— বর্ষার অন্ধকারে ওকে দেখেছিল, কি আশ্বাস নিয়ে এসেছিল বিভাস। সুন্দর একটি তরুণ!

আর্ট কলেজেও খোঁজ নিয়েছে রেবা। কলেজের আর্ট গ্যালারীতে বিভাসের আঁকা দুটো ছবিও রয়েছে। সেগুলোকে আবার নোতুন চোখে দেখে শিখা।

শিল্পীর মেজাজ, নিপুণ হাতের ড্রইং ডিটেলস্-এর কাজ, পরিবেশ সব মিলিয়ে তার ছবির শকুন্তলা যেন প্রাণময়ী, আশ্রমিক পরিবেশে এক বিষণ্ণ নারীত্বের প্রতীক।

অন্য ছবিটা একটা ল্যাণ্ডস্কেপ, রুক্ষ পর্বতের একটা স্তর মাথা তুলেছে নীল আকাশের বুকে, জীবনের অঙ্কুর নিয়ে।

…খার-এর এই দিকটা বেশ শান্ত।

সন্ধ্যার পর রাস্তার দু'দিকের গাছ গাছালি ঘেরা বাংলোগুলে অনেক স্তব্ধ। বাতাসে ওঠে নানা ফুলের মিষ্টি সুবাস। হাওয়া এখানে অখণ্ড বিদ্রোহ নেই।

ওপাশে রামকৃষ্ণ মিশনের লাল পাথরের মন্দির কি শান্ত মহিমা বিরাজমান। পথ থেকে গাছ গাছালির ফাঁক দিয়ে মৃদু আলোকি মন্দিরে ঠাকুরের মূর্তি কি অভয় আশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আ নিপীড়িত মানুষের সামনে।

আগে হতেই মাথা নুইয়ে আসে রেবার।

দেবতা—ভগবান—কোন ধর্মের অনুশাসন তাদের বাড়ি নেই। মা দিনরাত কি এক মোহের পিছনে লাগামছেঁড় ঘোড়ার মত দিশাহারা হয়ে ছুটে চলেছে। বিলাস ব্যসনই তা কাছে সবচেয়ে বড়, রেবা ওই শূন্যতাকে দেখেছে।

এত পাবার পিছনে ছুটছে মা, কিন্তু যা পরম শান্তির তাকে হেলায় দূর অতীতে পথের ধারে ঘৃণাভরে অবহেলায় ফেলে এসেছে।

রেবা মনের অতলে কি শান্তি-আশ্বাস পায়। এদিকে বিশে আসেনি। হঠাৎ এসে পড়েছে। পায়ে পায়ে মন্দিরে গি ঢুকলো। শ্বেত পাথরের মেজে, বিস্তীর্ণ হলে মাথা নীচু করে ব আছে বহু মানুষ। কি বিচিত্র অনুভূতির আনন্দে রেবার ম ভরে ওঠে।

বিভাসের সন্ধানে এসে পড়ে সে আনমনে কি এক পর সম্পদকে আবিষ্কার করেছে।

…মন্দির থেকে বের হয়ে চলেছে ওদিকের রাস্তা ধরে। সাম পাঁচিল ঘেরা বাংলো। একতলা বাড়িটার গায়ে ঘন আইভিলতা সবুজ বেষ্টনি! গেট খুলে ভিতরে ঢুকে এগিয়ে আসে। বাগা দু'একটা 'ছোট্ট কংক্রিটের মূর্তি, ছোট্ট লিলি পণ্ডের ধারে কাঠে আঁকিবুকির কাজ, লাল শালুক কয়েকটা ফুটে আছে। চাঁপ

গাছের সবুজ ডালের প্রান্তে হলুদ ফুলগুলো ফুটেছে। ভিজে বাতাস মিষ্টি সুবাসে আমন্থর।

ছেলেটা বের হয়ে আসে, রেবা শুধোয় ওকে,

—বিভাস সাব্ হ্যায় ?

পরক্ষণেই বিভাসকে বের হয়ে আসতে দেখে চাইল রেবা। বিভাসও অবাক হয়েছে—তুমি ! এসো—এসো !

বড় ঘরটাকেই স্টুডিওতে পরিণত করেছে বিভাস। জানলায় ভারি পর্দা টাঙ্গানো। ওদিকের ইজেলে একটা অসমাপ্ত ক্যানভ্যাস, আলোগুলো কমানো। একটা ফ্লাড লাইটের আভা পড়েছে ক্যানভ্যাসে।

বিভাসের গায়ের অ্যাপ্রনটাতে রং লাগানো, প্যাস্টেলের রং ছিটকে পড়েছে অ্যাপ্রনে।

…রেবা বলে—কাজে ডিস্টার্ব করলাম না তো ?

বিভাস শোনায় কাজ করি তো বিজ্ঞাপনের, সে কাজ করি আপিসে, না হয় সকালে। এখন অকাজ করছি। জাস্ট এ স্কেচ। সুতরাং বাধা তুমি দিতে পারোনি।

কি খাবে ? চা না কফি ?

…রেবা দেখছে বিভাসের শিল্প জগৎকে।

অসমাপ্ত ইজেলের দিকে চেয়ে থাকে রেবা, দেখছে সে ছবিটাকে। অজন্তার একটা ম্যুরাল এর কপি করার চেষ্টা করছে সে। মা আর ছেলে। সামনে কাষায় পরিহিত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী—মহিমায় বৈভবে সে আজ প্রদীপ্ত, অনেক বড়।

…রেবা বলে—তোমার এখানে আসতে গিয়ে এমনি এক পরিবেশ দেখে এলাম। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর পায়ের নীচে মাথা নামিয়ে অনেক কিছু পেলাম। সেই অনুভূতিতে মন ভরে আছে।

বিভাস দেখছে ওকে। বলে সে,

—জীবনের সেই মুহূর্তগুলোকেই ছবির মধ্যে আটকে রাখতে হবে রেবা। তাই এই জগতের কিছু দেখতে হবে। আর কর্ম—ড্রইং

—আইডিয়া এসব সম্বন্ধে আরও জানতে হলে ভারতের বুকে ছড়ানো পুরোনো আমলের কাজও দেখতে হবে। ধরো অজন্তা ইলোরার গুহা, খাজুরাহো, কোনার্ক—উড়িষ্যার কিছু মন্দির, বাংলাদেশের বিষ্টুপুরের টেরাকোট্টার কাজও দেখা দরকার। শিল্পী হতে গেলে প্রকৃতির সঙ্গে চাই নিবিড় যোগাযোগ, প্রকৃতিই সবচেয়ে বড় শিল্পী!

ভাসে রাখা ডালিয়া, বারে পড়া কাঠবাদামের লাল-সবুজ-গোলাপি পাতা কয়েকটা তুলে নিয়ে বলে বিভাস,

—এদের রং, শেড, টেক্সচার দেখেছো? কোন শিল্পীর কল্পনায় তার রংএ সব আনা সম্ভব নয়। প্রকৃতি পাহাড়-পর্বতে—সমুদ্রে—বনে সাজিয়ে রেখেছে তার শিল্পকর্ম।

উপনিষদ বলে—পশ্য দেবস্য কাব্যম্

ন মমার, ন জীযতি।

দেবতার মহাকাব্য দেখো, এর মৃত্যু নেই, জরা নেই। সেই রূপকেও দেখতে হবে রেবা। সেই চোখ মনের দরকার। ওসব নেই তাই বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকছি আর্টিস্ট নাম ভাঁড়িয়ে।

রেবা শুনছে ওর কথাগুলো। মনে হয় সত্যিই।

নিজেকে সে সেই ভাবে তৈরী করতে চেষ্টা করবে। ওই দূর বনপর্বত, প্রকৃতির রাজ্য, অতীত শিল্পের পীঠস্থান তাকে ডাকে কি অদৃশ্য আহ্বানে।

রেবা বলে—যাবে অজন্তা, ইলোরায়? বাংলাদেশে—উড়িষ্যাতেও ঘুরে আসবো ক'দিনের জন্য।

রেবার কলকাতার কথা, তার বাপির কথা মনে পড়ে। ক'বছর দেখেনি তাকে। তবু বাবা তাকে ভোলেনি। দিদার ওখানে চিঠিপত্র আসে। রেবাও ওখান থেকেই বাবাকে চিঠি দেয়।

রেবা শোনায়,

—চলো না কিছু দিনের জন্য ঘুরে আসবো

বিভাস ভাবছে কথাটা। রেবা বলে,

—কোন অসুবিধা হবে না। অজন্তা ইলোরা সেরে জলগাঁও'এ ক্যালকাটা মেলে উঠবো। কলকাতায় আমাদের বাড়ি আছে কোন অসুবিধা হবে না।

বিভাস অনেকদিন কলকাতা ছাড়া।

এখানে এসেছিল আর ফেরা হয় নি। বহু দিন পর রেবার মুখে কলকাতা যাবার কথা শুনে কি ভাবছে।

রেবা বলে কুণ্ঠিতস্বরে—বাড়িতে না উঠতে চাও হোটেলেই উঠবো। ওখান থেকে উড়িষ্যা যাবো। তুমি সঙ্গে থাকলে বেশ কিছু স্কেচও করা যাবে, দরকার মত জেনে নিতে পারবো।

বিভাস বলে—হাতের কাজগুলো শেষ করে ছুটি নিয়ে বের হবো। দেখা যাক কবে নাগাদ যেতে পারি। তোমার মাকেও জানাতে হবে!

রেবা মায়ের কথায় কি ভাবছে।

মাকে সব খবর সে জানাতে চায় না। কিন্তু টাকাকড়ি লাগবে, আর তার অনেক দিনের সাধ ওপাশের ছাদে একটা স্টুডিওর মত করে নেবে।

বিভাসের স্টুডিও দেখে সেও বুঝেছে নিরিবিলিতে কাজ করতে হবে, তার জন্য অমনি একটা কিছুর প্রয়োজন।

রেবা বলে—ওসব হয়ে যাবে। তুমি কিন্তু যাবার জন্য তৈরী হও! কবে নাগাদ বেরুবে জানালে কলকাতায় চিঠি দিয়ে উড়িষ্যার টিকিট, হোটেল এসবের ব্যবস্থা করতে বলবো।

বিভাস বলে ঘড়ির দিকে চেয়ে,

—চলো তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি। কত রাত হ'ল দেখেছো?

রেবারও খেয়াল হয়।

শিখা বৈকালের ফ্লাইটে সান্টাক্রুজে নেমে সোজা মধু সোমানির আপিসে গেছে। মধু সোমানির ব্যবসার এই দিকটায় একটু

মন্দা এসেছে। এ সম্বন্ধে খবর নিয়েছে মধু, জেনেছে শিবদাসানিও এবার উঠে পড়ে লেগেছে। রাজস্থান—উড়িষ্যা—কাশ্মীরের দিকেও শিবদাসানি ঘুরছে, মালপত্র সব সেই বেশী যোগাড় করছে। শিবদাসানি দক্ষিণ ভারতের ওদিকে সংগ্রহ করা কিছু পুরোনো মূর্তিও বেশ চড়া দামে বিক্রী করেছে, দেশী ঢাউ নৌকায় চোরাপথে সে সব মাল আরব দেশ হয়ে মার্কিন মুলুকে চলে যাচ্ছে।

আরও যা খবর পেয়েছে মধু সোমানি তাতে চটে গেছে সে। বৈকাল নামছে! সমুদ্রের জলো হাওয়া জানলার পর্দা ছাপিয়ে ঘরে আসছে। এয়ার কনডিশন মেসিনটাও খারাপ হয়ে গেছে, মধুর মেজাজ তাইতে চড়ে আছে, আর এই আর্ট এর ব্যবসাতেও লোকসান চলেছে।

টাকা এতদিন পেয়েছে, খুশিই ছিল সে। এবার টাকা আমদানী কিছু কম হতে ওদের প্রীতির সম্পর্কেও চিড় ধরেছে। সম্পর্কটা প্রীতির নয়, টাকার!

কাম ইন্!

ঢুকছে শিখা। এতটা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে তবু তার মুখে চোখে কোন ক্লান্তি নেই। হাল্কা ঝলক হাসির সাড়া তুলে শিখা বলে—হোয়াট নিউজ মধু! ছবি কিছু আসছে, নোতুন ছবি।

মধু সোমানি দেখছে শিখাকে।

শিখা বলে চলেছে,

—প্লেনে আসার সময় প্ল্যানটা 'চক্' আউট করলাম। একটা আর্ট এগ্জিবিশন করা যেতে পারে। সব ব্যবস্থা করবো—বোম্বে, ক্যালকাটা, মাদ্রাজ, দিল্লী, বরোদা, সব জায়গার ইয়ং জেনারেশনের ছবি নিয়ে এই প্রদর্শনী হবে!

মধু সোমানি এবার চাপা রাগে যেন ফেটে পড়বে। বলে সে,

—থামো শিখা, আই অ্যাম্ নট ইনটারেস্টেড! তোমাকে এত টাকা খরচ করে কোম্পানী বাইরে পাঠাচ্ছে, এত ঘটা করছে তোমার পিছনে বাট্ হোয়াট ইজ দিস?

চাইল শিখা মধুর দিকে। মধু সোমানী বলে,

—তোমার জন্য কোম্পানি লস্ এ চলেছে। মোরওভার আমাদের ট্রেড সিক্রেট-আমাদের প্ল্যান প্রোগ্রামগুলো আগে থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে, অ্যানাদার ফার্ম সেগুলো কাজে লাগাচ্ছে! কে এসবের জন্য দায়ী তাও জেনেছি।

শিখা অবাক হয়। মধু মনে মনে এইসব ভাবছে তা আগে ও টের পায়নি! কিন্তু এই অভিযোগ করেছে মধু তার বিরুদ্ধেই। শিখা নিজেকে অপমানিত বোধ করে। শুধোয় সে,

কি বলছো মধু?

মধু সোমানি বেশ চড়া স্বরে জানায়,

—ঠিকই বলছি। এটা অস্বীকার করতে পারো?

শিখা এই সরাসরি অভিযোগের প্রতিবাদ করে—হ্যাঁ!

মধু সোমানি বলে—জয়পুরে তুমি আর শিবদাসানি এক হোটেলে উঠেছিলে। দু'জনকে শহরে একসঙ্গে ঘুরতে দেখা যেতো। অনেক রাত অবধি দু'জনে বাগানে বসে কি এত গোপন আলোচনা করতে?

তারপরই শিবদাসানির ফার্ম ওই এগ্‌জিবিশনের অ্যানাউন্সমেণ্ট দিয়েছে।

শিখা জ্বলে ওঠে রাগে অপমানে। বলে সে শান্ত কণ্ঠে,

—তোমার ফার্মের কোন প্ল্যানই আলোচনা করিনি। আর কার সঙ্গে কথা বলবো, মিশবো ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

শিখা ভাবছে শিবদাসানির কথাটা।

মধু সোমানি বলে,

—তবু আমার এখানে কাজ করো, আমি চাইব আমার অপোজিশন পার্টির সঙ্গে তোমার ওই ব্যক্তিগত ব্যাপারটা একটু কম-সম করেই চলতে হবে!

শিখাকে মধু সোমানি আজ প্রকাশ্যেই অপমান করতে চায়।

জানাতে চায় তাদের মধ্যে আর বন্ধুত্ব, প্রীতি-টীতির কোন সম্বন্ধ নেই। আজ মধু সোমানি বদলে গেছে।

শিখাও সুযোগটা পেয়ে যায়। এবার মধু সোমানির এই কথার জবাব সে দেবে, তবে অন্যভাবে।

মধু বলে, কথাটা মনে রাখবে শিখা!

শিখা উঠে দাঁড়ালো। ওর সুন্দর চেহারাটা যেন খাপখোলা তলোয়ারের মতই ঋজু আর ধারালো হয়ে ওঠে। মুখের হাসিতে ফুটে ওঠে ঝকঝকে তীক্ষ্ণতা। শিখা বলে,

—আজ চলি মধু! তোমার কথাটা মনে থাকবে। ওই ব্যক্তিগত ব্যাপারের কথা। বাই!

শিখা বের হয়ে গেল,

মধু সোমানি একটু অবাক হয়। ভেবেছিল শিখা তার কাছে ক্ষমা চাইবে, দোষ স্বীকার করবে। এ ব্যাপারে এত কড়া ভাবে কথাগুলো বলতে চায় নি ওকে, কিন্তু মধু বলে ফেলেছে কথাগুলো ওই ভাবেই।

চুপ করে থাকে সে।

শিখা রাগটা ওখানে প্রকাশ না করে বাইরে এসেছে; এর জবাব সে দেবে মধুকে। সুযোগও পেয়ে গেছে এবার। ফ্ল্যাটে ফিরেছে তখন রাত্রি প্রায় ন'টা।

অম্বাবাঈ দরজা খুলে দিতে শিখা ঢুকে এদিক ওদিক দেখে শুধোয়। রেবা নেই?

অম্বা দেখেছে ক'দিন ধরে রেবা কাজই করেছে। আজ কলেজে গেছে, বলে গেছে ফিরতে দেরী হবে। অম্বা কথাটা জানাতে শিখা বলে—শুধু আজই দেরী হবে বলে গেছে? কি করছিল এই ক'দিন?

অম্বা বলে—কাজই করতো।

শিখা রাগত ভাবে ব্যাগটা রেখে সোফায় বসলো। মেজাজটা ভালো নেই।

স্নান করাটা শিখার কাছে একটা বিলাসই। বাথরুমে বড় বাথটবে জল ভর্তি করে কয়েক দানা সল্ট দিয়ে গীজার খুলে গরম জল খানিকটা মিশিয়ে আরাম করে স্নান করে সে।

সারা দেহ মনের ক্লান্তি মুছে যায়।

পোষাক বদলে এবার একগ্লাশ শ্যাম্পন-এ চুমুক দিয়ে চলেছে। ফোনটা বাজতে থাকে। শিখার মনে হয় মধুই ফোন করছে, বোধহয় এবার অন্য সুরেই কথা বলবে মধু।

ফোনটা ধরবে কিনা ভাবছে, কি ভেবে অম্বাকেই ধরতে বলে।

ফোন করছে শিবদাসানি।

—হাই শিখা!

শিখা শুধোয়—কবে ফিরলে?

কাল! কখন মিট করছি? শিবদাসানিই কথাটা পাড়ে।

শিখা মনস্থির করে ফেলেছে। বলে সে ব্যাপারটা হাল্‌কা করার জন্য,—এত তাড়া কিসের?

শিবদাসানি বলে—তোমার বাড়ির কাছে 'ওটারস্' ক্লাবে রয়েছি। ফিলিং লোনলি! কাম অন—জয়েন হিয়ার!

'ওটারস্ ক্লাব' ওর বাড়ির কাছে। বান্দ্রার রাস্তাটা চলে গেছে পাহাড়ের বুক জড়িয়ে অন্যদিকে সমুদ্রে। 'ওটারস্ ক্লাব' ওই সমুদ্রের পাথরের উপরই। 'ওটার' কথার মানে 'উদ্‌বিড়াল'। জলজ জীব, কাল্‌চে রং।

ক্লাবটার পাথরের তৈরী বাড়িটার রংও কাল্‌চে, আর সমুদ্রের উপর পাথর বুঁজিয়ে ওটা তৈরী, জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল এসে তিনদিক ঘিরে ফেলে। পিছনের লাউঞ্জ থেকে দেখা যায় শুধু জল আর জল। সমুদ্রের ঢেউগুলো পাথরে এসে সগর্জনে আছড়ে পড়ছে।

শিখা আজ শিবদাসানির সঙ্গেই হাত মিলিয়েছে।

শিবদাসানি বলে—তোমার উপরই এসব ব্যাপারের দায়িত্ব ছেড়ে দিলাম শিখা।

ক্লাবে মিঃ প্যাটেলও এসেছে। ওদের কাছে সব খবরই কোন অদৃশ্য ইথারে ছড়িয়ে পড়ে। মিঃ প্যাটেল এর মধ্যে ক' পেগ খাঁটি স্কচ গিলেছে, গালটা লালচে হয়ে ওঠে। ভারি চোখ দুটো ঢুলুঢুলু করছে। সেও শিবদাসানির পার্টনার এই ব্যবসায়।

মিঃ প্যাটেল শিখাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে,

—কনগ্রাচুলেশনস্ শিখা। চিয়ার্স ফর দি এগ্‌জিবিশন।

আবার এক রাউণ্ড মদ গিলে ওরা এই নোতুন চুক্তিকে বেশ মজবুত করে তুললো। মিঃ প্যাটেল বলে,

—লিভ দ্যাট ফ্ল্যাট! ফ্ল্যাট বাড়িতে প্রাইভেসি থাকে না।

শিবদাসানি বলে—ওকে তো আগেই বলেছি। জুহুর বাংলো খালিই পড়ে আছে। কালই রিমুভ করাচ্ছি শিখাকে।

মিঃ প্যাটেল মাথা নাড়ে—দ্যাটস্ ফাইন।

শিখা মধু সোমানিকেও তার প্রকৃত মূল্য কি সেটা বোঝাতে চায়। তার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়েও মধু কথা বলে তাকে আজ অপমানই করেছে।

শিখা বলে—তাই ভালো।

শিবদাসানি শোনায়—চলো। হ্যাভ এ লুক অ্যাট দি বাংলো।

ওরা হৈ-হৈ করে শিখাকে নিয়ে নোতুন বাংলোটা দেখাতে চলেছে।

শিখার কাছে ভাগ্যের পথটা মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে। বাংলোটা দেখে এক নজরেই ভালো লেগে যায়। সমুদ্রের ধারেই পাঁচীল ঘেরা বাংলোটা। গেটের বাইরে শুরু হয়েছে রাস্তার পর বালিয়াড়ি, তারপর সমুদ্র। সমুদ্রের বুকে গাছ গাছালি নিয়ে ছোট দ্বীপ 'মাড আইল্যাণ্ড' জেগে আছে।

বাংলোর বাগানে নারকেল গাছের পাতা কাঁপছে হাওয়ায়। ওদিকে একটা লম্বা শেড, গ্যারেজও করা যেতে পারে। বাগানের

মাঝখানে একতলা বাড়িটা—সামনে পোর্টিকো। ভিতরে প্যানেল—সিলিং-এ কাজ করা। বেশ নিরিবিলি।

শিবদাসানি বলে—কোন অসুবিধা হলে পরে ঠিক করে নেওয়া যাবে।

শিখা কালই উঠে আসতে চায় এখানে।

রেবাকে পৌঁছে দিতে এসেছে বিভাস।

রেবার চোখে তখন দেশভ্রমণের স্বপ্ন, ওরা দু'জনে যাবে অজন্তা-ইলোরায়, যাবে কলকাতা-উড়িষ্যায়।

বিভাস বলে—আজ চলি। পরে দেখা হবে।

হঠাৎ বেলটা বেজে ওঠে। অম্বা দরজা খুলে দিতে শিখা ঢুকছে।

—রেবা!

শিখা রেবার সঙ্গে ওই তরুণটিকে এখানে দেখে অবাক হয়, রেবাও ভাবে নি মা এই সময় এসে পড়বে। বিভাস দেখেছে ওই ভদ্রমহিলার চোখে কি বিস্ময়। মনে হয় বিভাসের, ওরা দুই বোনই। বড় বোন ফিরে এসে তাকে ছোট বোনের সঙ্গে দেখে কিছু ভেবেছে। বিভাস ব্যাপারটা সহজ করার জন্য বলে,

—আমি বিভাস রায়, একটা ফার্মের চিফ আর্ট ডিজাইনার, ফাইন আর্টস-এর ছাত্র, আঁকার সুবাদেই রেবার সঙ্গে আমার পরিচয়।

বিভাস একটু অবাক হয়। দেখছে ওই মহিলাকে। অবাক হয় বিভাস।

শিল্পীর চোখ দিয়ে দেখছে সে ওই মহিলাকে, সুন্দর সুগঠিত দেহ, এতটুকু মেদ নেই। গালে অনাবৃত কাঁধের মাংসপেশীগুলো এখন যৌবনের প্রাচুর্যে সংযত, মসৃণ। বয়সের কোন চিহ্ন ওর দেহে-মুখে ওই চাহনিতে কোথাও নেই।

শিখা দেখছে বিভাসকে।

বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা, সামান্য দাড়িগুলো, তার খোলা বুক—সুগঠিত দেহ তার যৌবন সত্তাকে সোচ্চার করেছে। ওর চোখে দেখেছে শিখা নম্র শুদ্ধ সলজ্জ বিস্মিত চাহনি। ও যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে দেখছে তাকে, নীরব ভক্তের আকুতি ভরা চাহনি নিয়ে।

শিখা প্রথমটায় বেশ রেগে উঠেছিল রেবার সঙ্গে তারই বাড়িতে ওই অপরিচিত ছেলেটিকে দেখে। কিন্তু এবার ক্রমশঃ তার রাগটা পড়ে আসছে।

মাকে রেবা বলে—খুব নাম করা আর্টিস্ট বিভাসবাবু।

শিখারও এই শিল্প জগতে কিছু আনাগোনা আছে। মনে হয় ওর দু'চারটে ছবি ও দেখেছে। কিছু কিনেছিল ও মধু সোমানির ফার্মের হয়ে।

শিখা বলে বিভাসকে,

—বসো! তুমি বললাম, কিছু মনে করোনি তো?

—না-না। বসলো বিভাস। শিখা বলে,

—তোমার ছবি দেখেছি। স্বপনম্—ইন্ দি ডেজার্ট—টয়লার্স অব দি সি। বিভাস ওর দিকে চাইল বিস্মিত হয়ে। রেবাও খুশি হয়েছে মাকে হঠাৎ ভদ্র ব্যবহার করতে দেখে। ভয়ই হয়েছিল শিখার, মা বোধ হয় তাকে তাদের ফ্ল্যাটে দেখে কড়া কথা বলেই বের করে দেবে, রেবা নিজের অপমানেব কথাটা ভাবেনি, ভয় হয়েছিল তার বিভাসের জন্য। কিন্তু মনে মনে এবার নিশ্চিন্ত হয়েছে রেবা।

শিখা বলে চলেছে—তোমার ছবির স্টাইল আলাদা। এ রিয়েল ক্রিয়েশন। কোথায় কাজ করো বললে?

বিভাস জানায় তার ফার্মের নাম।

—ওটা শুধু বেঁচে থাকার জন্যই। ফাইন আর্ট করে ঠিক বাঁচা যায় না এখানে।

মাথা নাড়ে শিখা। বলে সে, তা সত্যি। তবে মনে হয় এবার

দিন বদলাবে। আমাদের ছবির যদি বিদেশের বাজারে কদর হয়—তাহলে এ প্রবলেম সল্‌ভ হতে পারে।

রাত্রি হয়ে গেছে।

বিভাস বলে—আজ তাহলে উঠি!

শিখা শোনায়—পরে দেখা করো। ট্যালেণ্টেড শিল্পীদের জন্য সত্যিকার কিছু করা যায় কিনা ভাবছি এবার। আমার অফিসে এসো।

রেবাও খুশী হয়েছে। বলে সে,

—অফিসে যদি ব্যস্ত থাকো—নাহয় এখানেই আসবে ও!

শিখা ভাবছে কথাটা। তার অফিসও বদলে যাচ্ছে, মায় এই বাড়িটাও। শিখা বলে,

—পরে একদিন সুবিধে মত যোগাযোগ করো এই ঠিকানায়।

ওদের নতুন বাংলোর ঠিকানাটা জানায় শিখা। রেবা অবাক্ হয়।

—ওখানে তোমার নতুন আপিস নাকি মা?

শিখা বলে—না রে! এই ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে জুহুর ওই বাংলোতে উঠে যাচ্ছি। সমুদ্রের ধারেই সুন্দর বাংলো—বাগান।

রেবা এমনি একটু আশ্রয়ের সন্ধানই করছিল।

নিরিবিলি নিজের কাজ করতে পারবে সেই শান্ত সবুজ পরিবেশে। ফ্ল্যাট বাড়ির জীবনে তারও বিরক্তি এসেছে। চেনা, আধচেনা বহু বিচিত্র ধরনের মানুষ হা করে চেয়ে থাকে। অনেক ফ্ল্যাটের ছেলেরা ভাবে এই বিল্ডিং-এর মেয়েদের উপর তাদের কিছুটা অধিকার রয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে দু'চারটে ছেলে ওকে দেখে শিষ দেয়।

একটা ছেলে তো সেদিন বলে—লেট আস গো টু ডিস্‌কো হনি। বহুত মজা আয়েগা। সিগ্রেট!

সিগ্রেট এগিয়ে দেয় সে।

হাসছে দাড়িগোঁফ ভরা মুটকে মুখ নিয়ে। গলা নামিয়ে বলে,

—রিয়েল গ্রাস্!

ওরা সিগ্রেটের তামাক ফেলে 'হাসিস্' পুরে টানে, বেদম নেশা হয় তাতে। মদ তো গেলেই—দেখেছে মাতাল হয়ে ঘুরতে, তাতেও খুশি নয়। তাই হাসিস্ ধরেছে।

—নো, থ্যাঙ্কস্! সরে আসে রেবা।

ওরা হাসছে। নানা অসুবিধা বোধ করছিল সে। কাজ করারও জায়গা নেই।

রেবা শুধোয়—বেশ বড় বাংলো মা? আমার ছবি আঁকার জন্য একটা ছোট্ট স্টুডিও বানাতে হবে! জায়গা আছে তো?

শিখা হাসলো! বলে সে—কালই দেখবি।

…পরদিন আর সময় নেই রেবার।

ক'বছরে ছোট ফ্ল্যাটটা নানা জিনিষে বোঝাই হয়ে ছিল। স্টিরিও, টিভি, টেপ রেকর্ডার, কুকিং রেঞ্জ, ফ্রিজ, নানা সম্ভার ছাড়াও ভারি ভারি ক'টা ওয়ার্ডরোব-আলমারি, এটা সেটা ছাড়া রেবারও ছবি, ক্যানভ্যাস-ইজেল নানা কিছু জমেছে।

শিবদাসানির কারখানার কিছু লোকজন লরি এনে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে মালপত্র সব গুছিয়ে তুলে নিয়ে চলে গেল নতুন বাংলোয়।

রেবাও আগে চলে গেছে অম্বা বাঈকে নিয়ে।

লাস্ট মিনিট চেক আপ করে শিখা বের হচ্ছে, হঠাৎ মধু সোমানিকে দেখে চাইল!

মধু কাল বৈকালে ওসব কথা বলে পরে ভেবেছে ভুলই হয়ে গেছে তার। সকালে মিঃ প্যাটেলের ওখানে গেছিলো। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখেছে বুড়ো টাকার কুমীর, একটু যেন বদলে গেছে।

মধু সোমানি বলে—একটা ডেসপ্যাচ রেডি করেছি, আপনার প্যারিস অফিসের নামে পাঠিয়ে দিই!

মিঃ প্যাটেল আগে আগ্রহ ভরেই ওসব বিলিং-এর ভার নিতো।

মধু সোমানি জানে ওই সব বিলে এখানে কম টাকা রিজার্ভ

ব্যাঙ্ককে দেখিয়ে সেখানে তার দশগুণ স্টারলিং বেশী পাওয়া যাবে, বাড়তি টাকাটা সুইস ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা হয়।

ওদের শিল্প-প্রীতির অনেক গূহ্য কারণই আছে, তার মধ্যে এও একটা। কিন্তু এহেন লোভী প্যাটেল সাহেব বলে,

—তোমার ওই ছবির দাম বেশী পাবো না মধু, আমার কিছুই থাকবে না। পরে ভেবে তোমাকে জানাবো।

অর্থাৎ লোকটা এবার কৌশলে এড়িয়ে গেল তাকে, না হয় চাপ দিয়ে আরও দাম কমিয়ে রাখতে বলছে তাকে, যাতে আরও বেশী লাভ থাকে তার।

মধু সোমানি বিপদে পড়েছে।

এতগুলো টাকা বরবাদ হয়ে যাবে। জানে সে মিঃ প্যাটেলকে এতদিন ধরে রাজী করিয়েছে তার হয়ে শিখাই। তাকেই আবার গিয়ে বুঝিয়ে দলে ফিরিয়ে আনতে হবে। নাহলে ছবির বাজারে যা লাভ করেছে—তার বেশ কিছুটাই জলে চলে যাবে।

মধু সোমানি ব্যবসা বোঝে, তাই অপমান করতেও বাধে না—আবার হাতজোড় করতেও বাধে না। সে দৌড়ে এসেছে শিখার কাছে। সকালে ফোন করেছিল, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক শিখা এড়িয়ে গেছে তাকে।

মধু সোমানি উপরে এসে ফ্ল্যাটে ঢুকে অবাক্ হয়। ঘরগুলো ফাঁকা, জিনিষপত্র, কার্পেট—কিছুই নেই। ছড়িয়ে আছে ছেঁড়া কাগজ—বাতিল এটা সেটা।

শিখা বের হয়ে আসছে, মধু সোমানিকে দেখে চাইল। মুখ-চোখ কঠিন হয়ে ওঠে। কালকের কথাগুলো ভোলেনি শিখা।

মধুও অবাক্ হয় ঘরের অবস্থা দেখে, শুধোয় সে,

—কি ব্যাপার শিখা ?

শিখা বলে—তুমি না এলে তোমার কাছে যেতে হতো এই চাবিটার জন্য, এসে ভালোই করেছো। তোমার ফ্ল্যাট-এর চাবিটা রাখো।

—সে কি! মধু সোমানি এবার চমকে ওঠে।

শিখা বলে—আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলোর জন্যেই তোমার সঙ্গে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না মধু। তা ছাড়া একবার বিশ্বাস হারানোর পর সেখানে না থাকাই ভালো। লেট আস্ কুইট লাইক ফ্রেণ্ডস! বাই!

শিখা মধুকে কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়েই নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। মধু সোমানি তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এবার তার সম্বিৎ ফেরে। মধুও বুঝেছে শিখা তার কাজ ছেড়ে যায় রাতারাতি ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে বোম্বাই শহরে ফ্ল্যাট পেয়ে গেছে। আর পিছনে শক্ত খুঁটির জোর না থাকলে রাতারাতি চাকরি—ফ্ল্যাটও জোটে না।

বুঝেছে মধু সোমানি, শিখার সম্বন্ধে যা সন্দেহ সে করেছিল সেগুলো মিথ্যা নয়। মিঃ প্যাটেল আর শিবদাসানিই শিখাকে তার কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। শিখাও এতদিনের পরিচয়টা এক রাতে ভুলে গিয়েই ওদের দলে চলে গেল।

মধু সোমানি পায়ে পায়ে নেমে এল গাড়ির দিকে।

•

রেবা খুশি হয়েছে বাংলোটা দেখে। নিরিবিলি সবুজ গাছ-গাছালি ঘেরা পরিবেশ, সামনে বালিয়াড়ির পরই সমুদ্র, বাংলোর ওদিকে পাম দেওদার গাছের ছায়াঘেরা শেডটাতেই সে নিজের স্টুডিও গড়বে। মালপত্র গোছগাছ করা হয়ে গেছে।

শিবদাসানি নিজে এসে সব দেখে খুশি হয়, শুধোয় সে,

—তাহলে কোন অসুবিধা হচ্ছে না মিসেস শিখা?

শিখা ওকে ঘরগুলো দেখাচ্ছে। বলে সে,

—না না। ফার্স্ট ক্লাস!

বিভাসও এসেছে। সেও এর মধ্যে হাত লাগিয়েছে এদের গোছগাছে।

বিভাস বলে শিখাকে—ড্রইং রুমটা আমি সাজিয়ে দেব

এখানে একটা ফ্রেসকো করে দেব। আর প্যানেলিং ছাড়াও কিছু ছোট ক্লে মডেল—রেবাই করে নিতে পারবে।

শিখাও দেখছে বিভাসকে।

পরিচয় করিয়ে দেয় ওকে শিবদাসানির সঙ্গে।

—এ প্রমিসিং আর্টিস্ট বিভাস রায়!

শিবদাসানির পরিচয় পেয়ে বিভাসও একটু অবাক হয়। শিল্প জগতের নামী লোক শিবদাসানি। তাদের ফার্মের নামও বিরাট। সেই লোককে এত কাছে দেখবে তা ভাবতে পারে নি। আরও বিস্ময় লাগে শিখা দেবীকে ওর এত পরিচিত দেখে।

শিখাও দেখেছে বিভাসের চোখে মুখে এই পরিবর্তনটা।

শিখা বলে—একদিন আপিসে এসো বিভাস!

শিবদাসানি, আমাদের এগ্‌জিবিশনের ব্যাপারেও বিভাসের সাহায্য পাওয়া যাবে। কি বিভাস?

বিভাস বলে—নিশ্চয়ই।

শিবদাসানি শোনায়—ঠিক আছে, পরে দেখা হবে, শিখা—এদিকের ব্যাপার তো দেখছে এরা। আপিসে যাবে তো!

শিখার প্রথম ওই আপিসে যাওয়ার ব্যাপার আছে। শিখা বলে,

—হ্যাঁ, চলো। নতুন জায়গা দেখেশুনে নিতে সময় লাগবে। চলি রেবা! সব দেখে শুনে গুছিয়ে নে।

ওরা চলে গেল।

বিভাস মনে মনে খুশি হয়েছে। বলে সে রেবাকে,

—তোমার মা তো ছবি-টবির ব্যাপারে এত বোঝেন, ভালো করে আঁকার চেষ্টা করো রেবা। তোমার উন্নতি এ পথে হবেই।

রেবা বলে—কারো মুরুব্বিগিরির জোরে উঠতে চাই না বিভাস। আমি নিজের চেষ্টাতেই বড় হতে চাই।

বিভাস চাইল ওর দিকে।

নিজের মাকেও যেন কোথায় এড়িয়ে চলতে চায় রেবা।

বিভাসের কানে রেবার এই প্রতিবাদের সুরটা বিচিত্র বোধ হয়। কোথায় এরা মা মেয়ে নয়, দুই চিরন্তন নারী। দু'জনে দু'জনকেই সমীহ করে চলে।

তবু বিভাস বলে—সত্যি তুমি ভাগ্যবতী রেবা।

রেবা নিজের এই ভাগ্যকে নীরবে মেনে নিতে পারে নি। সে এই কাঠের ফানুসে এসে আটকে পড়েছে মাত্র। মন থেকে এই বিলাস ব্যসন—মায়ের ওই জীবনকে মেনে নিতে পারে নি। মুক্তির পথই খুঁজেছে।

মা তার প্রিয় জগতের অনেক কিছুই কেড়ে নিয়েছে নিজের খামখেয়ালি মন নিয়ে। বাবার কাছ থেকে জোর করে সরিয়ে এনেছে তাকে। জীবনের একটা পরম পাওয়া থেকে ব্যর্থ করেছে, দিদিমা, মামী-মামাদেরও পর করেছে।

তার জীবনের সব শান্তিকে—প্রিয়জনকে কেড়ে নিয়েছে।

রেবা তাই মনের বেদনাকে ভোলার জন্যই এই ছবির অসীমে হারিয়ে যেতে চায়, এই জীবন থেকে মুক্তি পেতে চায়। ওর মনের অতলের সেই জ্বালাটাকে বিভাসের কাছে জানাতে পারে না। তাই বিভাস রেবার বাইরের জীবনটাকে দেখেই এই কথা বলে।

হাসে রেবা। বেদনার্ত করুণ হাসি।

বলে সে—আমার ভাগ্যটা বড় করুণ বিভাস। আমার ভাগ্যকে আমি নিজেই ভালোবাসতে পারি নি।

প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য বলে রেবা,

—ওসব ছাড়ো। আমার স্টুডিওর খরচা কতো হবে মিনিমাম তাই বলো। চলো না শেডে—প্ল্যানটা একটু করে দেবে।

বিভাস বলে—হবে! এদিকের কাজগুলো বাকী রইল।

রেবা বিরক্ত হয়ে বলে—মায়ের ড্রইংরুম ডেকোরেট করার জন্য শিল্পীর অভাব হবে না বিভাস। অনেকেই আসবে। কিন্তু আমার স্টুডিও তৈরি করে দেবে না কেউ, চলো না।

বিভাসকে টেনে নিয়ে চলেছে রেবা।

মায়ের ঘর সাজানোর চেয়ে ওর দরকার বিভাসকে বেশী !

মাধবী শোনে দুচারটে কথা উষার কাছে।

প্রশান্ত এখন নামী অ্যাড্ভোকেট। তার নিজেরই আপিসে চার-পাঁচ জন জুনিয়ার উকিল আছে। প্রশান্তের ক্লায়েন্টদের অনেকেই বিরাট বড়লোক, ব্যবসায়ী। আর এদের শ্রেণীর মধ্যে কিছু খবর থাকে সেটা হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

প্রশান্তেরও কানে আসে।

মধু সোমানির দল ছেড়েছে শিখা, এবার সে আরও বড় দলে এসেছে।

উষাই খবরটা জানায় মাধবীকে।

মাধবীর বয়স হয়েছে। সংসারের দৈনন্দিন ঝামেলা থেকে সে এখন মুক্ত। উষাই এ সংসারের সব ভার তুলে নিয়েছে নিজের হাতে।

কিন্তু মাধবীর মনের কোণে একটা ভাবনা রয়ে গেছে। সে ওই শিখা ও রেবার জন্য। মা হয়ে এই ভাবনাটাকে সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। উষা বলে,

—শিখাদি নাকি ওই ফ্ল্যাট, চাকরি ছেড়ে দিয়ে এবার শিবদাসানি কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে ওদের বাংলোয় উঠে গেছে।

মাধবী বলে,

—ওই ওর স্বভাব বাছা। এক জায়গায় ও থাকতে পারে না। আর মেয়েটাকে নিয়ে হয়েছে আমার মরণ। ওর অদৃষ্টে কি আছে কে জানে। এক একবার ভাবি বড় হয়েছে বিয়ে-থা দিয়ে দিক।

উষা বলে—তা সত্যি। আর ও আছে তবু শিখাদির পাশে। ও চলে গেলে শিখাদি একা পড়ে যাবে—তাই হয়তো ওকে ছাড়তে চায় না।

মাধবী বলে— তা কি হয়। মেয়েকে তার সংসারে যেতে দিতেই হবে। শিখা নিজের ঘর ছেড়ে এসেছে তাই তার মেয়ের ঘর হবে না এ কেমন মা! মা না রাহু!

উষা কথা বলে না।

হঠাৎ ঝড়ের বেগে রেবাকে ঢুকতে দেখে চাইল মাধবী!

রেবা বলে—তোমার সতীন এসেছে দিদা!

হাসে মাধবী—আয়!

রেবাই খবরটা দেয়।

—মাদার কিন্তু এতদিনে একটা রিয়েল বাংলো ম্যানেজ করেছে দিদা। নাইস বাংলো। আমার বাপু একটা স্টুডিও করার সাধ – তা নিদেন পাঁচ হাজার টাকার দরকার।

উষা বলে—তোমার মাকে বল না?

রেবা চাইল মামীমার দিকে। বলে সে,

—মায়ের কাছে নিতে পারবো না মামী! আর নিতে পারতাম দিদার কাছে, তা দিদার বর তো নেই। কে দেবে ওকে টাকা সুতরাং আমার স্টুডিও হবে না। দেখি কিছু ছবি যদি বিদেশে বিক্রি হয়, বলেছে বিভাস!

উষা শুধোয়—বিভাস কে?

রেবা যেন হঠাৎ একটু লজ্জা বোধ করে। ব্যাপারটা এড়াবার চেষ্টা করে বলে—না! তেমন কেউ নয়।

মাধবী দেখছে রেবার সলজ্জ আরক্তিম আভাসটা। মাধবীর চোখে এই পরিবর্তন বিচিত্র বোধ হয়। শুধোয় সে,

—ছেলেটি কে? ওই বিভাস!

রেবা বলে ওঠে—উকিলের মা যে তুমি তা বুঝেছি বাবা ভালো জেরার মুখে পড়েছি! ওঠো—এসো!

মাধবীকে টেনে তোলে সে। জানলার কাছে এনে পার্কের ওদিকে বাংলোটা দেখিয়ে বলে,

—ওই বাড়িতে থাকে, ছবি-টবি আঁকে!

মাধবী এ পাড়ায় অনেক দিন আছে। বাঙ্গালীদের সকলকেই চেনে। বিভাসের পিসীও তার চেনা। মাধবী বলে,

—সুলতাদির ভাইপো বিভু!

রেবা বলে—কৌতূহল মিটেছে এবার। উঃ, মালকড়ি তো পাবো না সব খবর জেনে নিলে! তা একদিন চলো, নতুন বাংলো দেখে আসবে দিদা।

মাধবী কি ভাবছে।

শুধোয় সে—ওই স্টুডিও করতে কত টাকা লাগবে বললি? পাঁচ হাজার?

—হ্যা। রেবা চাইল ওর দিকে।

মাধবী দেখছে মেয়েটাকে। জীবনে অনেক কিছুই সে পায় নি। থেকেও তার কাছে না থাকা। ও জানে না দূর কলকাতায় একজন ওর জন্যে আজও বুক ভরা ভালোবাসা নিয়ে পথ চেয়ে আছে।

মাধবী বলে—ঠিক আছে। কাল পেয়ে যাবি!

চমকে ওঠে রেবা—কি বলছো দিদা! এ্যা—এককথায় এত টাকা দিচ্ছ?

হাসে মাধবী।

—আমার টাকা নয় রে। তোর বাবাই কিছু টাকা তোকে পাঠায এখানে, ওটা ব্যাঙ্কে তোর নামেই রেখেছি। নিযে নিবি তার থেকে।

রেবা দেখছে মাধবীকে। বাবার ছবিটা মনে পড়ে।

মাধবী বলে—অনেকদিন তোকে দেখে নি, একবার যা না!

রেবা ভাবছে কথাটা। ওদিকেই যাবে সে। বলে রেবা,

—স্টুডিওটার কাজ এগিযে নিযেই যাবো দিদা। ওখানেই যাবো। কতদিন দেখি নি বাবাকে!

মাধবী ওকে কাছে টেনে নেয়। ওর বঞ্চিত শূন্য হৃদয়ের অনেকটা শূন্যতা এই বৃদ্ধাই স্নেহ দিয়ে ভরিয়ে দিযে তাকে সব অকল্যাণ থেকে বাঁচাতে চায়।

বিভাস একটু অবাক্ হয় শিখার আপিস দেখে।

দামী সেগুন কাঠের প্যানেল করা দেওয়ালে কিছু মডার্ন ছবি, ওদিকে তামার পাত্রে ইকাবোনা রীতিতে ফুল সাজানো, মেঝের কার্পেটটা দেওয়ালের সঙ্গে ম্যাচ করানো, সোফাগুলোর রংও তেমনি।

এয়ার কুলারের শব্দ ওঠে।

—বসো!

বিভাস এসেছে শিখার কাছে আজ ওরই ডাকে। এর আগে কিছু ছবি দিয়ে গেছে বিভাস। তার খবর ও জানে না। বিভাসের টাকার দরকার।

বাইরে যাবার প্ল্যান করেছে সে-ও। বোম্বেতে হাঁপিয়ে উঠেছে। অনেকদিন পর সেই মুক্তির স্বপ্ন দেখছে সে রেবাকে কেন্দ্র করে।

শিখা বলে—তোমার তিনখানা ছবি আমরা নেব ঠিক করেছি। এই যে বিল।

টাকার অঙ্কটা দেখে একটু চমকে ওঠে বিভাস।

শিখা দেখছে ওর মুখের পরিবর্তনটা। শুধোয় সে,

—এনি প্রবলেম?

বিভাস এতটা আশা করে নি। পাঁচশো—সাতশো টাকার জায়গায় তাকে প্রতি ছবিতে দাম দিয়েছে দু'হাজার টাকা করে। বিভাস বলে,

—না, না। যথেষ্ট ধন্যবাদ!

শিখা ওর মুখচোখে দেখেছে কৃতজ্ঞতার ছায়া। মনে হয় বিভাসকে সে হাতে আনতে পারবে। শিখা বলে,

—পরে আরও ছবির দরকার হবে। এগ্‌জিবিশনে ও নতুন ছবি কিছু দেবে!

বিভাস তাই বাইরে যাবে। বলে সে,

—সিওর!

উঠে আসে বিভাস নমস্কার জানিয়ে। শিখা কাজে মন দেয়।

শিবদাসানির ফোনটা বাজছে। ধরে সে। শিবদাসানি বলে,

—আজ সন্ধ্যায় মিট করছো প্যাটেলজীর কুঠিতে, জরুরী মিটিং আছে।

শিখা বলে—ঠিক আছে।

জানে সে ওই মিটিংগুলোর অর্থ কি। রাত্রি অবধি মদ্যপানও চলে। আর ওদের বিচিত্র জীবনের সঙ্গে সে-ও নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে তার অজান্তেই।

তবু শিখা স্বপ্ন দেখে। কিছু টাকা আরও তার চাই। তারপর সে নিজের জীবন সম্বন্ধে একটা প্ল্যানও করেছে। কি ভাবছে সে। ততদিন এই জীবনের স্রোতে গা ঢেলে দিতেই হবে তাকে।

সেদিন বাংলোয় ফিরে শিখা একটু অবাক হয়।

রেবা তাকে কিছুই বলে নি। জানাবার দরকারও বোধ করে নি। কাঠ, ম্যাসনেট বোর্ড, রং—সব এসে গেছে। শেডটাতে মিস্ত্রী কাজ করছে।

শিখা বেলায় উঠে বাগানে বসে। ওদিকে নজর পড়তে এগিয়ে যায়। রেবা ব্যস্ত. বিভাসও এসে মিস্ত্রীদের কি নির্দেশ দিয়ে কাজ করাচ্ছে। রেবা শাড়িটা গাছ-কোমর করে জড়িয়ে তুলি হাতে বোর্ডে রং করছে।

ফর্সা রং টক টক করছে কি উত্তেজনায়।

শিখাকে দেখে রেবা বলে—কাজ করার জন্য নিজের একটা স্টুডিও করতে হবে মা।

শিখা শুধোয়—টাকা পয়সা কোত্থেকে পেলে?

রেবা মায়ের কাছে হাত পাতে নি। বলে সে—ও হয়ে যাবে কোনরকমে। মানে দিদার কাছ থেকে নিলাম টাকাটা!

শিখা চটে ওঠে।

দিদার কাছ থেকে নিতে সম্মানে বাধলো না?

শিখা চায় না ওখানে যাক সে, ওদের টাকা নিক। রেবা বলে,

—কয়েকটা ছবি তো তোমাদের ফার্ম নেবে। টাকাটা পেলেই দিয়ে দেব মা মণি !

শিখা বলে—তাই দিও ! এসব আমি পছন্দ করি না। টাকার দরকার আমাকে বললেই পারতে !

রেবা যে মাকে ঠিক মানতে পারে না এটা শিখাও জানে। দুটি নারীর মধ্যে নতুন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাদের অজ্ঞাতেই।

বিভাস এসে পড়ে।

শিখাকে দেখে চাইল। শিখার মুখের কাঠিন্য মুছে গেছে।

বিভাস বলে—সুন্দর পরিবেশ। এখানে এসে আমিও কাজ করতে পারবো তাই রেবাকে দিয়ে এটা করাচ্ছি।

শিখা বলে—বেশ তো ! চা খাবে ?

—আবার চা ! বিভাস বলার চেষ্টা করে।

শিখা বলে—রেবা, অম্বাকে বলে দে বাগানে চা পাঠাবে !

দু'জনে চলেছে পামগাছের নীচে রাখা চেয়ারগুলোর দিকে। সবুজ লনের ধারে রঙ্গীন ফুলের বেড। দু'চারটে ইউক্যালিপটাস সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়ায় মাথা নাড়ে।

রেবাও বসেছে চায়ের টেবিলে।

বিভাস কথাটা পাড়ে—নতুন ছবির জন্য দিন কতক বাইরে যাবো ভাবছি। অজন্তা-ইলোরা-খাজুরাহো হয়ে উড়িষ্যা ঘুরে আসবো। খোদাই-এর কাজও কিছু করছি।

শিখা বলে—বেশ তো !

রেবা শোনায়, এই সঙ্গে আমিও জায়গাগুলো ঘুরে আসি মা। প্লিজ ! নাহলে আর একা তো যেতে পারবো না ! অবশ্য বিভাস বাবুর যদি অমত না থাকে।

শিখা দেখছে রেবাকে।

ও যেন নতুন একটি সত্তা। চোখে মুখে যৌবনের উচ্ছলতা। শিখা তার হারানো দিনের কথাগুলো ভাবছে। বাতাসে উড়ছে ওর চুলগুলো। চোখে কি ঝলমলে খুশির স্বপ্ন।

বিভাস বলে—না না। আপত্তি আমার কেন থাকবে? তবে তোমার অসুবিধা হবে।

রেবা শোনায়—ওসব কিছু হবে না। মামণি, যাই ক'দিন। কিছু সেরা কাজ দেখে আসবো।

শিখাকে যেন ইচ্ছে করেই কৌশলে চাপ দিয়ে রেবা এই অনুমতি আদায় করার কৌশল করেছে বিভাসকে সামনে রেখে।

এখন অমত করলে বিভাসও কি ভাববে।

শিখা চুপ করে থেকে বলে—ঠিক আছে। ফিরতে দেরি করিস নি। আর রোজ চিঠি দিবি।

ঘাড় নাড়ে রেবা।

শিখা বলে বিভাসকে—তোমারও অনেক কাজ পড়ে আছে বিভাস, দেরি করো না। এগ্‌জিবিশনের সব ভার নিতে হবে তোমাকে।

বিভাস এই মর্যাদা পেয়ে মনে মনে খুশি হয়েছে। বলে সে—দেরি হবে না।

রেবা শোনায়—সামনের সপ্তাহেই বের হয়ে পড়ি মামণি!

রেবা যেন মুক্তির আশ্বাস পেয়েছে।

মা চলে যেতে এ অন্য রেবা। বিভাসকে বলে,

—আজ কাজ এগিয়ে নিতে হবে। কাল শেষ করবো। দুপুরে আজ এখানেই লাঞ্চ করে নেবে।

বিভাস বলে—বাঃ রে, আপিস যেতে হবে না?

রেবা এগিয়ে আসে, বিভাসের কাছে। কর্মব্যস্ত বিভাসের চুলগুলো আদর করে নেড়ে বলে,

—আজ আপিস নাই বা গেলে! আমার জন্য একটা দিনও নষ্ট করতে পারো না? এ্যাই!

বিভাস চাইল রেবার দিকে।

ওর দু'চোখে নিবিড় গহীন চাহনি। কি ব্যাকুলতা, আতি ফুটে ওঠে।

রেবা বলে—কাল শেষ করতে না পারলে বের হতে দেরি হয়ে যাবে। মা আবার ফট্ করে বলে বসবে—যাওয়া হবে না!

হাসছে বিভাস,

—মাকে খুব ভয় করো, না?

রেবা চাইল ওর দিকে। রেবার মনে হয় তার মনের অতলের চাপা বেদনার জ্বালাটা যেন বের হয়ে পড়বে। মাকে সে ভয় করে না। মাকে সে মেনে নিতে পারে নি। সহ্য করতে পারে না ওই স্বার্থপর একটি মেয়েকে যে বার বার তার জীবনে কেবল শূন্যতাই এনেছে।

এটা রেবার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেটাকে অকারণে প্রকাশ করতে চায় না সে।

রেবার সুন্দর মুখে কাঠিন্য মুছে গিয়ে ফুটে ওঠে হালকা হাসির আভা।

বলে সে—করতে হয় মশাই। গার্জেন বলে কথা। তারপর বলে—তাহলে বলে দিই অম্বাকে। আর আমিও নিজে আজ তোমার জন্যে চিকেন ফ্রায়েড রাইস বানাবো।

ওটা বিভাসের প্রিয় খাদ্য। রেবাও তা জানে। তাই নিজেই সেই পদটা রান্না করে ওকে খাওয়াতে চায়।

বিভাস বলে—তাহলে আপিস যাচ্ছি না। চিকেন ফ্রায়েড রাইস—

হাসে রেবা, কি পেটুক লোক রে বাবা!

মাধবীও দেখেছে বিভাসকে।

ঊষাও চেনে। রেবা এসেছে। বাইরে যাবার প্ল্যান হয়ে গেছে তাদের। মাধবী বলে,

—বিভাস শুনেছি ভালো ছেলে। রোজগার ও মন্দ করে না।

হাসে রেবা—সুতরাং কি করতে হবে?

মাধবী হাসে—ন্যাকা মেয়ে! তা তোর মা কি বললে? দু'জনে
য বাইরে যাবি!

রেবা বলে—মাদার পারমিশান দিয়েছে। বিভাসকে মা'ও চিনেছে। মায়ের ফার্মও ওর বেশ কিছু ছবি কিনছে। তাই ওদের ছবি পাবার জন্যেই বিভাসকে ওরা যেতে মত দিয়েছে।

মাধবী বলে—কে জানে বাপু! তাহলে কলকাতায় যাবি তো?

হাসে রেবা—মাকে বলিনি: তোমাকে বলছি বাপির ওখানেও যাবো। তাই বের হয়েছি দিদা।

অজন্তা-ইলোরাতেই ক'দিন কেটে যায় ওদের। অজন্তার পাহাড়ে বসে ওরা বেশ কিছু স্কেচ করেছে, দেখেছে মা-ছেলে আর কাষায় পরিহিত সন্ন্যাসীর ছবিটাও। ইলোরায় গিয়ে দেখেছে পাথরের বুকে নতুন এক মহাকাব্য।

রেবা বলে—খোদাই আর ভাস্কর্য, এ আরও কঠিন কাজ বিভাস!

বিভাস বলে—তা সত্যি! এ তবু বড় বড় কাজ, আর শ্বেত পাথরের উপর ভাস্কর্য দেখতে চাও—তবে দৈলবারা মন্দির। পদ্মের পাপড়িগুলো শ্বেত পাথরের। এত বিচিত্র, মনে হয় টল টল করছে।

...ইলোরা থেকে অজন্তা!

রেবার মন পড়ে আছে কলকাতার দিকে। নতুন এক তীর্থে ফিরছে সে, বিভাস ওকে আনমনা হয়ে ভাবতে দেখে চাইলো।

—কি ভাবছো?

বৈকাল নামছে অজন্তার রুক্ষ পর্বতসীমায। বহু নীচে নদীটা বয়ে চলেছে। ওদিকে চায়না পিকের আড়ালে হারিয়ে গেছে সূর্যের আভা। বিষণ্ন অপরাহ্ন নামছে।

রেবার দুচোখে নিঃস্ব জীবনের বেদনা, তবু সেটাকে এড়াবার জন্য বলে সে—না। কিছু না। কালই যাচ্ছি জলগাঁও!

নিশীথ চিঠিটা পেয়ে খুশি হয়। হাক পাড়ে—ভূষণ!

ভূষণের বয়স হয়েছে, বৌদি চলে যাবার পব সেও বেশ কয়েকবার বলেছে নিশীথকে—যা হবার তা তো হলো। আবার ঘর-সংসার করো। কার জন্য পথ চেয়ে থাকবে?

নিশীথ দু-একবার বোম্বাই যাতায়াত করেছে। বেশ জানে শিখা আর ফিরবে না, এখানে তার কোন আকর্ষণই নেই, তবু নিশীথের বার বার মনে পড়ে রেবার কথাগুলো। তার ব্যাকুল সেই কান্না—ডাগর দু'চোখের মিনতি কিছুই ভোলেনি সে। রেবার পথ চেয়েই আছে সে।

একটা পরম সঞ্চয় তার রয়ে গেছে পিতৃহৃদযের কাছে। রেবার চিঠিও আসে, পাশ করার খবরও পেয়েছে সে, ভূষণকেও শোনায় কথাটা।

—বুঝলি ভূষণ, রেবা এবার বড় হয়ে উঠেছে। নিজেই এবার এখানে আসতে পারবে, ওর ঘরটা বাপু ঠিকঠাক করে রাখবি।

ভূষণ ওর এই প্রতীক্ষার কথা জানে। এতদিন ধরে নিশীথ যেন সেই পথই চেয়ে আছে, ভূষণের ভালো লাগে না। লোকটা দিনরাত পড়াশোনা লেখা আর কলেজ নিয়েই আছে।

মাঝে মাঝে এখান-ওখানের বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার দিতে যায় ভূষণই নন্দকে নিয়ে বাড়িতে থাকে।

ভূষণ বলে—থামো তো তুমি। তারা আবার এসেছে? বোম্বাই শহরের রোশনিতে মজে গেছে।

নিশীথ জানে তার কিছুটা। শিখার সম্বন্ধে ওইরকম ধারণা তার হয়েছে, কিন্তু তার মনে হয় রেবা তারই মেয়ে, সে অমন হবে না। বলে সে—থাম তো তুই!

হাসে ভূষণ। মনে করিয়ে দেয়,

—কোথায় লেকচার দিতে যাবে বললে?

খেয়াল হয় নিশীথের। বলে সে—সময় মত মনে করিয়ে দিবি তো! ইস্! গাড়ি বের করতে বল।

দিন কাটে এমনি করেই।

হঠাৎ সেদিন দুপুরের ডাকে চিঠিটা পেয়ে নিশীথ কলেজ বের হবার মুখে হাঁক-ডাক সুরু করে—ভূষণ,—নন্থ—এ্যাই নদো!

ভূষণের একটু ভাত-ঘুম দেওয়া অভ্যেস, শুয়েছিল সে। নিশীথের ডাকে উঠে পড়ে। নন্থও আসে।

নিশীথ চিঠিখানা দেখিয়ে বলে,

—ত্থাখ! বলি নি রেবা ঠিক আসবে। সে তার বাবাকে ভোলে নি! রেবা আসছে সামনের রবিবার বোম্বাই মেলে। ওর ঘর ঠিক করে রাখ। কি কি দরকার নিয়ে আসবি বাপু মানদাকে শুধিয়ে। আর রেবা যা ভালোবাসে জেনে নিয়ে রান্না-টান্না করবি।

দুটো দিন নিশীথের কি ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে কাটে। সামনের সপ্তাহে ওর ভুবনেশ্বরে লেকচার। সেই পেপারও রেডি করতে মন বসে না।

নিশীথ গাড়ি নিয়ে এসেছে নিজে স্টেশনে।

বোম্বে মেল থেকে যাত্রীবা নামছে, ব্যাকুলতা নিয়ে চেয়ে আছে নিশীথ, কত আপনজন এসেছে কতজনকে নিতে। লোকজনের ভিড়ে প্লাটফর্ম উপছে পড়ে।

সকলেই বের হয়ে যাচ্ছে। রেবার দেখা নেই। ছোট মেয়েটাকে সে খুঁজছে দুচোখ দিয়ে। ভূষণও এসেছে।

ভূষণ বলে—কই গো দাদাবাবু!

নিশীথ চুপ করে থাকে। হঠাৎ কার ডাকে চাইল। প্রণাম করছে সুন্দরী একটি মেয়ে। হাসিতে উছল!

—বাপি!

চমকে ওঠে নিশীথ। দেখছে সে মেয়েটিকে। তার ছোট্ট রেবা আজ কতো বড় হয়ে গেছে।

—রেবা!

নিশীথ দেখছে ওকে। চমকে ওঠে সে। অতীতের প্রথম দেখ শিখার মতই দেখতে হয়েছে সে। তেমনি চাহনি—মুখচোখ, হাসিটা অবধি। এ যেন বহুকাল পর তরুণী শিখাই এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে।

রেবা বলে—চিনতে পারোনি তো? আমি কিন্তু তোমাদের দেখেই চিনেছি বাপি। ভূষণদা ভালো আছো তো?

বিভাস দাঁড়িয়ে আছে। সে দেখছে ওদের। রেবার খেয়াল হয়। বলে সে—ওমা! বিভাসের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই বাপি! এ বিভাস রায়, নামকরা আর্টিস্ট! দেশ-বিদেশে এর ছবির নাম-ডাক। ওর সঙ্গে অজন্তা, ইলোরা হয়ে এখানে ঘুরে উড়িষ্যায় যাবো কিছু দেখতে—ভুবনেশ্বর, কোনার্ক!

বিভাস নমস্কার করে।

বলে সে—পরে দেখা হবে। রেবা তাহলে তুমি বাবার ওখানে যাচ্ছো, আমি কোন হোটেলেই চলে যাই, তোমার ফোন নাম্বারট দাও, যোগাযোগ করে নেব।

রেবা ভাবেনি বিভাসের থাকার কথাটা। বাবাকে বলতেও কেমন দ্বিধা বোধ করে। নিশীথবাবুই বলে,

—আরে একসঙ্গে এসে আবার তুমি হোটেলে উঠবে কেন? আমাদের বাড়ি তো খালিই পড়ে আছে। বোম্বাই-এর মত হয়তো সুখ-সুবিধা সেখানে পাবে না। তবে থাকা যাবে—আর ডাল-ভাত যা জোটে খাবে আমাদের সঙ্গে।

কি রে রেবা?

রেবা বাবার কাছ থেকেই এমনি আমন্ত্রণটা চাইছিল। এবার খুশি হয়েছে সে। রেবা বলে—তাই ভালো। আবার হোটেলে থাকবে কেন? চলো আমাদের বাড়িতে।

বিভাসেরও ভালো লাগে বাড়িটা। বাগানটাও যত্নে সাজানো নিশীথের অবসর সময় কাটে এই বাগানে। বোম্বাই-এর মত রুক্ষ পাথুরে মাটি এ নয়, সবুজ ঘাস, গাছ-গাছালি, গোলাপ গাছ

হাসনুহানার সবুজ গাছ দিয়ে বাগানটা সাজানো। শীতের মুখ। সবুজ গাঁদা গাছগুলো সোনালী ফুলে ছেয়ে গেছে।

বিভাস বলে—রেবা মেরিগোল্ড ফুল, মৌমাছি সব নিয়ে সুন্দর একটা ছবি হয়। গাঢ় হলুদ রং, গর্গার খুব প্রিয় ছিল। ও নাকি লাইফ ফোর্স।

নিশীথ শুনছে ওদের কথাগুলো।

এখানে এসেই রেবা যেন অন্য জগতের সন্ধান পেয়েছে। তারও করবার কিছু আছে। রেবা সকাল বেলাতেই রান্নাঘরে ঢুকেছে। ভূষণ বলে—তুমি আবার কি করবে?

রেবা বলে—দেখো না কি করছি। ভূষণদা, তুমি বাজারে গিয়ে ভালো দেখে রুই মাছের মাথা আর পেটি আনবে। কিছু ভেটকি মাছও এনো। আর দই ও ভালো সন্দেশ।

ভূষণ বলে—তা আনছি। উনুনের ধারে কি করছো? নদো সব করে দেবে!

সেই ছোট্ট নদু এখন এ বাড়ির কিচেনের চার্জে, আর মানদা বুড়ি হয়ে গেছে। তবু এখানে রয়ে গেছে। এবার রেবাকে পেয়ে তারও খুশির শেষ নেই।

মানদা বলে—ও মুখপোড়া নদো কি জানে? আমি দেখছি—

অবাক হয় নিশীথ, সকালে রেবাই ব্রেকফাস্ট এনেছে নদুকে নিয়ে। ডিমের নরম ওমলেট, আধসেকা টোস্ট, কলা, সন্দেশ।

নিশীথ বলে—এসব তুই কি করছিস? ছবির কথা বলছিল বিভাস।

রেবা বলে—ছবি তো আঁকছিই বাপি। ওসব হবে পরে। দ্যাখো ওমলেট ঠিক হয়েছে কিনা। তুমি আবার নরম ওমলেট পছন্দ করো।

বিভাসকে বলে—কই শুরু করো।

নিশীথ দেখছে ওমলেটটা। তার পছন্দের কথা মেয়েটা জেনে

ফেলেছে। বলে রেবা—কলেজে ক'দিন যাবে না। ছুটি! আর আজ চলো রিজার্ভেসনের জন্য। পুরী হোটেলেও ট্রাঙ্ককল করতে হবে।

নিশীথ বলে—ওসব ব্যবস্থা করে রেখেছি। আমিও যাচ্ছি, কটক ইউনিভার্সিটিতে সেমিনার সেরে পুরীতে তোদের ওখানে উঠবো। ক'দিন ওখানে কাটাবো সব ফেলে!

রেবা খুশিতে কলকলিয়ে ওঠে। ছোট্ট মেয়েটির মত বাবাকে জড়িয়ে ধরে—রিয়েলি! তুমি যাবে বাপি!

নিশীথের বুভুক্ষু পিতৃহৃদয় ওই ডাক আর স্পর্শটুকুর জন্যই এতকাল উদগ্রীব হয়ে ছিল।

বিভাস দেখছে নতুন এক রেবাকে। সংসারের এই ভার নিয়ে যেন তৃপ্তি পায় তার চিরন্তন নারীমন। প্রতিটি মেয়ের অতলে এই স্নেহময়ী সেবাপরায়ণা রূপ রয়ে গেছে। কিন্তু আজকের সভ্যসমাজের দ্রুত জীবনযাত্রা, নিঃসঙ্গতা পরিবেশ তাদের মনের এই সুন্দর রূপটিকে শেষ করে দিয়েছে। ফুটিয়ে তুলেছে বিকৃত একটি সত্তা—যে জানে শুধু পেতেই। কিছু দিতে নয়।

নিশীথ খাবার টেবিলে বসে অবাক হয়।

তার পছন্দমত শুক্তো, মুড়িঘণ্ট, মৌরলামাছ ভাজা, ভেটকির ফ্রাই, কালিয়া। গাঙ্গুরামের দইও আনিয়েছে।

নিশীথ বলে—এসব আর খাবার সাধ্য নেই রে।

মানদা বলে—কিছু খান। রেবা নিজের হাতে করেছে কত কষ্ট করে।

নিশীথ দেখছে বিভাসকেও।

সুন্দর শান্ত একটি তরুণ। আঁকেও সুন্দর আর তার জ্ঞানও দেখেছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আর্ট গ্যালারীতে গেছে, কথা বলেছে বিভাস-রেবা এখানের শিল্পীদের সঙ্গে। কলকাতার বুকে

শিল্পকলা নিয়ে আন্দোলন, কাজ চলেছে। আর বোম্বাই ইউরোপের দরজায় আছে, সেখানে অর্থবানও অনেক। তাই তারা সুযোগ পায় বেশী।

তবু এখানের শিল্পীদের প্রতিভা তাকে মুগ্ধ করেছে।

নিশীথই ওদের নিয়ে চলেছে শান্তিনিকেতনে।

রেবাও খুশী। বলে সে—তুমি নাহলে শান্তিনিকেতনে যাওয়া হতো না বাপি!

কলকাতা ছাড়িয়ে চলেছে গাড়িটা জি. টি. রোড ধরে। আদিগন্ত বিস্তৃত সোনালী ধান ক্ষেত—বাতাসে ওঠে মিষ্টি সুবাস, গাছগুলোর পাতায় এসেছে সোনা-হলুদ রং। আলো ঝলমল করে, মুগ্ধ বিস্মিত চাহনিতে দেখছে রেবার শিল্পীমন। বোম্বাই-এর আশপাশে প্রকৃতির এই রূপ সে দেখেনি, সেখানে চারিদিকে শীতের রুক্ষতা শাসনের ভঙ্গীতে উদ্ধত মাথা তুলে থাকে।

জি. টি. রোড ছাড়িয়ে গাড়িটা অন্য জগতে ঢুকেছে।

লাল মাটি—প্রান্তর—তারপরই শুরু হয়েছে শালবন। শীতের শালবন হলুদে হলুদ। বাতাসে ওঠে মনকরীর মিঠে সুবাস—বনের বুকে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেবা বলে,

—বাপি একটু দাঁড়াও না।

ইজেল বের করে বর্ণাঢ্য রৌদ্রস্নাত ওই শালবনের কিছু স্কেচ করতে থাকে। গাছের গুড়িগুলোয় কালচে রং—নীচের জমিতে আলোছায়ার জালবোনা।

বিচিত্র এক জগৎ। কি ধ্যানমগ্ন এর পরিবেশ। বাতাসে সুর ওঠে, কোথায় বনটিয়ার কলরব ওঠে।

বৈকাল গড়িয়ে ওরা পৌঁছলো শান্তিনিকেতনে ট্যুরিস্ট লজে। রেবার চোখে-মুখে খুশির আভাস। বিভাস মুগ্ধ বিস্মিত চাহনি মেলে দেখছে শান্তিনিকেতনকে। রবীন্দ্রনাথ—অবনীন্দ্রনাথ—গগন ঠাকুর—শিল্পাচার্য নন্দলালবাবু—রামকিঙ্কর বৈজ-এর সাধন পীঠ।

সবুজ পরিবেশে মুক্ত আকাশের নীচে রামকিঙ্করের হাতে গড়া মূর্তিগুলো দাঁড়িয়ে আছে প্রাণের সোচ্চার প্রকাশ নিয়ে।

বিভাস বলে—ভাস্কর্য দেখেছো রেবা!

রেবাও ভাবছে কথাটা।

সন্ধ্যা নামছে শান্তিনিকেতনে।

নিশীথ বের হয় নি। চাঁদনী রাত। ওরা দু'জনে বের হয়েছে আশ্রমের মধ্যে শালবীথি, আম্রকুঞ্জ, উত্তরায়ণের ওদিকে ঘুরছে তারা।

ছেলেদের পড়ার শব্দ ওঠে, কেউ কলরব করছে খাবার ঘরে মাটির কিছু ঘর এখনও রয়ে গেছে। সপ্তপর্ণী—শিমুল—আম—আকাশমণি গাছে আঁধার ঘনিয়ে আসে।

পথে পথে আজ বিজলির আলো জ্বলে। হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে যায়। খেয়াল হয় ওদের, পূর্ণিমা তিথি, শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জ শালবীথি ওই আশ্রমিক পরিবেশ চাঁদের আলোয় কি বিচিত্র রূপে দেখা যায়!

…ক'দিন তারা দু'জনে অন্য জগতে হারিয়ে গেছে, বিভাস আর রেবা।

ওরা পুরীতে এসেছে।

নিশীথও এর মধ্যে কটকের লেকচার সেরে এসেছে ওদের কাছে

রেবা বলে—ক'দিন কোথাও যেতে পাবে না বাপি!

সমুদ্রের ধারে বালিয়াড়িতে বের হয়েছে তারা। নিশীথের কাছে এই মুহূর্তগুলোর দাম অনেক। সন্ধ্যা নামছে। বিভাস ঢেউ-এর মাথায় মাথায় ছিটকে পড়া জলস্রোত পার হয়ে এগিয়ে চলেছে।

রেবা নিশীথের ডাকে চাইল।

নিশীথ বলে—ওখানে খুব অসুবিধা হয়, না রে?

রেবা দেখেছে বাবার চোখে কি বেদনার ছায়া। বলে সে—না।

বাবা। আগে হতো একা একা। এখন ছবি নিয়ে আছি, বিভাস আসে, কাজের মধ্যে দিন কেটে যায়।

কথাটা ভাবছে নিশীথও। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে না কিছু। ওব মনে হয় বিভাস-রেবা দু'জনে দু'জনকে ভালোবাসে। ওই রুক্ষ জগতের মাঝে ভালোবাসার স্বপ্নই রেবাকে সজীব করে রেখেছে। দু'জনে যদি ঘর বাঁধে ওরা সুখী হবে। শিখার জগৎ থেকে সরে এসে নিজেদের জগতে ওরা নতুন করে বাঁচবে।

বিভাসকেও বিশ্বাস করতে পারে নিশীথ।

কিন্তু কথাটা বলতে পারে না। মনে হয় বোম্বাই-এ মাধবীদেবী, প্রশান্ত-উষাদেরই জানাবে। ওরা হয়তো এই শুভ কাজটা সেরে ফেলতে সাহায্য করবে।

শিখার পরিবেশ থেকে সরে যেতে পারবে রেবা। নিশীথ মুখ ফুটে কথাটা রেবাকে জানাতে পারে না।

বিভাস কলরব কবে—কি সুন্দর একটা ঝিনুক পেয়েছি রেবা! দারুণ—

—তাই নাকি! রেবাও ছুটলো সফেন জলরাশি ভিজে বালিচর ছাড়িয়ে ওর দিকে। নিশীথের মনে হয় জীবন-সমুদ্রের তীরে ওরা দু'জনে কি এক মানিক পেয়েছে।

···সব আনন্দ, তৃপ্তির শেষ আছে।

এবার ফিরতে হবে রেবা-বিভাসকে বোম্বাই-এ। কলকাতায় ফিরে এসে রেবার মনটা খারাপ হয়ে যায়। নিশীথও দেখেছে সেটা।

বিভাস বলে—অনেক ছবির মেটিরিয়াল পেয়েছি। রেবা তোমাকেও এবার এগ্‌জিবিশনে ছবি দিতে হবে।

রেবা ভাবছে কথাটা। এখান থেকে যেতে মন চায় না। বোম্বাই মানেই কাজ আর কাজ। তবু যেতে হবে তাকে।

রেবা বলে—যেতে মন চায় না বাপি!

হাসে নিশীথ—বেশ তো, থেকে যা এখানেই।

বিভাসের দিকে চাইল রেবা। বিভাস দেখছে রেবাকে। বিভাস বারান্দা থেকে বাগানে গিয়ে নামলো।

নিশীথ দেখছে রেবাকে।

এখানের রাতও সুন্দর। তারাজ্বলা আকাশ। রাতের অন্ধকারে বাগানের হাস্নুহানার সৌরভ ওঠে।

বাতাসে যেন নীরব বিষণ্ণ কান্নার মত সুবাসটা ছড়িয়ে আছে।

রেবা বিভাসকে বাগানের এদিকে দেখে এগিয়ে আসে।

—এ্যাই!

বিভাস চাইল ওর দিকে।

রেবা শুধায়—চলে এলে যে। কি হ'ল! বিভাসের চোখে দেখছে রেবা কি বেদনাবিধুর চাহনি।

বিভাস বলে—তুমি তো থাকছো এখানে। কাল-পরশু টিকিট পেলে ফিরে যাবো।

ওর কণ্ঠস্বরে বেদনার গাঢ়তা।

রেবা দেখছে বিভাসকে। হঠাৎ কি এক মধুর স্বপ্নে রেবার সারা মনে বিচিত্র সুর ওঠে। এ যেন হঠাৎ কি এক পরম সম্পদকে আনমনে আবিষ্কার করেছে সে।

—বিভাস!

বিভাস চাইল ওর দিকে। ওর সারা মনেও রেবাকে হারাবার নীরব বেদনাটা আজ সব ছাপিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে। রেবার হাতের স্পর্শ বিভাসের সারা মনে কি সুর তোলে।

রেবা বলে—তোমার সঙ্গেই ফিরতে হবে এবার।

—সত্যি! বিভাস ওকে কাছে টেনে নেয়। বলে সে,

—তোমাকে ছেড়ে একলা ফেরার কথা ভাবতে পারি না রেবা। বোম্বাই-এর ওই রুক্ষ পরিবেশে তুমি নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছো। তাই তোমাকে হারাতে সারা মন কি বেদনায় গুমরে ওঠে।

রেবার সারা মন ওর নিবিড় স্পর্শটুকু অনুভব করছে। এই সম্পদের সঞ্চয় তার জানা ছিল না।

আজ তার কাছে এই স্বপ্ন—এই আকুতি, একজনের মনের অতলে তার প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা রেবাকে নতুন অনুভূতিতে ভরে তুলেছে।

বিভাস হঠাৎ রেবার খুব কাছে এসে গেছে। দু'জনে দু'জনকে আজ নতুন স্বপ্নজড়ানো চোখে দেখছে।

তাই রেবার বোম্বাই ফেরাটা অনেক সহজ হয়ে ওঠে। নিশীথও দেখেছে সেটা। বয়সের এই ধর্মকে সেও অস্বীকার করতে পারে না। বরং মনে মনে সুখী হয় সে। রেবা বিভাস দু'জনে দু'জনকে চিনে ঘর বাঁধুক। সুখী হোক।

রেবা বলে—তুমিও চল না বাপি বোম্বাই।

হাসে নিশীথ।

—অনেক কাজ রে। তবু যাবো একবার। তোর ওখানে নিশ্চয়ই যাবো।

রেবা দেখছে তার বাবাকে। শান্ত সুন্দর একটি পণ্ডিত। ক'দিনে দেখেছে এ শহরে বাবার সম্মান, পরিচিতি।

একডাকে সকলে চেনে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল—আর্ট সোসাইটি—শান্তিনিকেতনে দেখেছে বাবার কাছে অনেকেই ভিড় করেন।

এখানেও সময় নেই।

পুরীতে দেখেছে ওখানের অনেক তাবড় ব্যক্তিকেও হোটেলে আসতে।

ব্যক্তিত্বময় শ্রদ্ধেয় একটি মানুষ। রেবার মনে হয় তার বাবার কাছে থাকতেও দেয়নি তাকে মা। তার মা এই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারে নি। এড়িয়ে চলে গেছে।

প্রণাম করতে গিয়ে তাই রেবার চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। নিশীথ ওকে বুকে টেনে নেয়।

—কাঁদে না মা। বোম্বাই তো এখন খুব কাছে—প্লেনে আড়াই ঘণ্টার পথ। যে কোন দিন চলে যাবো তোর কাছে।

—হ্যাঁ। ফিরে গিয়ে দারুণ ছবি আঁকতে হবে কিন্তু। ওখানের এগ্‌জিবিশনে ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়া চাই। তারপর এখানের ফাইন আর্টস হলে তোর আর বিভাসের ছবির একটা এগ্‌জিবিশন করবো। সব দায়িত্ব আমার। তখন তো আবার আসবি।

রেবা খুশি হয়,—তাই হবে বাবা।

বিভাসকে ও বলে—শুনলে তো বাপির কথাগুলো। গেট রেডি।

সেই ছবি আঁকার উৎসাহ নিয়ে আর ফেরার আশা নিয়েই ওরা দু'জনে বোম্বাই-এ চলেছে, রেবা আর বিভাস।

শিখা এতদিন ধরে একটা জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছিল। বাইরের সমাজে তার মেলামেশাটা বেড়েছে, এখন ধাপে ধাপে উঠছে সে।

শিবদাসানি, মিঃ প্যাটেলের উদ্যোগে কলাকেন্দ্র গড়ে উঠছে। টাকার অভাব নেই। আর শিখার চারিদিকে এখন অনেক শিল্পীই এসে জুটেছে কেউ বলে—আপনার সাহায্য ছাড়া ছবির মান এত উন্নত হতো না। মিঃ রাও মডার্ন শিল্পী। কপালে তিলক-বিভূতি মাখা তবু থামেনি ওর। নিরামিষ খায়। বলে,

—ইউ আর গ্রেট মিসেস শিখা। আমার তিনখানা ছবি রেখে গেলাম, প্লিজ লুক অ্যাট ইট! এগ্‌জিবিশনে যেন প্লেস পায়।

শিখা বলে—ছবির কি বুঝি! কমিটি যা ঠিক করবে তাই হবে।

মিঃ রাও গদগদ হয়ে বলে—ইউ আর দি কমিটি!

শিখা দেখেছে এই স্তাবকতার জগৎকে।

মিঃ প্যাটেলও এখন তার হাতের মুঠোয়।

বুড়ো বলে গাড়িতে ফিরতে ফিরতে,

—আই অ্যাম জেলাস শিখা! এত ইয়ং ম্যান তোমার চারিদিকে ঘোরে, মনে হয় আমাকে ভুলেই যাবে।

শিখা ওর গায়ে নিজের দেহটার নিবিড় স্পর্শ দিয়ে বলে—তুমি বহুৎ নটি প্যাটেল।

প্যাটেল ওকে জড়িয়ে ধরে কি স্বপ্ন দেখছে।

ফিরতে রাত্রি হয়ে যায় শিখার। কাজের পর ওই ঘোড়দৌড়ের জীবনও আছে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে ফেরে। রাত্রির এই শূন্যতা তার মনকে ব্যাকুল করে তোলে কি নীরব হাহাকারে।

গাড়িটা এসে তার বাংলোর গেটে ঢুকতে যাবে, সামনে গাড়িটা দেখে দাঁড়ালো। গেটের আলোয় দেখা যায় দাঁড়িয়ে আছে মধু সোমানি।

—তুমি!

শিখা অবাক হয়েছে তাকে দেখে। ক'মাসেই মধু সোমানির আর্ট বিজনেস এখন মার খাচ্ছে। তা ছাড়া মধু সোমানির জ্বালাটা অন্যত্র।

শিখাকে কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে ওই শিবদাসানি, আর এনে তুলে দিয়েছে ওই লোভী শয়তান প্যাটেলের হাতে। মধু সোমানি হেরে গেছে।

মধু বলে—দেখছি তোমাকে! প্যাটেলের সঙ্গে কেমন অভিসার চলছে। তবে বুড়োকে যতো ভালোমানুষ ভাবো তা ও নয়।

—সো হোয়াট! শিখা মধুর এই ব্যবহারে আর কথায় চটে উঠেছে।

হাসছে মধু সোমানি। বলে সে,

—অনেক দিনের বন্ধু তুমি। আজ তুমি আমাকে শত্রু ভাবলেও কথাটা জানিয়ে গেলাম, প্যাটেল কোন ফিল্ম হিরোইনকে ধরেছে, এবার ছবির বাজার ছেড়ে ওই জ্যান্তছবির দিকেই যাবে। সেদিন তুমি কোথায় যাবে সেটা ঠিক করে রেখো। রূপযৌবন থাকতে

থাকতেই সেটার ব্যবস্থা করো। নাহলে ইউ স্যাল হ্যাভ টু গো টু হেল! বাই—

মধু গাড়িতে উঠে গেল।

শিখা নীরব রাগে অপমানে গর্জাচ্ছে—ইতর—জানোয়ার!

সেই গালাগাল শোনার জন্য মধু তখন দাঁড়িয়ে নেই। বেশ কয়েক পেগ গিলেই ফিরছে শিখা। রাগে উত্তেজনায় পা টলছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। এগিয়ে আসে,

—রেবা!

খেয়াল হয় রেবা নেই। সে আর বিভাস দু'জনে বের হয়েছে বাইরে।

একা পড়ে আছে সে এই বাংলোয়। তার কাছে কেউ নেই। বিভাসের কথা মনে পড়ে।

ডাক শুনে অম্বাবাঈ, চাকরটা ছুটে আসে—দিদি!

শিখা কোনরকমে বাংলোর পোর্টিকোতে উঠে সামনের সোফার উপর বসে বলে—ড্রিঙ্কস্ আন্।

অম্বা বলার চেষ্টা করে—খেয়ে নেবে চল!

গর্জে ওঠে শিখা—সাট আপ! যা বল্লাম তাই কর! যা—

শিখার কাছে আজ হঠাৎ মনে হয় আগামী দিনের শূন্যতার কথা। এতদিন সে নিজের ক্ষমতা আর রূপের মোহ নিয়েই বিজয় রথ চালিয়েছে, দু'পাশে দেখেছে স্তাবকদের। অনেক শ্রেষ্ঠী, অনেক গুণমুগ্ধ রূপমুগ্ধ মানুষ এগিয়ে এসেছে। এ যেন কোন উর্বশীর জাতই চিরযৌবনা—অধরা। তার জন্য কোথাও কোন সংসারে কল্যাণী গৃহবধূর মত সন্ধ্যাদীপের জ্যোতির আভাস নেই, কোন গৃহকোণে সে বন্দিনী হতে জানে না, মত্ত পুরুষের চোখে-দেহে-মনে কামনার ঝড় তুলেই সে তৃপ্ত।

কিন্তু তারপর? মাটির মানুষের কাছে সেই সব-হারানোর ভয়টা সত্যি। সেটা আজ কঠিন সত্য হয়ে দেখা যায় শিখার

মনের অতলে। রাত্রি নামে। বালিচর নির্জন। একফালি রূপালী আলো বালুচরে স্বপ্ন জাগায়। সমুদ্রের অশান্ত হাহাকার ভরিয়ে তুলেছে রাতের বাতাস। ঢেউগুলো দূর সমুদ্রে আছড়ে পড়ে খান খান হয়ে। মুঠো মুঠো রূপালী ফুল ছড়ানো সমুদ্রের বুকে।

শিখার বুকের অতলে অমনি অশান্ত হাহাকার।

আজ মধু সোমানি তাকে পরাজয়—সব-হারানোর বেদনার নিষ্ঠুর ইঙ্গিতটাই দিয়ে গেছে।

ঘরের আলোটা জ্বলছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে নিজেকে শিখা। হঠাৎ চমকে ওঠে। আগেকার ভালো লাগা নিজেকে হঠাৎ চিনতে পারে না। চোখের কোলে কালির আভাস, নিটোল হাতের মসৃণ চামড়ায় এসেছে কুঞ্চন রেখা। চুলের মধ্যে দু'-একটা রূপালী তার দেখা যায় খুঁজলে!

কি সর্বনাশের ইঙ্গিতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শিখাকে বাঁচতে হবে নতুন করে। তার প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা থাকতে থাকতে সে গুছিয়ে নেবে নিজের ভবিষ্যৎ।

রাত কত জানে না।

সমুদ্রের বুকে আঁধার ফিকে হয়ে আসছে। দেখা যায় দূরে আলোর বিন্দু, মেছো নৌকাগুলো রাতভোর সমুদ্রে মাছ ধরে তীরে ফিরছে।

কাদের শব্দে ঘুম ভাঙ্গে শিখার! খেয়াল হয় বেলা অনেক হয়ে গেছে। জানলা দিয়ে দিনের আলো এসে পড়েছে ঘরের কার্পেটে, বিছানায়।

রাতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না সে।

অম্বা খবর দেয়—রেবা দিদি, বিভাসজী ওরা ফিরছে।

শিখা বলে—যাচ্ছি, ওদের চা-টা দে।

শিখা যেন অন্য কোন রেবাকে দেখছে, কিছুদিনের মধ্যেই বাহিরের জগতে ঘুরে এসে রেবার দেহে-মনে এসেছে কি পরিবর্তন।

—মা।

রেবা মাকে দেখছে। শুধোয় সে—শরীর খারাপ নাকি ?

শিখা বলে—না। বসো বিভাস! কেমন দেখলে বলো ? এনি নিউ সাবজেক্ট ? ছবি কিছু হবে তো ?

বিভাস খুশিতে উছল হয়ে বলে,

—অনেক কিছু দেখলাম। কলকাতায় গেলাম বহুদিন পর, নিশীথবাবুও ছাড়লেন না। ওঁর বাড়িতেই ছিলাম।

শিখার ফর্সা মুখটা লালচে হয়ে ওঠে। ফুটে ওঠে কি জমাট কাঠিন্য। রেবার দিকে চাইল সে। রেবা কলকাতা থেকে তাকে চিঠি দিয়েছিল, জানায় নি যে ওখানেই উঠেছে।

বিভাস বলে—বিরাট পণ্ডিত ব্যক্তি। আমাদের নিয়ে আর্ট-গ্যালারী, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, শান্তিনিকেতন গেলেন। ওখান থেকে ফিরে পুরী, ভুবনেশ্বর, কোনার্ক গেলাম।

শিখা দেখছে রেবাকে। রেবাও বুঝেছে মাযেব ওই রাগের কারণটা। কিন্তু আজ তার নিজেরও জ্ঞান হয়েছে। ভালো-মন্দ বিচার করতে পারে। সে দেখেছে বাবার কোন দোষ নেই. সোনার হরিণের আশায় মা-ই ছুটে বেড়াচ্ছে।

উঠে যায় রেবা। বলে—স্নান কবে আসি।

শিখাও দেখে সেটা, রেবা তাকে এড়িয়ে গেল।

বাগানে বসে আছে শিখা আর বিভাস। বিভাসের মনে কি খুশীর আভাস, নতুন ছবির স্বপ্ন জাগে। শিখাও দেখেছে বিভাসের এই সত্তাকে। কি পূর্ণতার স্বাদে ও ভরপুর। পুরুষের মনের এই রূপটাকে চেনে সাবধানী শিখা।

আজ সবচেয়ে বেশী রাগ হয় তার রেবার উপরই।

তারই মেয়ে অথচ পদে পদে তাকে অগ্রাহ্য করে চলেছে, অপমান করে চলেছে।

বিভাসকে দেখছে শিখা।

শিখা বলে—এবার আর্ট এগ্‌জিবিশনের কমিটিতে তোমাকে

কো-অপ্ট করেছি বিভাস। কিছু নতুন ছবি চাই। আর জুরী বোর্ড থেকে দু'জন আর্টিস্টকে আমরা 'নমিনেট' করাবো। তাদের প্যারিস-এ পাঠানো হবে দু'বছরের জন্য। প্যারি, লণ্ডন, ভেনিস, অস্ট্রিয়া এসব জায়গাতেও ঘুরবে তারা।

বিভাস কথাগুলো শুনছে। তার কাছে প্যারিস—শিল্পীদের তীর্থ। সেখানে আজও 'সীন' নদীর ধারে শিল্পীদের নিজস্ব জগৎ রয়েছে। বিভাস কি ভাবছে।

শিখা বলে—এবার দিন কতক একদম স্টুডিওতে আটকে থেকে কিছু ভালো কাজ করো, তোমার ছবি প্রাইজ পেলে তোমার নাম নমিনেট করানো সোজা হবে। আর সে সম্মান তুমি পেলে খুশি হবো।

বিভাসের চোখের সামনে নতুন এক জগতের ছবি ফুটে ওঠে। জানে সে শিখা একটু চেষ্টা করলেই বিভাসের শিল্পী জীবনের সেই পরম পুরস্কার এনে দিতে পারবে। তার ছবি কিছু বিদেশে পাঠিয়েছে এরাই। আর বিভাস জানে মিঃ প্যাটেল-শিবদাসানি ফার্মের এই ব্যাপারে সর্বেসর্বা কে।

বিভাস বলে—আজ চলি।

শিখা শোনায়—ছবির কথা ভাবো বিভাস, নতুন ছবি—তোমার ভবিষ্যতের কথা।

বিভাস উঠে গেল। কৃতজ্ঞতায়, বিনয়ে আজ সে নুইয়ে পড়ে। শিখা একাই বসে আছে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে মিঃ রাও, প্রকাশ গিল, নবীন মেহরা, প্রীতম কাউল কতো শিল্পীর মুখ। তাদের স্তাবকতা। দেখেছে আজ বিভাসের মুখে-চোখে ওই ফরেনে যাবার আশায় কি পরিবর্তনের ছায়া। শিখার কাছে তারও নীরব আবেদনটা নজর এড়ায় নি।

শিখা উঠে পড়ে।

স্নান সেরে বের হবে সে। সামনে তার অনেক কাজ।

রাতের অন্ধকারে কাল মধু সোমানির সেই শাসানিটা তত

সত্যি মনে হয় না। তবু সাবধান হবে সে। শিখা জানে সর্বক্ষেত্রে তার নিজের প্রাধান্য আর প্রতিষ্ঠা কি করে বজায় রাখতে হয়।

স্নান সেরে রেবা বের হয়েছে।

শিখা দাঁড়ালো রেবাব গুণ গুণ সুর শুনে। কি খুশির স্বপ্নে রেবা আজ বদলে গেছে। শিখার চোখে সেটা ধরা পড়েছে। তাকে অগ্রাহ্য করে, এড়িয়ে রেবা নিজের স্বপ্ন-জগৎ নিয়ে তৃপ্ত থাকতে চায়।

রেবা মাকে সামনে দেখে থমকে দাঁড়ালো।

ওর সেই সুব থেমে গেছে। শিখাব মনেব অতলের চাপা রাগটা এইবাব ফেটে পড়ে। বিভাসের সামনে সেটা প্রকাশ করতে চায় নি।

দুটি নারী আজ মুখোমুখি হয়েছে।

শিখা শুধোয়—কেন কলকাতায় ওই বাড়িতে গেছিলে? তোমার মাকে যেখান থেকে চলে আসতে হয় সেখানে, সেই লোকের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক থাকুক এ আমি চাই না। তা জেনেও তুমি ওখানেই উঠেছিলে।

রেবা দেখছে তার মাকে।

মায়ের ওই কথাগুলো—ওই ধারণাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মা-ই অবিচার করে এসেছে একজনের উপর। শুধু তাই-ই নয় রেবাকেও বঞ্চিত করেছে ওই স্নেহ-ভালোবাসা থেকে।

শিখা গর্জে ওঠে—জবাব দাও!

রেবা চাইল মায়ের দিকে। মায়ের ওই রুদ্র মূর্তিকে সে আজ ভয় পায় না। জানে তার জন্য রয়ে গেছে একটি পরম নির্ভর। বাবার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে বিভাসের কথা। তার প্রেম ভালোবাসাও আজ রেবার মনে আশ্বাস আনে। এতদিন সে ছিল নিঃসঙ্গ—একা। মায়ের সব অন্যায় শাসন—মায়ের এতবড় ভুলটাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। আজ রেবা স্পষ্ট স্বরে বলে,

-তুমি যদি ভুল বুঝে একজনকে চরম আঘাত দাও, আমি সেটাকে মেনে নিতে পারি না। আজ আমারও ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতা হয়েছে। তাই তোমার ভুলটাকেই শুধরে নিতে চেয়েছি মা। বাপির মত একটা মানুষের উপর তুমি অবিচার করেছো।

চমকে ওঠে শিখা। মেয়ের দিকে চেয়ে থাকে। রেবার কাছে এমনি স্পষ্ট সতেজ উত্তর পাবে তা ভাবে নি কোন দিন। আর কেন সেটা সম্ভব হয়েছে তা-ও অনুমান করতে পারে।

শিখা ফুঁসে ওঠে -আমার বিচার করার ভার তোমার উপর নই। এতটুকু থেকে মানুষ করেছি, সেদিন কে এসেছিল -আজ এত বড় কথা বলো তুমি।

রেবা বলে - একা আমি নই, বিভাসের মুখেও শোন নি কথা গুলো!

শিখা রেবার কাছে বিভাস সম্বন্ধে এমনি কথা শুনে চমকে ওঠে। বুঝেছে সে রেবার ওই যৌবন—বিভাসকে ও যেন নেশা ধরিয়েছে। রেবা আর বিভাস হয়তো অনেক দূরই এগিয়েছে। শিখা শোনায়,

—বিভাস কে? আমাদের মধ্যে তার কোন কথা বলার অধিকার নেই!

রেবা বলে—যা সত্যি তা সবাই বলবে।

শিখা বলে ওঠে—বিভাসের সঙ্গে মেলামেশাটা তাই পছন্দ করি না। আমি তোমায় বলে যাচ্ছি রেবা, এরপর আর ওই বিচার করার চেষ্টা করো না। তোমার নিজের দোষগুলোর দিকেই নজর দিও। অবাধ্য—অযোগ্য তুমি! ওই সব আর্টিস্ট হবার সখ ছেড়ে কোন কাজেই লেগে যাও।

ঘরে বসে থেকে মাথায় ওই সব শয়তানি বুদ্ধি ঢুকছে। আইডিল ব্রেন ইজ দি ওয়ার্কশপ অব দি ডেভিল! সবই বুঝি।

রেবার মুখটা লাল হয়ে ওঠে। মায়ের কথায় সে আজ প্রশ্ন করে,

—কি বুঝেছো তুমি ?

শিখা জবাব দিল না। রেবার ওই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলে,

—ট্রাই টু মেণ্ড ইয়োরসেল্‌ফ।

উপদেশ দেবার ছলে শোনায় শিখা—বোম্বে ইজ এ টাফ প্লে
রেবা, এখানে বাঁচতে গেলে নিজেকেও তৈরী করতে হবে।

শিখা কথাগুলো বলে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। রেবা নীর
রাগে ফুঁসছে। অম্বাবাঈও শুনেছে মা-মেয়ের কথাগুলো। হঠা
ফিরে এসে শিখা আর রেবাকে এইভাবে কথা বলতে দেখে আশ্চ
হয়েছে সে।

অম্বাবাঈ বলে—কাল রাত থেকে দিদি ঘুমোয় নি, ড্রিঙ্ক
করেছে, কি যেন হয়েছে। আজ সকালে আবার কি বলছিল ?

রেবা বলে—ওঁর সব শাসন চুপ করে মেনে নিতে হবে! স
অন্যায়, ভুল করবেন আর মেনে নেবে ?

অম্বাবাঈ দেখছে ওদের অনেক দিন থেকে। তারও খারা
লাগতো শিখার ব্যাপারগুলো। দেখেছে রেবার সেই কান্না—
নিঃসঙ্গতা। আজ রেবা যদি নিজের জগত, নিজের স্বপ্ন নি
বাঁচতে চায় ভালোভাবে, কেন বাধা দেবে দিদি তা বোঝে
না সে।

অম্বা বলে—ট্রেনের ধকল গেছে। চলো খেয়েদেয়ে রেস্ট
নেবে। পরে ওসব কথা হবে।

শিখা বের হয়ে গেল গাড়ি নিয়ে। যাবার সময় মেয়ের সঙ্গে
কথাও বলে না। রেবা চুপ করে দেখল মাত্র।

আজ মনে হয়েছে রেবার কোথায় ঝড়ের কালো মেঘ ঘনিয়ে
আসছে। আর তাকে এড়াতে পারবে না। এমনি অশান্তির মধ্যে
সব কিছু মেনে নিয়ে সে বাঁচতে পারবে না। দরকার হয় বিভাসকে
ধরেই তাকে আশ্রয় দেবার কথা বলবে। মনে হয় বিভাস তাকে
ফেরাতে পারবে না।

স্টুডিওর আলো আঁধারির জগতে নিজে এইসব ব্যক্তিগত চিন্তা-
াবনার কাঠিন্য থেকে হারিয়ে যেতে চায় সে। তার শিল্পসত্তা
দেখেছে এই ক'দিনে অনেক কিছু—নিজের ব্যক্তিগত চাওয়া, মান-
অপমানের উর্ধ্বে সেই জীবন।

রেবা ক্রমশঃ ডুবে যায় সেই সৃষ্টির জগতে।

আর্ট কলেজে পাথরের কাজও কিছু করেছে। সে এখানে কিছু
বেলেপাথর আনিয়ে কাজ করার কথা ভাবছে।

ফোনটা বেজে ওঠে।

চাইল রেবা। মনে হয় বিভাসের ফোনই। মনে মনে খুশিই
য় সে। তার জন্য বিভাসের মনের অতলে দেখেছে নীরব
াকুলতা। কোনার্কের ঝাউবনে—তাদের বাড়ির বাগানের সেই
াত্রির নিবিড় স্পর্শ রেবার মনে এনেছে নতুন সুর।

ফোনটা তুলে হাল্‌কা সুরে সাড়া দেয় রেবা।

একটু অবাক হয়! প্রথমে ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না যে
াম্বের টাইমস্‌ অব ইণ্ডিয়া পত্রিকার আর্ট ক্রিটিক মিঃ শর্মা তার
ঙ্গে কথা বলছেন। মিঃ শর্মার কলমে যে আর্টিস্ট সম্বন্ধে লেখা
বর হয় সে ধন্য হয়ে ওঠে।

মিঃ শর্মা বলে—তোমার জন্য একটা সুখবর আছে রেবাজী।
াম্বে আর্ট ক্রিটিক সার্কেল তাদের এগজিবিশনে তোমার ছবিকে
বস্ট অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে। তাই তোমার সঙ্গে দেখা করে আজই
একটা ইন্টারভিউ নিতে চাই।

রেবা যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারে না। রাতারাতি সে
তবড় নামী শিল্পী হয়ে উঠবে ভাবে নি। নিজেরই কুণ্ঠা বোধ হয়।
ঃ শর্মা জানেন নতুন শিল্পীদের। বলেন তিনি,

—তাহলে তোমার স্টুডিওতে আসছি। ওখানেই কথা হবে।
ণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছাবো।

ফোনটা ছেড়ে দেয় মিঃ শর্মা।

রেবা খবরটা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না আদৌ। অম্বাও

এসে পড়েছে। বলে সে—এখুনি রেডিওর খবরে তোমার নাম
বলছিল বেবা, কি সব প্রাইজ দিচ্ছে তোমায়!

রেবা চাইল ওর দিকে। মনে হয় কথাটা সত্যি।

এতবড় সুখবরটা দেবার জন্য বিভাসকেই ফোন করে। কিন্তু
ফোনটা বেজে চলেছে, কোন সাড়া নেই। বোধহয় বাইরে
গেছে। ওর ফোন ছেড়ে দিয়ে ব্যাপারটা মাকেই জানাতে চায়
কিন্তু মাকেও তাব অপিসে পায় না। রিসেপশন থেকে জানায়—
এগ্‌জিবিশনের ব্যাপারে শিখাজী ব্যস্ত। বের হয়ে গেছে
কোথায়।

রেবার আনন্দের খবরটাও জানাবাব মত কাউকে পায় না।
ফোনটা বাজছে। মাধবী ফোন করছে।

—ফিবেছিস তাহলে? কলকাতার খবব কি?

রেবা বলে—ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে গেলাম ফিরে, আর কলকাতা
বাবার ওখানেই ছিলাম। গিয়ে সব জানাচ্ছি দিদা। মামীমাকে
বলো।

মাধবী বলে—তোব মামীমাই বেডিওতে খবরটা শুনে তু
ফিরেছিস কিনা দেখতে বললে? আয় একদিন।

রেবা বলে—আজ বৈকালেই যাবো দিদা।

ফোনটা ছেড়ে দেয় রেবা। তবু একজন এখানে আছে যে ও
খবর শুনে খুশী হয়। ভেবেছিল খবরটা পেয়ে মা তাকে ফো
করবে, কিন্তু মা-ও ফোন করেনি। রেবার মনে হয় মা তার ব্যাপা
উদাসীনই। প্রীতির-স্নেহের ব্যাকুলতা কোথাও নেই ওর মনে
আছে শুধু ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের কাঠিন্যই।

গাড়িটা এসে গেছে। মিঃ শর্মা ক্যামেরাম্যানকে নি
নামছেন। রেবা এগিয়ে গিয়ে ওদের তার স্টুডিওতে আনে
অম্বাবাঈও বলে—তোমরা যাও। কফি স্ন্যাকস্ নিয়ে যাচ্ছি।

শিখা খবরটা শুনে রীতিমত অবাক হয়েছে। আরও বিস্মি

হয়েছে ভিতরের খবর জেনে। মনে হয় তাকে কৌশল করে ওই আর্ট ক্রিটিক-এর কয়েকজন অপমানই করেছে।

মধু সোমানিও কলা সমালোচকদের একজন বন্ধু। শিবদাসানির এগ্‌জিবিশনের আগেই ওরা নিজেরা তেমনি প্রদর্শনী করেছে তাদের কিছু ছবি দিয়ে। আর তার মধ্যে রেবার হু'খানা ছবিই সবচেয়ে বড় সম্মান পেয়েছে।

শিখা সারাদিন ব্যস্ত ছিল।

বিভাসকে আপিসে গিয়ে ফোন করে আনিয়েছিল। বিভাসকে আজ সে শিবদাসানি, প্যাটেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে নিজের গাড়িতে নিয়ে বের হয়েছে এগ্‌জিবিশনের কাজে।

ফরেন প্রেস থেকে কয়েকজন এসেছে। সেখানে বিভাসকেও পরিচয় করিয়ে দেয়।

বিভাস দেখছে এই বিচিত্র পরিবেশকে। এতদিন সে শিল্পীর জগতে আসে নি। মনেমনে প্রকৃত শিল্পী হবার বাসনা ছিল, কিন্তু তা হতে ও সুযোগ পায়নি। তাই ওই কমার্সিয়াল কাজ বিজ্ঞাপন এসব নিয়েই রয়েছিল।

আজ দেখেছে বিভাস তার নতুন পথে বড় হবার সুযোগ আছে। আর সে সুযোগ করে দিতে পারে শিখাই। দেশ, বিদেশের কাগজে তার নাম বের হবে। বিদেশেও যাবে সে।

শিখা ওখানের কাজ সেরে বলে—চলো বিভাস, লাঞ্চ সেরে নিতে হবে। তারপর যাবো মিটিং-এ। তোমার কেসটা নিয়ে আলোচনা হবে।

বিভাস বলে—লাঞ্চ বাইরে সেরে এসেছি।

হাসে শিখা—কেন আমার সঙ্গে লাঞ্চ করতে আপত্তি আছে নাকি?

—না, না! বিভাস জানায়।

…হোটেলের মাথায় পনেরো তলার উপর রেস্তোরাঁ, নীচে

সফেন সমুদ্র। চারিদিকে পুরু কাঁচ ঘেরা ডোমটা রেস্তোরাঁর খদ্দেরদের নিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে চলেছে। ভিতরে কুশনে গা এলিয়ে দিয়ে সেটা বোঝা যায় না। বোঝা যায় বাইরের দিকে চেয়ে। এইদিকে ছিল অসীম সমুদ্র, কিছুক্ষণ পর দেখা যায় মাহিম ক্রিক। হাইওয়েতে ধাবমান গাড়ির সারির এপাশে পাহাড়ের উপর উঠে গেছে সাজানো শহর, পরক্ষণেই আবার আসছে অবাধ সমুদ্র।

শিখা চিলড্ বিয়ারে চুমুক দিয়ে বলে বিভাসকে—খাও! আরে হুইস্কি নয়—বিয়ার! এপিটাইজারই বলতে পারো। আর আর্টিস্ট মানুষ, এসব খাও না কেমন কথা? পার্টিতে যেতে হবে, সোস্যাল কলও তো আছে।

বিভাস বড় একটা এসব খায় না। টক্ টক্ তেঁতো তেঁতো বিয়ারে চুমুক দিতে থাকে। কিছুক্ষণ পর মন্দ লাগে না। বিভাসেব দিকে চেয়ে দেখছে শিখা। লাঞ্চ এসে গেছে—স্যুপ, কাটলেট, ফ্রায়েড ফিস উইথ ভেজিটেবলস্।

শিখা বলে—ডায়েট কনট্রোল করছি বিভাস, তুমি আইসক্রীম নাও। দরকার হয় আর কিছু!

বিভাস বলে—না, না। এই যথেষ্ট!

শিখা স্যুপ আর ফিস্‌ফ্রাই কিছু খেল মাত্র।

হঠাৎ এখানেই খবরটা শোনে সে। মিঃ পিন্টো ঘোরে যত্রতত্র, বলে ও নাকি এখন রাতের অন্ধকারে জেলেদের ডিঙ্গিতে মালপত্র আনা নেওয়া করে। পেন্টো এখানে শিখাকে দেখে এগিয়ে আসে—কনগ্রাচুলেশনস শিখা। রেবা হ্যাজ ব্যাগড আর্ট ক্রিটিক অ্যাওয়ার্ড।

চমকে ওঠে শিখা—তাই নাকি!

পিন্টো বলে—আজ রেডিওতে শুনলাম। তুমি জানো না এই আর্টএর লাইনে থেকে?

বিভাসও অবাক হয়। আর্ট ক্রিটিক সার্কেলের পুরস্কার পেয়ে

গেল রেবা! শিখা চুপ করে গেছে। এসব ব্যাপারে কোন উৎসাহ তার নেই।

লাঞ্চ সেরে বের হয়ে এসে গাড়িতে ওঠার আগে বিভাস বলে—রেবাকে একবার ফোন করে কনগ্রাচুলেসন্ জানিয়ে আসি।

শিখা চাইল ওর দিকে। থমথমে ওর মুখচোখ।

শিখা বলে—এমন কিছু ব্যাপার নয় বিভাস, তুমি এর চেয়েও বড় পুরস্কারই পাবে একদিন। আর রেবা এখানে পুরস্কার নিতে যাক এ আমি চাই না।

বিভাস অবাক হয়—কেন?

মধু সোমানি আর তার কিছু বন্ধুরা আমাকে অপমান করার জন্যই রেবাকে পুরস্কার দিয়েছে। দেখিয়ে দিল আমাদের সংস্থা রেবাকে স্বীকৃতি না দিলেও ওরা দিতে পারে।

বিভাস চুপ করে থাকে। শিখার এই যুক্তিটা সে মানতে পারে না।

কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। শিখা দেখছে বিভাসকে।

শিখা দেখেছে রেবার খবরটা শুনে বিভাস প্রথমে খুশিতে ঝলমল করে উঠেছিল। রেবার জন্য তার ভালোবাসার গভীরতাটা শিখার নজর এড়ায় নি।

শিখার কথায়। উৎসাহ কিছুটা কমে গেছে বিভাসের।

বিভাস বুঝেছে এদের মা-মেয়ের মনের অতলে বাধা-প্রাচীরটাকে। বিভাসের সামনে শিখার সন্ধান দেওয়া নতুন এক জগৎ। তার শিল্পীমন আজ বৃহত্তর পৃথিবীতে প্রকাশপথ খুঁজছে। শিখার কথামতই চলতে হবে তাকে।

বিভাস বলে—আর্টের ক্ষেত্রে এসব দলবাজি আছে?

শিখা বলে—নেই আবার? অনেক স্বার্থপর মানুষ যুগে যুগে নিজের স্বার্থে আর্টকে বিকৃত করে চলেছে। এরা তাদেরই দলে।

বিভাস ফোনটা করলো না। বলে সে—চলুন!

শিখা মনে মনে খুশি হয় বিভাসের এই ব্যবহারে। তার মনে হয় রেবার প্রভাব থেকে সে বিভাসকে মুক্ত করতে পারবে।

রেবা বের হয়ে গেল বৈকালে মামার ওখানে। প্রশান্ত কোর্ট থেকে ফিরেছে। ঊষাও এগিয়ে আসে রেবাকে দেখে। জড়িয়ে ধরে বলে—রেবা এখন নামী লোক গো। কাগজে কাগজে দেখবে ওর ছবি, নাম!

মাধবীও এসেছে। বলে সে—ওসব নাম আর ছবি নিয়ে কি হবে রেবা! তার চেয়ে বলি প্রশান্ত ওই বিভাসের পিসির সঙ্গে কথাবার্তা বল, বিয়ে-থা চুকে যাক।

রেবা ধমকে ওঠে--থামবে দিদা! উঃ, তোমরা মা-মেয়েতে মিলে আমার লাইফ হেল করে দিলে। এমন করলে আসবো না।

হাসছে মাধবী। বলে সে—তোর মা তোকে জব্দ করতে পারে নি। এবার আমিই ব্যবস্থা করছি

কলকাতার দিনগুলো ভোলেনি রেবা। বলে সে,

--বাপিকে একটা ফোন করছি দিদা। আজ কাগজের লোকেরা ইন্টারভিউ নিতে এসেছিল, ছবিও নিয়ে গেল। ওদের কি বললাম জানো—আমার জীবনে বাবা আর দিদা এদের প্রভাবই বেশী।

মাধবী অবাক হয়—সে-কি রে!

রেবা দু'হাত দিয়ে দিদাকে জড়িয়ে ধরে গেয়ে ওঠে—

'মোর জীবনপাত্র উছলিয়া
মাধুরী করেছো দান -
তুমি জানো নাই।'

মাধবীর চোখে জল নামে। হতভাগা মেয়েটা জীবনে কোন স্নেহ-সম্পদ পায়নি। লুকিয়ে এসে এখানে নিজেকে মেলে ধরেছে। মেলে ধরেছে ওর সুপ্ত মনের শতদলকে, যে মন চায় কিছু পেতে, আরও বেশী কিছু দিতে।

নিশীথের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। খুশি ভরে জানায় নিশীথ,

—আরও বড় হবি মা। আমি আশীর্বাদ করছি।

রেবার শূন্য জীবন কি তৃপ্তিতে ভরে ওঠে।

বিভাস সবে স্টুডিওতে ফিরেছে, সারাটা দিন ঝড়ের বেগে কেটেছে ওই নতুন জগতে। তবু মনে পড়ে রেবার কথা। তাকেও বড় হতে হবে, পুরস্কার পেতে হবে। তার সামনে কোন নতুন জগতের পথ দেখেছে সে।

হঠাৎ রেবাকে আসতে দেখে চাইল।

—রেবা!

রেবা ঘরে ঢুকে বেশ রাগতস্বরে বলে—কোথায় ছিলে সারাটা দিন? ফিরে এসে কাজে ডুবে যাবে, তা নয় আড্ডা দিতে বের হয়েছো? বার-দুয়েক ফোন করেও পাইনি তোমায়।

কি ভেবে বিভাস আজকের দিনের কথাটা চেপে গেল। বলে সে—একটু কলেজে গেছিলাম, সেখান থেকে আপিসে জরুরী কাজে আটকে গেলাম। তোমার খবরও শুনেছি। খুব খুশী হয়েছি।

রেবা বলে- শুনে খুশী হলাম এবার বাপু তোমাকেও পুরস্কার জেতার মত ছবি করতে হবে।

বিভাস বলে—সেদিকে তোমার সঙ্গে পারবো?

হাসে রেবা। ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে,

—তোমার পুরস্কার পাওয়ার পর এটা পেলে খুশি হতাম। তবু তুমি এখানের পুরস্কার একাদেমী অ্যাওযার্ড পাবেই!

সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

রেবা বলে—আজ চলি।

ফোনটা বাজছে, রেবা ফোনটার দিকে চাইল। অনেক সময় রেবাও বিভাসের ফোন ধরে, রেবা ফোনটা তুলে সাড়া দেয়—হ্যাল্লো!

কিন্তু ওদিকে যিনি ফোন করছিলেন তাঁর তরফ থেকে হঠাৎ সব

সাড়া স্তব্ধ হয়ে গেছে। রেবা বার কতক ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া পায় না। ফোনটা নামিয়ে রাখে। বিভাস বলে,

—ওই রকমই হয়েছে ফোনগুলো। চলো পৌঁছে দিয়ে আসি।

রেবা কৃত্রিম শাসনের সুরে বলে—আজ্ঞে না। ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাবো। কিছু কাজ করার চেষ্টা করো। মামার ওখানে খেয়ে যেতে হবে। আজ দিদা কি বলছিল জানো?

বিভাস দেখছে রেবাকে। রেবা বলে,

—তোমার পিসিমার সঙ্গে দিদা নাকি কথা বলবে!

অবাক হয় বিভাস—ওদের তো পরিচয় আছে। মন্দিরেও যান, কথাবার্তা তো হয়ই। আবার নতুন করে কি কথা বলবেন?

সলজ্জ হাসিতে রেবার ফর্সা মুখখানা টসটসে হয়ে ওঠে। বলে সে—জানিনা কি কথা! চলি—

রেবা একঝলক আলোর মাতন তুলে বের হয়ে গেল প্রজাপতি মন নিয়ে।

জীবনে সার্থকতার স্বপ্নগুলো আজ রেবার সামনে। নিজের মনের অতলে সে স্বপ্নজাল বোনে। বাংলোয় ঢুকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। শিখার ডাকে চাইল ওর দিকে।

শিখা বাড়ি ফিরে রেবাকে না দেখে ফোন করেছিল মায়ের ওখানে। ওখানেও পায়নি। তারপরই ফোন করেছিল বিভাসকে। চমকে ওঠে শিখা, রেবা গেছে ওখানেই। বিভাসের ফোনটা সেই-ই ধরেছিল।

শিখা চটে উঠেছে রেবার এই নির্লজ্জ ব্যবহারে। বিভাসের ওখানে প্রায়ই যাতায়াত করে রেবা।

শিখা বাড়ি ফিরে অম্বাবাঈ-এর মুখে শুনেছে প্রেস থেকে লোকজন এসেছে, শিখার কি সব কথা তারা টেপ করে নিয়ে গেছে, ছবিও তুলেছে। আরও বিরক্ত হয়েছে শিখা, রেবা তাকে না

জানিয়ে ওদের কাছে মুখ খুলেছে বলে। কে জানে প্রতিপক্ষ কোন খবরই পাবে কিনা!

শিখা রেবাকে ফিরতে দেখে চাইল।

—কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

দেখছে শিখা রেবাকে। রেবা মাকে চেনে। তবু জানায় সে,

—দিদার ওখানে গেছিলাম। মামণি, প্রেস থেকে এসেছিল ওরা। আমাকে অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছে ছবির জন্য।

শিখা বলে—ওই অ্যাওয়ার্ড তুমি নেবে না।

—মা! রেবা বিস্মিত চাহনি মেলে দেখছে মাকে। বলে সে—প্রেস থেকে এসেছিল ওরা।

শিখা ধমকে ওঠে—আর আমাকে না জানিয়ে ওদের স্টেটমেণ্ট দিলে?

রেবা বলে—যা সত্যি তাই বলেছি মা। আর পুরস্কার পেলাম তাতে তুমি খুশী হওনি?

শিখা দেখছে রেবাকে। বলে শিখা—খুশি হবার মত কিছু এ নয়। আর সামান্য খুশিতে ভুলে বড় কোন কাজের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে এও চাই না।

রেবা বলে ওঠে—তোমাদের আর্টের জগতে এসব দলাদলির মধ্যে যেতে চাই না মা। আর্ট নিয়ে ব্যবসাদারি করতে তোমাদের বাধে না। আমি শিল্পী। সেই স্বীকৃতি নিয়েই বাঁচতে চাই। এ পুরস্কার সেই শিল্পের পুরস্কার, একে অসম্মান করতে পারবো না।

শিখা গর্জে ওঠে—রেবা!

রেবা দাঁড়ালো না। চলে গেল নিজের ঘরে। শিখা অসহায় রাগে কাঁপছে।

সকালের সব কাগজেই রেবার ছবি দিয়ে ওর ইণ্টারভিউ—তার ছবির কথাও আলোচনা করা হয়েছে। বেলাতে উঠেছে শিখা, চায়ের টেবিলে কাগজগুলো এসে পড়েছে।

শিখা দেখছে রেবার ছবি, তার স্টেটমেণ্টটাও।

বিভাস ইদানীং সকালে এসে চায়ের টেবিলে বসে। রেবা সকালে উঠে স্টুডিওতে চলে যায়। বিভাসও মাঝে মাঝে যায় স্টুডিওতে।

রেবা নতুন ধরণের কাজের কথা ভাবছে। কোনার্কের ভাস্কর্যের ধারা, ইলোরার শিল্পশৈলী সব মিলিয়ে কি নতুন পথ খুজছে সে। ওই স্বীকৃতি তাকে নতুন করে কাজের মধ্যে ডুবে যেতে সাহায্য করেছে।

কারো সাহায্য ছাড়াই নিজের যোগ্যতা দিয়ে সে এই পুরস্কার পেয়েছে জুরীদের বিচারে, আরও বৃহত্তর জগতে সেই স্বীকৃতি আদায় করে নিতে হবে তাকে। জানে রেবা মায়ের পরাজয় ঘটেছে তার কাছে ওইখানেই।

মায়ের ব্যক্তিত্বকে রেবা স্বীকার করে না অন্ধের মত। দোষগুলোরও সমালোচনা করে, মায়ের কাছে মাথা নীচু করে নয়, নিজের যোগ্যতায় সে উঠছে। মা সেইটাকেই তার অবহেলা বলে ভুল করছে।

আরও রেগে গেছে মা, ওই পুরস্কার স্বীকার করে নেবার কথায়।

হঠাৎ বাইরের বাগান থেকে স্টুডিওতে এসে ঢুকছে শিখা, হাতের খবরের কাগজগুলো রেবার সামনে ছিটিয়ে ফেলে বলে— এসব কি বলেছো? তোমার জীবনে শিল্পসৃষ্টির মূলে ওই ট্রাস লোকটা আর দিদা। আমার এখানে থাকছো, এত সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছো তার কোন স্বীকৃতি নেই? অকৃতজ্ঞ —বেইমান—

রেবা দেখছে মাকে। আজ নিজের চোখ দিয়ে বিবেক দিয়ে রেবা বিচার করতে পারে। তার বাবার সম্বন্ধে ওই মন্তব্যগুলো বিশ্রী লাগে রেবার। বলে সে—তোমার কথা স্বীকার না করলেও অস্বীকার করা যাবে না মা। তুমি খেতে পরতে দিয়েছো, আশ্রয় দিয়েছো সত্যি। কিন্তু না দিলেই ভালো করতে! হয়তো কলকাতায় না হয় দিদার সংসারে সামান্য নিয়েই তৃপ্ত থাকতাম।

শিখা গর্জে ওঠে—এ কথা বলতে সাহস হয়?

বিভাস বোঝাবার চেষ্টা করে শিখাকে।

—উত্তেজিত হবেন না। এসব কথা এখন থাক। চলুন—

শিখা বলে—তুমিই দ্যাখো বিভাস! এই আমার মেয়ে! এই তার কাছে আমি প্রতিদান পাচ্ছি। আজ মনে হয় ভুলই করেছি—মস্ত ভুল!

শিখা বিভাসের সঙ্গে বাইরে এসে বসলো। নীরব রাগে তখনও জ্বলছে ওর সারা মন। বাইরে অশান্ত সমুদ্র ভাঙ্গছে বালিয়াড়িতে কি নিষ্ফল আক্রোশে। শিখার কাছে আজ এই পৃথিবীর রূপটা যেন বদলে গেছে। মনে হয় আজ সে হেরে যাচ্ছে ওই মেয়ের কাছে। এই পরাজয়ের দুর্বলতা তার মন, তার সত্তাকে কি গ্লানি আর অসহায় অক্ষমতায় ভরে তুলবে।

হার মানবে না শিখা। সব কিছুকে ঝেড়ে ফেলে সে নিজের জগতেই এগোবে। সেখানে মায়া দয়া স্নেহ, এসবের কোনও দাম নেই।

বেলা হয়ে গেছে। আপিস বের হতে হবে। শিখা বলে—আপিসে লাঞ্চের আগেই আসবে বিভাস!

বিভাস বলে—কাজ-কম্মো করতে হবে। নতুন ছবি নিয়ে ভাবছি।

শিখা চাইল ওর দিকে স্থির চাহনিতে। বিভাস বুঝেছে ওর নিঃসঙ্গতা, মনের বেদনাতুর অবস্থা। বিভাসের দরকার ওকে। বলে সে—ঠিক আছে এসে যাবো!

শিখার গম্ভীর মুখে হাল্‌কা হাসির আভা ফুটে ওঠে। বলে সে—তাই এসো বিভাস। জরুরী কাজ আছে কতকগুলো। সে ব্যাপারে তোমার সাহায্যেরও দরকার। অবশ্য তোমারও ভবিষ্যৎ জড়িত রয়েছে তার সঙ্গে।

ক্লান্ত উদাস স্বরে বলে শিখা একজনের জন্য অনেক কিছু করতে পারতাম বিভাস। রেবা তা চাইল না। আশা করি এ ভুল তুমি করবে না।

বিভাস কৃতজ্ঞতা ভরা চাহনিতে দেখছে শিখাকে। আজ বিভাস দেখেছে এর সাহায্য নিয়েই তাকে উঠতে হবে। রেবা তা চায় নি। রেবার মত অ্যাওয়ার্ড, স্বীকৃতি তাকে পেতে হবে। তাই শিখাকেই দরকার।

রেবাও কথাটা ভেবেছে আজ। মায়ের ওই মূর্তিটাকে সে আর সহ্য করতে পারছে না। নিজের পথ সে নিজেই দেখবে। জানে কলকাতায় গেলে কোন ভাবনাই থাকবে না তার, কিন্তু বোম্বাই-এর আর্টের ক্ষেত্রেই সে এখানে থেকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। মাকে দেখিয়ে দিতে হবে তার কোন সাহায্য রেবার দরকার নেই।

বিভাস সারাটা দিন কাটিয়েছে শিখার গাড়িতেই।

নানা কাজে ঘুরেছে তারা। দুপুরে লাঞ্চ করেছে হোটেল ওবেরয়-এ। বিদেশী কয়েকজন পার্টি এসেছে, অনেক ছবি নিয়ে যাচ্ছে তারা। বিভাসের পুরনো ছবিও কয়েকটা ভালো দামে আজ ওরা নিয়েছে।

শিখাও খুশি হয়েছে।

...বিভাস দেখছে ভিনদেশী ওই মানুষগুলোকে। লা'মেয়রও এসেছে পার্টিতে।

ওবেয়র সেরাটন-এর রান্নার গুণও আছে। আর ওই পরিবেশ বিভাসকে কোন স্বপ্ন জগতে নিয়ে যায়। লা'মেয়ার মাছের জল গেলার মত হুইস্কি গিলে আমন্ত্রণ জানায়—মসিয়ে আর্তিস্ট, কাম তু মাই কান্ত্রি, হেভেন লা আর্ত!

তখনও বিভাসের কানে বাজছে সেই কথাগুলো।

ফ্রান্স, প্যারিস শিল্পীদের স্বর্গই। কি এক নেশার মত আবেশ আনে সেই আহ্বান।

শিখা আর বিভাস ফিরছে হোটেল থেকে। একদিকে মুক্ত সমুদ্রের বুকে জোয়ার এসেছে। শিখা দেখছে বিভাসকে। গাড়ির

ঝাঁকুনিতে শিখা অনেক কাছে এসে গেছে তার। ওর ডাগর চোখে নিটোল দেহে স্থির যৌবনের মাদকতা। শিখা শুধোয়—এত কি ভাবছো বিভাস?

বিভাস চাইল ওর দিকে। শিখা জানে ওর মনের অতলের সেই ভাবনাটাকে। বলে শিখা—একটা ব্যবস্থা হবেই। ফ্রান্সে যাবে একদিন।

—সত্যি! বিভাস চাইল ওর দিকে।

হাসছে শিখা। এখনও যৌবনকে সে ধরে রেখেছে। চোখে গালে সারা দেহে সেই যৌবনের মাদকতা। শিখা দেখছে একটি তরুণের মনে আজও ঝড় তুলতে পারে সে।

মধু সোমানির সেই রাতের কথাটা মনে পড়ে।

দেখেছে সে প্যাটেলের চোখে কোথায় অন্য নেশার আভা। ইদানীং আঁধেরীর কোন স্টুডিওতে সে যাতায়াত করছে, মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পরও সেখানে ব্যস্ত থাকে।

শিবদাসানি অবশ্য ব্যবসা জোর চালাচ্ছে। আর শিখাও শিখে গেছে ব্যবসার ফাঁকটা, ওই ছবি পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে সেও বিদেশে তার নামে বেশ কিছু টাকা কমিশন বাবদ জমাচ্ছে সে। মিঃ প্যাটেলের হিসাব থেকেও সে কিছুটা আদায় করে নেয়।

বিভাসকে নামিয়ে দিয়ে শিখা চলেছে প্যাটেলের বাংলোয়, জরুরী কাজ আছে। শিখা চেনে লোভী সেই জীবটাকে, আজও তার চোখে সেই নেশাটাকে জাগিয়ে রাখতে হবে তাকে, প্যাটেলকে তার আর কিছুদিন দরকার। তারপর!

হাসে শিখা মনে মনে।

নতুন কি স্বপ্ন—দেখছে সে।

শিখা বলে বিভাসকে—স্টুডিওতেই থাকবে। ফেরার পথে একটা জরুরী ম্যাসেজ দিয়ে যাবো।

বিভাস বলে—আবার কষ্ট করে আসবেন কেন? ফোনেই—

হাসে শিখা। বিভাসের মুখের কাছে মুখ এনে কালো চোখের তারায় সাড়া জাগিয়ে চঞ্চলা কিশোরীর মত হাল্‌কা সুরে বলে—সব কথা ফোনে বলা যায় না বিভাস! তোমার ওখানে এলে আপত্তি আছে?

বিভাসের মনে তখন বিদেশের সার্থকতার আহ্বান। বিভাস বলে—না, না।

ওকে লিংকিং রোডে নামিয়ে দিয়ে শিখার গাড়িটা সোজা জুহুর দিকে বের হয়ে গেল।

সন্ধ্যা নামছে। এদিকে গাছগাছালি অনেক। পাখিরা বড় বড় রেনট্রি দেওদার গাছে কলরব করছে। মিষ্টি সুবাস জাগে ফুলের। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে স্টুডিওতে ঢুকলো বিভাস। সারাদিন কেটেছে ঝড়ের মত। এবার স্নান সেরে কফি খেয়ে বিভাস কাজের কথা ভাবছে।

নতুন ছবির ভাবনা মাথায় আসে না। তাকে এগিয়ে যেতে হবে, বিদেশে যাবে—এই পাবার স্বপ্নটা এখানে কিছু করার সাধ্যকে ছাপিয়ে উঠেছে। ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু ভাবছে। ফর্ম-রূপ-পটভূমি সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। একজনের কথা, তার হাসি, চাহনি মনে পড়ে।

ইজেলের উপর ড্রইং-এর রেখা কয়েকটা টানছে, নিটোল ছন্দে রেখাগুলো কি মদিরতা নিয়ে ফুটে ওঠে। হঠাৎ কাকে ঢুকতে দেখে চাইল।

বোধ হয় জুহু থেকে শিখা দেবীই ফিরছে, চাইল বিভাস—তুমি!

অবাক হয়েছে বিভাস। ঢুকছে শিখা নয়, রেবাই।

সারা দেহেমনে ওর ঝড়ের চিহ্ন। মুখটা শুকনো, কি উত্তেজনা ফুটে রয়েছে ওর চাহনিতে।

রেবা আজ সারাদিন ধরে ভেবেছে কথাটা। মায়ের সেই

কথাগুলো ভুলতে পারেনি সে। আজ একটা সিদ্ধান্ত সে নেবেই। কলকাতায় ফিরে যেতে পারে সে, সেখানে কোন অসুবিধাই তার হবে না। কিন্তু এখানেই থাকতে হবে তাকে। দেখিয়ে দেবে মাকে—তার কোন সাহায্য না নিয়েই নিজের প্রতিভার জোরেই সব পাবে রেবা।

বারবার ভেবেছে কথাটা। তাই অনেক আশা নিয়ে ছুটে এসেছে বিভাসের কাছে।

রেবা বলে—তোমার কাছেই এলাম বিভাস। আজ এতবড় পৃথিবীতে তোমার কাছেই আশ্রয় চাইতে এলাম।

অবাক হয় বিভাস! রেবার দুচোখে বাঁধনহারা অশ্রু ঝরে পড়ে। সারাদিন ভেবেছে সে। আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না।

বলে রেবা—কাল রাতের ওই ঘটনার পর ওখানে থাকতে পারবোনা আমি। তাই এসেছি তোমার কাছে।

রেবাকে দেখছে বিভাস।

আজ সে তার কাছে চায় আশ্রয়, আশ্বাস। হু হু কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে রেবা। বিভাসের মনে ছিল বিদেশের স্বপ্ন, হঠাৎ রেবার এই দায়িত্ব, তার ঘর বাঁধাব আহ্বান বিভাসকে নতুন করে ভাবিত করে তুলেছে।

বিভাসের মনে পড়ে কোনারকের ঝাউবনের কথা, সেই নিবিড় মুহূর্তগুলো তাকে নতুন করে বাঁচার আশ্বাস দিয়েছে, কাজ করার প্রেরণা দিয়েছে। শান্তিতে তারা বাঁচবে দুজনে দুজনকে কেন্দ্র করে! ওই আলেয়ার পিছনে ছুটতে চায়না বিভাস।

রেবা দেখছে বিভাসকে। বলে সে—বিভাস! তোমার উপর জোর করতে চাইনা। তুমিও বলেছিলে তাই এসেছিলাম। দুজনের স্বপ্ন দিয়ে একটি ঘর বাঁধতে চেয়েছিলাম। যদি আজ পিছিয়ে যাও—বাঁধা দেব না।

বিভাস চমকে ওঠে—কি বলছো রেবা?

রেবা বলে—তাহলে কলকাতায় চলে যাবো বাবার ওখানে।

এভাবে এখানে পড়ে থাকতে চাইনা বিভাস। এ জীবন আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

বিভাস এগিয়ে আসে—আজ তার মনের অতলের সেই সত্তাও সামান্য নিয়ে সুখী হতে চায়। কাছে টেনে নেয় সে রেবাকে। ওই নিবিড় নির্ভরময় স্পর্শে কাঁপছে রেবা।

শিখা আজ প্যাটেলের ওখানে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো।

কলকণ্ঠে হাসির শব্দ ওঠে। মিঃ প্যাটেল কোন নতুন এক হবু অভিনেত্রীকে কাছে বসিয়ে হাত দিয়ে মেয়েটির দেহ যেন লেহন করছে।

মেয়েটিও ওর রোমশ বুকে মাথা এলিয়ে আদর খাওয়া মিনি বেড়ালের মত আওয়াজ করছে। চোখে ওর মদের নেশা।

শিখার এখানে অবারিত দ্বার।

তাই সোজা প্যাটেলের স্টাডিতেই ঢুকে পড়ে ওই কাণ্ড দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে। ওকে দেখে মেয়েটি অস্ফুট আর্তনাদ করে লজ্জাবতী লতার মত চাদরটা দিয়ে ঢেকে দেয় ওর সর্বাঙ্গ। প্যাটেলও এসময় শিখাকে দেখে চটে উঠেছে।

বলে সে—এখন কে আসতে বলেছে তোমায় শিখাজী ?

শিখা দেখছে ওই লোকটাকে। বলে সে—তুমি কি নতুন মেয়েছেলে পেয়ে সবই ভুলে গেছো মিঃ প্যাটেল। তুমিই ফোন করেছিলে।

প্যাটেল বলে—হোগা! ব্যস—আভি যাও। কাল আপিসে ফোন করে নেবে। আভি হম্ বিজি হ্যায়।

অপমানে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বের হয়ে এল শিখা। মধু সোমানীর সেই কথাগুলো মনে পড়ে। ঠিকই বলেছিল সে। আজ শিখার সামনে ছুটো পথ খোলা, মাথা নীচু করে মধুর ওখানেই ফিরে যেতে হবে, না হয়—

কি স্বপ্ন দেখছে শিখা!

রাতের অন্ধকারে আলো ঝলমল বিশাল প্লেনটা সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্ট থেকে চলেছে দূর বিদেশের দিকে অজানা ঘুম নামা রাতের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে। শিখা ওই ধাবমান প্লেনটার দিকে চেয়ে থাকে, লাল নীল আলোর নিশানা তখনও দূর সমুদ্রের আকাশে দেখা যায়।

শিখা কি ভাবছে। অন্য মন নিয়েই আজ এগিয়ে চলেছে সে। বিভাস রেবা তুজনে নিজেদের স্বপ্নের গভীরে হারিয়ে গেছে।

হঠাৎ দরজাটা খুলে ঝড়ের বেগে কাকে ঢুকতে দেখে ওরা সরে যায়। রেবাও চমকে উঠেছে। হাঁপাচ্ছে শিখা। আলো আঁধারির বৃত্তে শুধু সে দেখেছে বিভাসকে।

শিখা হাঁপাচ্ছে। আজ তার সামনে একটা পথই খোলা। শিখা এগিয়ে আসে—বিভাস!

বিভাস অবাক হয়! রেবা অন্ধকার বৃত্ত থেকে আলোয় এসেছে। তার কঠিন ঘৃণাভরা কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়—মা!

শিখা, চাইল ওর দিকে।

সারা ঘরে যেন বাজের গর্জন নামে, আলোটা উজ্জ্বলতর হয়ে অতল অন্ধকারে হারিয়ে যায়। হারিয়ে যায় ওদের মানবিক সত্তা, অন্ধকারে আদিম চেতনাই জেগে ওঠে।

জেগে ওঠে কাতর আর্তনাদ! রাতের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে সেই অন্তিম আর্তনাদটা উঠছে। আতঙ্কে শিউরে ওঠে রেবা!

কি একটা চরম সর্বনাশই ডেকে এনেছে সে!

সে চিৎকার করার চেষ্টা করে, আতঙ্কে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেছে. পায়ের তলে মাটি কাঁপছে থরথর করে, কাদের চিৎকার ভেসে ওঠে। রেবা গহন অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে।

পরদিন সব কাগজেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। বোম্বাই-এর কাগজের রিপোর্টাররাও ছুটে আসে। সেদিন ওই নিষ্পাপ

পবিত্র একটি শিল্পীর কৃতিত্বের খবর, অভিনন্দন আর ছবি ছাপা হয়েছিল। আজ সেখানে ছবিটা ছেপে যেন ওর মুখে দুরপনেয় কলঙ্কের কালিই লেপে দিয়েছে সবাই। নিষ্ঠুর মর্মান্তিক সেই সংবাদ খবরের কাগজের প্রথম পাতাতেই বের হয়েছে।

তরুণ শিল্পী বিভাস রায়কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যার দায়ে উদীয়মান শিল্পী শ্রীমতী রেবাকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে। ধারালো অস্ত্রেব সাহায্যে রেবা বিভাস রায়কে মারাত্মক ভাবে আঘাত করে। সেই আঘাতের ফলেই শ্রীরায়ের মৃত্যু ঘটেছে তার স্টুডিওর মধ্যেই কর্মরত অবস্থায়।

চমকে ওঠে মাধবী!

—কি হবে প্রশান্ত! একি সর্বনাশ হয়ে গেল রে? রেবা একাজ করতেই পারে না। তুই ছাখ বাবা।

উষাও অবাক হয়েছে। এমনি একটা নাটকীয় কাণ্ড ঘটে যাবে তা ভাবতে পারে নি কেউ এরা। উষাও জানে বিভাসকে ভালোবাসতো রেবা, দু'জনেই ওরা দু'জনকে ভালোবাসে। কিন্তু সেই ভালোবাসার এমনি নির্মম মর্মান্তিক পরিণতি ঘটবে তা ভাবতে পারে নি।

মাধবীর দু'চোখে জল নামে। জীবনের শেষ দিকে এমনি করে তার সব আশা স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যাবে ভাবতেই পারে নি। বলে সে —শিখাও সেখানে ছিল। কি বলে সে! আমার মেয়ের জন্যেই এমনি সর্বনাশ হবে তা জানতাম। তাই বলেছি ওরে রেবাকে সরিয়ে আন, বিয়ে থা দে—

প্রশান্ত ভাবনায় পড়েছে। আইনজ্ঞ লোক সে। নামকরা অ্যাডভোকেট। বলে সে—সবকিছু না জেনেশুনে কিছু মন্তব্য করো না মা। পুলিসের লোক এলে আমার সামনে ছাড়া কিছুই বলবে না। একজনের বিপদ হয়েছে, আজেবাজে কথা বললে

বিপদ বাড়বে বই কমবে না। এখন শান্ত হয়ে ধৈর্য ধরে থাকো। দেখি কি করা যায়।

মাধবী দেবীর চোখের জল বাধা মানে না। তার সব স্নেহ ঘিরেছিল ওই রেবাকেই। সেই পবিত্র নিষ্পাপ হাসিখুশী মেয়েটার জীবনে এমনি সর্বনাশ আসবে তা ভাবে নি। মাধবী বলে—জেলহাজতে পচবে মেয়েটা?

প্রশান্ত বের হবার আয়োজন করছে। বলে সে—চেষ্টা করছি কি করা যায়। ঊষা, তুমি বরং কলকাতায় একবার ফোন করে দাও নিশীথদাকে। এ সময় ও এলে রেবা কিছুটা ভরসা পাবে।

বের হয়ে গেল প্রশান্ত।

মাধবী দিশেহারা হয়ে গেছে এই বিপদে। বলে সে—তাই করো বাছা। সেও আসুক। মেয়ের সুখের দিনে আসবার ভাগ্য তো তার নেই, এই চরম বিপদের দিনেই আসুক। যদি বাঁচাতে পারে!

নিশীথ কলেজে বের হচ্ছে। ভূষণও ব্যস্ত। নিশীথ হঠাৎ ফোনটা ধরে. বোম্বাই থেকে ঊষা ফোন করছে। সকালের সোনালি আলো ঝলমল করে বাগানের ঘাসে, ফুলের বেড়ে। রঙ্গীন, শান্ত সুন্দর সকাল।

হঠাৎ ওই ফোনটা পেয়ে চমকে ওঠে নিশীথ—কি বলছো?

ঊষা ধরা গলায় খবরটা দিতে অস্ফুটস্বরে বলে ওঠে নিশীথ—ইম্‌পসিবল! এ হতে পারে না! না—আমি বিশ্বাস করি না।

ঊষা জানায় তবু খবরটা। বলে সে—আপনি এলে ভালো হয় এ সময়!

—ঠিক আছে!

নিশীথ ফোনটা নামিয়ে পাথরের মূর্তির মত কঠিন নির্বাক হয়ে যায়। ভূষণ দেখেছে ব্যাপারটা। এগিয়ে আসে।

—কে ফোন করছিল দাদাবাবু?

নিশীথের চোখের সমেনে রেবার হাসিভরা সুন্দর মুখ, নিষ্পাপ চাহনিটা ভেসে ওঠে। তারই মেয়ে সে। পৃথিবীতে একমাত্র সেই তার আত্মজ, প্রিয়জন।

ভূষণ উত্তর না পেয়ে শুধোয়—কোন খারাপ খবর নাকি?

চেতনা ফেরে নিশীথের। চাইল সে ভূষণের দিকে।

নিশীথ এর মধ্যে কর্তব্যস্থির করেছে। যাবে সে—যেতেই হবে তাকে। মনে হয় কোন মিথ্যা ষড়যন্ত্রেই জড়ানো হয়েছে রেবাকে।

নিজের স্ত্রীকেও সে আর বিশ্বাস করে না।

নিশীথ বলে—ভূষণ। আজ বিকালের প্লেনে আমাকে বোম্বাই যেতে হবে জরুরী কাজে। আমি ব্যাঙ্ক—এয়ার লাইন অফিস থেকে আসছি। তুই গোছগাছ করে দে।

ভূষণকে সে বলতে পারে না সব কথাগুলো। তার একমাত্র মেয়ের নামে এই চরম অপবাদের কথাটা এখনও সে বিশ্বাস করে নি।

ভূষণ বলে—ঠিক আছে।

নিশীথের কলেজ যাওয়া হ'ল না। তার শান্ত জীবনে এসেছে কি ঝড়ের সংকেত। রেবার জীবনের এই ঝড়টা তাকেও বিভ্রান্ত করেছে। সে দৌড়লো গাড়ি নিয়ে কাজগুলো সেরে আসতে।

শিখা নির্বাক হয়ে গেছে।

তার চোখের সামনে বার বার ভেসে ওঠে বিভাসের রক্তাক্ত দেহটা, ছ'চোখে ওর বেদনার ছায়া, রক্তে ভিজে গেছে মেঝেটা, রেবার বিবর্ণ পাংশু মুখ, আর বিভাসের আর্তনাদটা ভোলেনি সে! স্থির হয়ে আসে দেহটা।

—দিদি!

অম্বাবাঈ-এর ডাকে চাইল শিখা।

বাংলোটা শূন্যপ্রায়। সব কলরব থেমে গেছে। রেবাই এই

বাংলোয় এনেছিল সুর, কলরব—প্রাণের সাড়া। অম্বাবাঈ চিৎকার করতো রেবার দুষ্টুমিতে। রেবা নেই—জেল হাজতে!

তাই আজ সেখানে নেমেছে অখণ্ড স্তব্ধতা। সমুদ্রের ঢেউ-এর অশান্ত গর্জন—ঝড়ো হাওয়ার মাতন চলেছে নারকেল কুঞ্জে।

রাতটা কেটে গেছে কোনদিকে। পুলিস এসেছিল, তারা বডিটা নিয়ে গেছে। রেবাকেও! নিয়ে গেছে তাদের প্রমাণ। বিভাসের স্টুডিওর জিনিষপত্র তেমনিই রয়েছে। পুলিস পাহারা বসিয়ে শিখাকে নিয়ে যায় থানায়। রাত কতো জানে না।

শিখার স্টেটমেণ্টও রেকর্ড করেছে।

হাজার হোক মা সে। এমনি একটা বিপদের মুখে পড়েছে রেবা, কি অঘটন ঘটে গেল তার চোখের সামনে, কিছুই করতে পারেনি সে। ভাবতেই পারেনি নিমেষের মধ্যে এমনি একটা সর্বনাশের ছায়া নামবে তার জীবনে।

আজ সব উত্তেজনা, চাওয়ার ঝড় থেমে গেছে তার জীবনে, নেমে এসেছে স্তব্ধতা—শূন্যতা। এত চাওয়ার মত্ততায় শেষে এমনি গ্লানিই বোধ হয় নামে মানুষের জীবনে।

অম্বা বলে—কাল রাত থেকে কিছুই খাওনি, কেবল ওই ছাই পাঁশ গিলছো!

চাইল শিখা ওর দিকে। বলে সে—এখন যা তুই!

অম্বা দেখছে শিখাকে। এক রাতেই ওর দেহে এসেছে চাপা দেওয়া বয়সের সেই পরিবর্তনের রেখাগুলো। এতদিন সযত্নে যাকে ধরে রেখেছিল পরম সম্পদের মতই। আজ ওই সর্বনাশের ঝড়ে সেগুলোকে অর্থহীন নিষ্প্রয়োজন বলেই মনে করেছে।

শিখা বলে—কেউ এলে বলবি দেখা হবে না।

ফোনটা বাজছে। অম্বা চাইল। আজ বাইরের জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক শিখা রাখতে চায় না। সব ধারণা—দর্শন বদলে গেছে তার জীবনে কি নির্মম আঘাতে।

হঠাৎ প্রশান্তকে আসতে দেখে চাইল—তুই! প্রশান্ত এগিয়ে আসে!

হাজতের একটা ঘরে বসে রেবা ক্রমশঃ তার মনের সেই চিন্তাগুলোকে একত্রিত করার চেষ্টা করে। কাল রাত্রে হঠাৎ কি সর্বনাশ করেছে সে নিমেষের উত্তেজনায়। বিভাস নেই!

হাজতের এই ঘরে দিনের আলোর আভাষ একটু আসে মাত্র, সকাল না দুপুর জানা যায়না। মিটমিটে বাল্‌ব একটা জ্বলছে।

বিভাসের বেদনার্ত মুখখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

আজ সবকিছু আশা স্বপ্নকে বেবা নিজের হাতে শেষ করে দিয়েছে।

খুনী আসামী সে।

এই শেষ মৃত্যুকেই মেনে নেবে সে, কারণ বাঁচার তার কোন আশা নেই, আশ্বাস নেই। পুলিসও বার বার তাকে প্রশ্ন করেছে, জেরা করেছে। রেবা বলেছে—আমিই খুন করেছি বিভাসকে।

আরও কি সব প্রশ্ন করেছে। জবাব দেয়নি রেবা। তার জীবনের উপর আজ কোন মোহ নেই।

কাদের পায়ের শব্দে চাইল রেবা।

প্রশান্তমামা ঢুকছে, পিছনে একজন পুলিস অফিসার, আরও কে কে আছে। রেবা মামার দিকে চাইল।

—মামা!

প্রশান্ত দেখছে রেবাকে। আজ সে তার আপনজন নয়, রেবার মামলার অ্যাডভোকেট সে। ওকে দেখছে সেই সন্ধানী দৃষ্টিতে। প্রশান্ত এগিয়ে এসেছে, রেবা মামার বুকে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে :

প্রশান্ত সান্ত্বনা দেয়—কাঁদিসনে রেবা। সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কি হয়েছিল সব আমাকে ঠিক ঠিক বল। বলবি তো?

রেবা মামার চোখে কি যেন সান্ত্বনার আশ্বাস খুঁজছে। প্রশান্ত বলে—জামিনে খালাস করে নিয়ে যাবো তোকে।

রেবা আবার মুক্তির স্বপ্ন দেখছে। বলে সে—বলবো মামা!

প্রশান্ত বলে—কেন তুই মারলি বিভাসকে, তাকে ভালোবাসতিস —সেও ভালোবাসতো তোকে, তবে কি এমন ঘটলো যে—

রেবার চোখের সামনে সেই নিষ্ঠুর দৃশ্যটা ফুটে ওঠে। দেখেছিল রেবা তার বিশ্বাস—ভালোবাসা—জীবনের সব সম্পদ হারিয়ে গেছে বার বার—

প্রশান্ত দেখছে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে রেবাকে। হয়তো কিছু সত্যি কারণটা বলবে সে, প্রশান্তও চায় সেটা। নাহলে মামলায় কোন কিছুই করা যাবে না। প্রশান্ত কৌশলী আইনজ্ঞের মত এবার সত্যি কথাটাই যেন বের করতে পারবে।

বলে সে—তুই আবার ফিরে যাবি। ছবি আঁকবি—এসব বিপদ কেটে যাবে।

এগিয়ে আসে শিখা: আজ সেও সারা মন দিয়ে তার মেয়েকে ফিরে পেতে চায়। বলে সে—রেবা!

—মা! চমকে ওঠে রেবা। মাকে দেখছে।

মায়ের ছুচোখে আজ সে জল দেখেছে। ধীরে ধীরে তার চোখের চাহনি কঠিন হয়ে ওঠে। সে বাঁচতে চায় না, চায়না কোন কিছুই। ওই জগৎ, ওই পরিবেশ, লোভী স্বার্থপর সমাজকে সে ঘৃণা করে। ওই সমাজে বাঁচার সখও তার নেই।

প্রশান্ত দেখছে রেবাকে। তার নরম মুখের রেখাগুলো কঠিন হয়ে উঠেছে শিখাকে দেখে, একেবারে বদলে গেছে মেয়েটা। ছুচোখে ফুটে ওঠে কঠিন ঘৃণাভরা চাহনি। প্রশান্ত অবাক হয়। একটা নির্মম সত্য যেন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

প্রশান্ত রেবাকে সংযত—কঠিন হয়ে যেতে দেখে বলে—কই বল! জবাব দে, কি করেছিল বিভাস?

রেবার স্তব্ধতা ভেদ করে কে যেন অন্য কণ্ঠে বলে ওঠে—জানি না। কিছু জানি না আমি। তোমরা যাও—চলে যাও মামা।

কি অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে রেবা।

প্রশান্ত বারবার ডেকেও সাড়া পায় না। রেবার সারা মন কি প্রতিবাদের কাঠিন্যে নিজেকে সরিয়ে নিল এদের সব আশ্বাস-সান্ত্বনা থেকে।

হতাশ হয়ে বের হয়ে এল প্রশান্ত।

শিখাও চুপ করে গেছে। জটিল একটা উর্ণনাভের জাল যেন পাকে পাকে তাকে জড়িয়ে ধরেছে।

প্রশান্ত কোর্টে অন্য মামলাগুলো 'অ্যাটেণ্ড' করে, কাজও সারে। কিন্তু বারবার মনে পড়ে রেবার কথাগুলো। পুলিসও কোন অন্য ক্লু পায়নি। সোজা স্বীকার করেছে রেবা যে সেই অপরাধী, আর তার অপরাধ ঘটানোর মূলে যুক্তিসঙ্গত কোন কারণও প্রকাশ পায় নি।

রেবা যেন ইচ্ছে করেই তার নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতে চায়। ওরা চলে গেছে। একাই বসে আছে অন্ধকার ঘরে, মাথার উপর একটু স্কাইলাইট দিয়ে আলোর রেখা আসছিল, সেটা আর আসে না।

খাবার দিয়ে গেছে। রুটি, এক চামচ ভাত, কি শব্জী, ডাল সব পড়ে আছে। খায়নি সে। কে বলে ওদিক থেকে—খানা খা লেও।

জবাব দিল না রেবা, কোন কিছুতেই স্পৃহা নেই। আজ এত বড় পৃথিবীতে সে নিঃসঙ্গ, একা। একাই এ বোঝা বয়ে সে তার বাঁচার পর্ব সাঙ্গ করতে চায়। সেই সন্ধ্যাতে সে নিজেকেই শেষ করতে চেয়েছিল ওই সর্বনাশের পর। ধারাল ছেনিটা তুলেছিল নিজেকে লক্ষ্য করেই, কিন্তু কে বাধা দিয়েছিল মনে নেই।

মরতেও সুযোগ পায়নি। তাই এখনও এই যন্ত্রণা সয়ে বেঁচে আছে।

প্রশান্ত বাড়ি ফিরে একটু সাহস পায়। নিশীথ এসে গেছে কলকাতা থেকে। মাধবীর চোখে জল, উষাও রয়েছে। খবরটা জানায় তারাই। নিশীথ খবরের কাগজগুলোও দেখছে। রেবার ছবি—তার জবানী আর ঘটনাটা বড় করে লেখা হয়েছে।

মাধবী বলে—কি সর্বনাশ আর হবে জানি না বাবা। তখনই জানতাম ওর মায়ের জন্যই মেয়েটার জীবনও বিষিয়ে উঠবে। আর তাই হয়ে গেল!

প্রশান্ত ঢুকছে।

—এসেছো নিশীথদা!

মাধবী এগিয়ে আসে—কি হল রে! রেবাকে জামিনে ছাড়াতে পারলি না? এত লোককে ছাড়িয়ে আনিস কই মেয়েটাকে পারলি না? কি বলে সে? ভালো আছে তো?

প্রশান্ত মাকে আশ্বাস দেয়—দেখে এসেছি। ভালো আছে সে।

—জামিনের কি হ'ল?

প্রশান্ত জানায়—দরখাস্ত করেছি। পরশু যা হয় হবে।

নিশীথ শুনছে ওর কথাগুলো।

রাত্রি নামছে। বাড়ির এদিকে প্রশান্তের চেম্বার। সামনে খোলা ছাদে প্রশান্ত একটু বাগান মত করেছে। টবে গাছ, ফুলগাছ কিছু আছে। বাড়ির থেকে এদিকটা আলাদাই।

নিশীথ আর প্রশান্ত বসে আছে।

প্রশান্ত বলে চলেছে ওর আজকের অভিজ্ঞতার কথা। নিশীথের বারবার মনে পড়ে রেবাকে। বেচারা ওই হাজতে বহু কষ্টেই

রয়েছে। নিশীথও অবাক হয়—তবু তোমাকে বলেনি সে কোন কথা ?

প্রশান্ত বলে—মনে হয় জীবনের উপর কিছু সাংঘাতিক ঘৃণাই এসেছে তার। তাই সে কোন কথা না বলে কঠিন শাস্তিটাই মেনে নিতে চায় নিদারুণ অভিমানে।

নিশীথ ভাবছে কথাগুলো। রেবার হাসিভরা মুখ—তার সেই উচ্ছলতা আজও ভোলেনি নিশীথ। জীবনকে ভালো বেসেছিল সে, তাই শিল্পী হতে চেয়েছিল। কিন্তু কি এমন সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটলো জানে না যার জন্য এত ঘৃণা জমেছে তার মনে।

প্রশান্ত বলে—কিছুই পায়নি বেচারা তাই বারবার ঠকেছে। সব বিশ্বাস—নির্ভরগুলো ওদের হারিয়ে গেছে।

নিশীথ বলে—কাল একবার নিয়ে যাবে প্রশান্ত ওর কাছে।

প্রশান্ত দেখছে নিশীথকে। বলে সে—চলো। দেখো তুমি যদি কিছু করতে পারো।

প্রশান্ত বলে—জামিন হয়তো হয়ে যাবে। কিন্তু সত্যি কি ঘটেছিল, কেন ঘটেছিল এসব কিছু যদি জানা না যায় কি নিয়ে ওই কেস লড়বো ?

নিশীথও কথাটা ভাবছে।

জেনানা ওয়ার্ডে ধমকের সাড়া ওঠে। রেবা এসে অবধি কিছুই খায়নি। কাল সারা দিন-রাত ওর খাবার সব পড়ে আছে। রাতের জমাদারণীও বলেছে, ধমক দিয়েছে। রেবাও প্রতিবাদ করে—খাবো না। কিছুতেই খাবো না ওসব। দরকার নেই আমার !

কান্নায়—রাগে ফেটে পড়ে মেয়েটা।

রাতভোর ঘুমুতেও পারেনি। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। কোথায় রৌদ্র ঝলমল লাল গেরুয়া মাটির রাজ্যে ছায়ানামা শালবনে দৌড়চ্ছে সে, মাটিতে আলোছায়ার জালবোনা, বাতাসে

ওঠে কাশফুলের মিষ্টি সুবাস, হলুদ বেগুনীপাতা কাঁপে, রং-এর মেলায় হারিয়ে গেছে রেবা!

কে ডাকছে তাকে—রেবা! রেবা!

তার বাবা! হাসিভরা প্রশান্ত মুখ—দুচোখে কি আশ্বাস! দিশাহারা মেয়েটাকে দেখে সে এগিয়ে আসে। রেবা দুহাত দিয়ে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে! চোখে মুখে কি নিশ্চিন্ত নির্ভর।

নিশীথ বলে—এই বনে জন্তু জানোয়ার অনেক আছে। পথ হারিয়ে ফেলবি—

হাসে রেবা, বাবাকে ধরে বলে—তুমি কাছে থাকলে কোন জন্তু জানোয়ার কিছু করতে পারবে না বাপি। আব পথও হারাবো না।

হঠাৎ চমকে ওঠে রেবা কাদের ডাকে। চোখ মেলে দেখে সেই অন্ধকার হাজতে আটকে আছে সে। বাবা নেই--হারিয়ে গেছে সেই ঝলমল জগতটা।...

প্রশান্ত এগিয়ে আসে—কে এসেছে দেখ রেবা!

রেবা চাইল। তার চোখে মুখে বিস্ময়, আতঙ্ক—তারপরই অসহায় কান্নায় আর্তনাদ করে দুহাত দিয়ে নিশীথকে জড়িয়ে ধবে।

—বাপি!

কাঁদছে রেবা!

নিশীথ দেখছে ওকে। সুন্দর সেই মেয়েটা ক'দিনেই কি বেদনায় বিবর্ণ হয়ে গেছে। চোখে মুখে নেমেছে কালিমা, চুলগুলো উস্কো-খুস্কো বিভ্রান্ত!

এ যেন সেই সুন্দর প্রাণ উছল মেয়েটার ধ্বংসস্তূপই।

নিশীথ বলে—কাঁদিস নি রেবা। আমি এসেছি—এবার সব ঠিক হয়ে যাবে রে! আবার তোকে নিয়ে যাবো কলকাতায় আমার কাছে।

রেবা দেখছে বাবাকে। একফালি সূর্যের আলো এসে পড়েছে

সেই ফাঁক দিয়ে ওর বলিষ্ঠ প্রশান্ত মুখে। তার কথায় কি আশ্বাস পায় রেবা।

প্রশান্ত দেখছে ওকে।

নিশীথ বলে—হাতমুখ ধুয়ে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নে। বাড়ি থেকে মামীমা পাঠিয়েছে। কাল থেকে খাস্‌নি কেন পাগ্‌লি ? এ্যাঁ!

হাসছে রেবা। ওর কান্নাভিজে চোখে ক'দিন পর আবার হাসির ঔজ্জ্বল্য ফুটে ওঠে। জেলার ভদ্রলোকও অবাক হন। তিনিও একে নিয়ে বিপদে পড়েছিলেন। আজ না খেলে ওকে জোর করে খাওয়াতে হতো।

বলেন তিনি—খাও!

নিশীথ বলে—কলকাতার বাগানে তোর হাতে লাগানো গোলাপ গাছগুলোয় ফুল আসছে। গিয়ে দেখবি কেমন ফুল ফুটছে।

—সত্যি! রেবা সহজ হয়ে ওঠে।

প্রশান্ত বলে—বাবাকে সব কথা বলবি তো ?

নিশীথ প্রশান্তকে চোখের ইসারায় থামতে বলে। জানে সে রেবা বলবে তাকে সবই। কিন্তু একটু স্বাভাবিক হতে দিতে চায় সে রেবাকে।

নিশীথ বলে—কাল জামিনে ছাড়া পেয়ে দিদার ওখানেই থাকবি। আমার হোটেল কাছেই। ওখানেও আসবি। তারপর এখানের মামলা চুকিয়ে তুজনে কলকাতায় ফিরবো।

রেবা দেখছে বাবাকে। এবার যেন ও জগতে ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখছে সে। বাবার চোখে দেখেছে সেই আশ্বাস।

রেবা তবু ভীত কণ্ঠে শুধোয়—আমাকে ছেড়ে দেবে বাপি ?

নিশীথ বলে—যা সত্যি নির্ভয়ে তাই বলবি। নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে তোকে। আমি জানি আমার রেবা অকারণে কোন অন্যায় কাজ করতে পারে না। সেই কারণটার যুক্তি নিশ্চয়ই আছে—সেইটাই বিচার করা হবে। আর তার জন্য আছে তোর মামাবাবু, আমিও রইলাম।

রেবা বাবার কথাগুলো শুনছে মন দিয়ে।

প্রশান্ত কি যেন আশার আলো দেখে। মনে হয় সেই আসল কারণটা তাকে বের করতেই হবে।

মাধবী রেবাকে জড়িয়ে ধরে অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তিন-চার দিন হাজতবাসের পর প্রশান্ত ওকে জামিনে খালাস করে এনেছে। নিশীথও সবদিক থেকে সাহায্য করেছে।

মাধবী বলে—স্নান করে খেয়েদেয়ে একটু ঘুমো রেবা। আর প্রশান্ত তোর ওকালতি জেরা এখন থামা বাবা। পরে ওসব কথা শুধোবি। পুলিসে ক'দিন জেরার চোটে নাজেহাল করেছে বাছাকে। এখন তুই ক্ষ্যামা দে।

নিশীথ কি ভাবছে। প্রশান্ত বলে—নিশীথ দা, তুমি এখানেই লাঞ্চ সেরে যাও।

নিশীথের হোটেল কাছেই। নিশীথ বলে—না। হোটেলেই যাচ্ছি। বৈকালে আসবো।

নিশীথও নিরিবিলিতে এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে চায়। আজ রেবাকে বাঁচাবার দায়িত্ব তারও।

শিখা বাংলোর পোর্টিকোতেও বের হয়নি, কাল থেকে বাইরের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগও নেই। সব উদ্যম, আগ্রহ তার থেমে গেছে। শিবদাসানি এসেছিল। তার এসময় শিখার এই ব্যাপারটাতে অনেক ক্ষতি হয়ে গেল। আর এগজিবিশনে অনেক মানীগুণী লোকই থাকবে, এসময় শিখাকে জড়িয়ে এসব কথা ওঠায় অনেকেই ঠিক খুশি হন নি।

পাবলিক গুডউইল টুইল-ও দরকার এসব কাজে।

শিখা অবাক হয়ে চাইল ওর দিকে। আজ ওদের সমাজকে চিনেছে। মিঃ প্যাটেল একটা জানোয়ার শ্রেণীর লোক, শিবদাসানিও বহু মেয়ের সর্বনাশ করেছে, আর বিদেশে তারা নানা

উপায়ে বেআইনি টাকা জমিয়েছে, এখানে ও সবরকম অনাচার করেও সমাজের বুকে জনকল্যাণ, শিল্প, সংস্কৃতির ধারক হয়ে গৌরব-ময় আসনে বসে আছে।

শিখা বলে—কি করতে বলো আমায় ?

শিবদাসানি চাইল ওর দিকে। শিখা ওই চাহনির অর্থ চেনে। বলে সে—অবশ্য তোমার মাইনে ঠিকই পেয়ে যাবে, বাংলোতেই থাকবে, কিছুদিন অপিসে না গেলেই ভালো হয়। বরং ছুটি নিচ্ছ এই আর কি। তাছাড়া এ সময় তোমার মন মেজাজও ভালো নেই, তাই বলছিলাম অপিসে না এলেও চলবে !

শিখা চুপ করে কি ভাবছে।

এর পর শিবদাসানি অন্য লোকের নাম দিয়ে ওই সব করাবে ধীরে ধীরে এতদিনের গড়া সমাজ, স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হতে হবে শিখাকে।

শিবদাসানি জানে কি ভাবে সরিয়ে দেবে ওকে। এর মধ্যে শিখা তার কোম্পানীর হয়ে বেশ শক্ত জমিন তৈরী করেছে।

মিঃ প্যাটেলও খুশি হবে ওকে সরিয়ে দিলে, কারণ শিখাকে আর তাদের কোন প্রয়োজনে লাগবে না।

ক্রমশঃ শিবদাসানি নিজ মূর্তি ধরে তার ব্যবসা এবার নিজে চালাবে।

শিখার সামনে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা এসেছে। মনে পড়ে ম সোমানির কথাগুলো। সেদিন ও বলেছিল, ওরা সুযো পেলেই সামান্য অজুহাতে শিখাকে সরিয়ে দেবে। আর উন্নতি শিখর থেকে শিখা হারিয়ে যাবে অতল বেদনাময় বিস্মৃতির গভীরে এই ঠুনকো প্রতিষ্ঠার মোহে শিখার মনে হয় আজ অনেক কি হারিয়ে গেছে।

বৈকাল নামছে।

সূর্যের শেষ আলোয় সমুদ্রের জল রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। ঢে

গুলো ফাটছে বেলাভূমিতে। ওদিকের 'বীচে' চেলেমেয়েদের কলরব ওঠে। আনন্দে ওরা দৌড়চ্ছে, চিৎকার করছে, ওই জগতে শিখার আজ কোন ঠাঁই নেই।

গাড়ি থামার শব্দে চাইল শিখা।

একটা ট্যাক্সি এসে থেমেছে গেটের বাইরে, গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে আসে সৌম্য শান্ত একটি মানুষ। পরণে ধুতি খদ্দরের পাঞ্জাবী, চুলে একটু পাক ধরেছে। বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ভদ্রলোক এগিয়ে এসে পোর্টিকোতে উঠেছে।

শিখা আজ তার সব মানসিক জোর, সেই হারানো শক্তি তেজটুকু ফিরে পেতে চেষ্টা করে। জানে সে আজ তাকে বহুদিন পর ওই মানুষটির মোকাবিলা করতে হবে নিজের যুক্তি দিয়ে।

অম্বা এসে খবর দেয়—কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

শিখা বলে—আমি অসুস্থ, দেখা হবে না বলে দে।

অম্বা বলে—তাইতো বললাম। ভদ্রলোক শোনান—দেখা করতেই হবে। খুব জরুরী দরকার। দেখা না করে উনি যাবেন না।

.…নিশীথ ভেবেছে কথাটা।

প্রশান্তের কথাগুলো শুনেছে। রেবার মায়ের উপর ঘৃণা-অভিমানটাই সবচেয়ে বেশী, আর মনে হয় রেবা ইচ্ছে করেই কোন গোপন সত্যকে চেপে রেখেছে। পুলিসকে ও মিথ্যা কথা বলেছে বার বার। নিশীথও চেষ্টা করেছে রেবার কাছে আসল কথা জানতে।

রেবার ছুচোখে জল নামে। মেয়েটা বলে কাতর কণ্ঠে—এর বেশী কিছু জানিনা বাবা। তুমিও জানতে চেও না। আমার শাস্তি হোক—আমি অন্যায় করেছি। মাথা পেতে নেব সেই শাস্তি। এর বেশী কিছু জানি না।

বারবার মনে হয়েছে নিশীথের রেবা কিছু বলতে পারছে না বলতে চায় না।

শিখা হয়তো কিছু আলোকপাত করতে পারে। কিন্তু তার স্টেটমেণ্টে সে বেশী কিছু জানায় নি। রেবার কথাগুলোকেই সমর্থন করে গেছে। আর বিভাস কোন স্টেটমেণ্টই দিতে পারেনি। শিখার কাছে এসেছে নিশীথ রেবার জন্যই।

পায়ের শব্দে চাইল নিশীথ।

দেখছে শিখাকে। দীর্ঘ দশ বারো বছর পর দেখছে সে শিখাকে। ক' দিনেই শিখার যত্নে-ঢাকা বয়সের ছাপ ফুটে উঠেছে মুখে, চোখের কোলে কালির দাগ, বিগত দিনের বহু ক্লান্তি আর বেদনায় মলিন হয়ে উঠেছে মুখ। চুলগুলো উড়ছে।

সেই যৌবন উছল রূপসীর জীবনে রূপের স্বপ্ন কি বিকৃতি নিয়ে ফুটে উঠেছে কঠিন সত্যরূপে। শিখা দেখছে একটি নতুন মানুষকে। আজ শিখা হেরে গেছে, নিদারুণ ভাবে মূল্য দিয়েছে সে তার ভুল পথে চলার জন্য।

তবু এই মানুষটির সামনে নিজেকে সে হারাতে চায় না। বলে শিখা—কি ব্যাপার! কবে এলে?

—তু-তিন দিন হ'ল এসেছি। এমনি একটা বিপদের মাঝে পড়বে তোমরা ভাবিনি শিখা।

শিখা দেখছে নিশীথকে। নিশীথ বলে—রেবা হঠাৎ এমন কাজ করবে বিশ্বাস হয় না!

শিখার তুচোখ জ্বলে ওঠে। বলে সে—তাহলে কি বিশ্বাস করতে চাও? কি বলতে চাও তুমি?

নিশীথ শিখার কথার স্বরে তীক্ষ্ণতা, জ্বালাটা অনুভব করেছে। বলে সে—বলতে কিছুই চাইনা। শুধু এইটা জানাতে চাই কোথায় একটা ফাঁক রয়ে গেছে। কেস পুলিসের হাতে, তারাও সবদিক দেখবে। আমার কথা—যদি সত্যি কিছু জানো তুমি

বলো। নিষ্পাপ একটা মেয়ের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাক এ নিশ্চয়ই চাও না।

শিখা নিশীথের কথায় বলে ওঠে—তোমার এ কথার কোন জবাব আমার জানা নেই। তবে বেশ মনে হয়েছে, এতদিন পরও তুমি আমার সেই অপমানটা ভোলো নি। বারবার আমাকে না জানিয়ে তুমি মেয়েকে সমর্থন করেছো, কলকাতায় নিয়ে গেছো। তোমারই সমর্থন পেয়ে রেবা এমন বেয়াড়া হয়ে উঠেছিল। তাই এ কাজ করতেও বাধেনি তার।

নিশীথ শিখার কথায় অবাক হয়। মেয়ের জন্য কোথাও সমবেদনা নেই, আছে শুধু জ্বালাই। নিশীথ বলে—তুমি মা হয়ে মেয়ের সম্বন্ধে এমনি ধারণা করতে পারো তা ভাবিনি। অথচ রেবা তোমার অনেক কিছু অন্যায় অনেক অবিচার সেই ছেলেবেলা থেকে সয়েছে, কিন্তু কোনো অভিযোগ সে কারো কাছে করেনি।

শিখা শোনায়—তুমি তা বলবে জানতাম। আজও তুমি চাও আমার সেই কাজের প্রতিশোধ নিতে। তাই ছুটে এসেছো এই সুযোগে আমার নামে শেষ কলঙ্কের বোঝা কৌশলে চাপিয়ে দিতে।

অবাক হয় নিশীথ। আর্তকণ্ঠে বলে সে—একি বলছো শিখা! এতবড় কথাটা বলতে পারলে। আজ তুমি যতই অন্যায় করো তোমার মঙ্গলই চাই। রেবাও সুখে থাকুক তাই চাই। সেই জন্যে তোমাদের মধ্যে আসিনি। কিন্তু এ অবস্থায় রেবার এই বিপদে আমাকে আসতেই হবে, আর সব চেষ্টা দিয়ে যা সত্যি তা বের করতেই হবে, ও আমারই মেয়ে!

নিশীথ বেশ বুঝেছে শিখা কিছুই জানাবে না তাকে। শিখাও এ প্রসঙ্গ এড়াবার জন্যই বলে—আমার শরীর খারাপ, আমি উঠছি।

শিখা চলে গেল ভেতরের ঘরে। নিশীথকে যেন চেনে না সে। নিশীথও উঠেছে। হঠাৎ টেবিলের ওদিকে একটা লম্বা খাম দেখে চাইল। টাইপ করে ঠিকানা লেখা সরকারী খাম, পাশপোর্ট আপিস থেকে আসছে। আরও চিঠিপত্র রয়েছে তবু হঠাৎ নিশীথের ওই চিঠিখানার উপরই নজর পড়ে।

চিঠির খামের উপর একটা ফাইল নাম্বারও লেখা আছে।

নিশীথ নেমে এল চিন্তিত মনে।

শিখা তেমনি বেপরোয়া রয়ে গেছে, আর নোতুন করে আবিষ্কার করেছে নিশীথ, শিখার মনে রেবার জন্য তীব্র একটা জ্বালা। মা হয়ে মেয়েকে এভাবে দেখবে তা ভাবেনি। এই বিকৃত মনোভাবই রেবার জীবন তীব্র গ্লানিতে ভরে দিয়েছে।

নিশীথ সন্ধ্যার পর তার কলেজের বন্ধু অসিত ঘোষের বাংলোয় গেছে। বোম্বেতে অসিত এখন পুলিস মহলের অন্যতম কর্তা। আই-পি-এস পাশ করে বোম্বে ক্যাডারেই পোস্টেড। সেও শুনেছে ঘটনাটা।

অসিত ঘোষ আজ বন্ধুর জন্য সমবেদনা বোধ করে।

চা এসেছে। নিশীথ বলে—মন মেজাজ ভালো নেই অসিত। অসিতও বোঝে ওর মনের অবস্থা, বলে সে—সত্যি, একটা বিরাট সর্বনাশের মুখে এসে পড়েছিস তুই। শুধু তুই নোস—সারা সমাজ, দেশ কি দিশাহারা হয়ে আলেয়ার পিছনে ছুটে চলেছে।

আর এমনি অন্ধকারে মাথা খুঁড়ে মরছে। টাকা-প্রতিষ্ঠা যদি সব হোত তাহলে টাকা দিয়েই মানুষ শান্তি—মানসিক সুখকে কিনে নিতে পারতো। তাতো নয়।

নিশীথ শুধোয়—কিছু রিপোর্ট পেলি ফারদার ?

অসিত ঘোষের কোন পরিচিত অফিসার এই কেসের তদন্ত করছে। অসিত বলে—না। কতোদিন পর তুই এলি ভাবলাম

জমিয়ে আড্ডা মারবো, একটু ঘুরতে যাবো। তা নয় তুই এলি সেই ঝামেলা মাথায় নিয়ে। শিখা দেবী কিছু বললো?

নিশীথের মনে পড়ে শিখার তেজদৃপ্ত বিকৃত মূর্তিটা। সে যেন দিনরাত জ্বলছে কি জ্বালায়। বলে নিশীথ—না। কিছুই তেমন কথা হল না।

হঠাৎ মনে পড়ে নিশীথের সেই পাশপোর্ট-এর আপিসের মোটা খামটার কথা। বলে সে—পাসপোর্ট আপিসে এই নাম্বারে শিখার কাছে চিঠি একখানা গেছে। কি ব্যাপারে বুঝলাম না। ওকি বাইরে যাচ্ছিল?

অসিত নাম্বারটা টুকে নিয়ে বলে—খোঁজ নিয়ে দেখছি। কালই জানতে পারবি কোন খবর থাকলে।

রেবা এসেছে নিশীথের হোটেলে। প্রশান্তদের বাড়ি থেকে পার্কের ওদিকে সবুজ গাছগাছালির মধ্যে চারতলা সুন্দর হোটেলে এসে উঠেছে নিশীথ।

রেবা ক'দিনেই বাবার সান্নিধ্যে এসে অনেকটা সহজ হয়েছে। আবার তার হারানো লালিত্য ফিরে পাচ্ছে। তবু মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যায়। কি যেন ভাবনার গভীরে হারিয়ে যায়। চোখে তার ফুটে ওঠে দূর প্রসারী আতঙ্কিত সেই চাহনি।

—রেবা!

বাবার ডাকে চাইল সে। বেয়ারা ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেছে ট্রেতে। রেবার খেয়াল হয়, টোস্টে মাখন জেলি লাগাতে থাকে সে। বলে নিশীথ—তোর মায়ের কাছে গেছিলাম!

রেবা চকিত চাহনি মেলে চাইল। বলে সে—ওখানে যেওনা বাবা। মা তোমাকে অপমান করবে।

হাসে নিশীথ—তোর মায়ের অপমান তো অনেকদিন আগে থেকেই সইছি রে, তাই কালকের অপমানটা গায়ে

বাজলেও মনে লাগে নি। তোর জন্য সব মান-অপমান আমার সইবে রে!

রেবা দেখছে তার বাবাকে।

মায়ের ব্যবহার সে জানে। বলে ওঠে রেবা—তোমাকে কেন অপমান করবে মা। তার জন্য আমি অনেক সয়েছি। জানোনা বাবা মাকে! প্রথম থেকেই মা সইতে পারতো না আমাকে আমি যখন যা পেতে চেয়েছি মা-ই বাধা দিয়েছে বার বার আমার সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। তাই তোমাকেও সে কেড়ে নিয়েছিল, আমাকে জোর করে সরিয়ে এনেছিল। দিদাকে ভালোবাসতাম—তাই দিদার এখানে আসতে দিত না। মা দিদাকে দেখতে পারতো না। একা বন্দীর মত থাকতাম ফ্ল্যাটে আমার ফ্যাংশনে কতো করে আসতে বলতাম, মা আসতো না আমি যেন তার কাছে একটা মানুষ নই। আমার চাওয়া কিছু থাকতে পারতো না।

নিশীথ দেখছে নতুন এক রেবাকে। চোখ মুখে ওর নিবিড় উত্তেজনা, অতীতের সেই বঞ্চনার বেদনাগুলো ওর মনের পরতে গভীরতর হয়ে চেপে বসেছে। তাকে দিশাহারা উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে। এতদিন এই কথাগুলো কাউকে সে জানাতে পারেনি আজ রেবা বাবার কাছে বলে হাল্‌কা হতে চায়।

···রেবার চোখের সামনে সেই প্রত্যহের বঞ্চনা তিল তিল করে জমেছিল। শেষবারের মত তবু বাঁচতে চেয়েছিল রেবা মায়ের কাছ থেকে সরে এসে।

তাই বিভাসের কাছে এসেছিল সেই রাত্রে।

বিভাসও নতুন কি ভাবছে। রেবা আর সে ঘর বাঁধবে দুজনে সুখী হবে। হঠাৎ ঝড়ের মত এসেছিল শিখা ওদের মাঝে।

—এ হতে পারে না বিভাস!

বিভাস চাইল ওর দিকে। চমকে ওঠে রেবা। আজ সে আর সহ্য করতে চায়না ওই শাসন। মায়ের কোন মতই সে গ্রাহ্য করবে না। রেবা এগিয়ে আসে। জানায় সে—এ নিয়ে তুমি কোন কথা বলবে না মা!

শিখা চাইল ওর দিকে, কঠিন কণ্ঠে বলে সে—না। এভাবে একজনের ভবিষ্যৎ তুমি নষ্ট করতে পারো না। বিভাসের সামনে অনেক সম্ভাবনা, বিভাস আরও বড় হবে!

রেবা চাইল ওর দিকে।

বিভাস শুনছে কথাগুলো। বলে সে—ওই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার কোন মোহ নেই। আমি সামান্য নিয়েই খুশী হতে চাই, তাই রেবাকেই মেনে নেব। দুজনে ঘর বাঁধবো।

শিখা জ্বলে ওঠে বিদ্যুতের ঝলকের মত। আজ শিখার অনেক স্বপ্ন বিভাসকে ঘিরে। জীবনে অনেক ঠকেছে শিখা। স্বামীকে ছেড়ে এসেছে। মধু সোমানীকে হারিয়েছে, হারিয়েছে তার ঘর, মিঃ প্যাটেলের মত লোকও তাকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছে, কি নিয়ে সে বাঁচবে জানে না।

একমাত্র স্বপ্ন দেখেছিল শিখা বিভাসকে নিয়ে। সব আয়োজনও হয়ে গেছে। বিভাসকে তাই বলে সে—এ হয় না বিভাস!

রেবা এগিয়ে আসে—ওর মতের বিরুদ্ধে তুমি আজ এসেছো ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে? তুমি আমার অনেক কেড়ে নিয়েছো মা—আমার বাবা, আমার স্বপ্ন, আমার চাওয়া-পাওয়া সব। আজ এসেছো বিভাসকেও কেড়ে নিতে।

তুমি মা! মা নামের কলঙ্ক তুমি! এ জন্মে আমার ঘৃণা এসে গেছে। তাই তোমাকে মানি না—তুমি যাও, সরে যাও, চলে যাও আমাদের জীবন থেকে।

···চমকে ওঠে নিশীথ।

—রেবা! তারপর?

রেবা কাঁপছে কি উত্তেজনায়। আর্তনাদ করে ওঠে রেবা।

—জানি না। আর কিছু জানি না বাবা!

কি দুঃসহ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে রেবা। নিশীথ চুপ করে দেখছে ওকে। কি একটা কঠিন নির্মম বেদনায় জ্বলে উঠেছে রেবা। নিষ্ফল সেই বেদনা।

কিন্তু সেই বেদনাটাকে সে প্রকাশ করতে পারে না। বলে রেবা—তোমাকে অপমান করলে সইবো না বাবা। আমার যা সর্বনাশ হয় হোক।

—পাগলি! নে চা জুড়িয়ে গেল।

নিশীথ ব্যাপারটাকে সহজ করে আনার চেষ্টা করে।

প্রশান্ত শুনছে কথাগুলো। সে যেন কিছুটা আলো পেয়েছে। প্রশান্ত বলে—ওর মা এইসব কথা বলেছিল?

নিশীথ বলে—তাইতো ও বললে, কিন্তু তারপর আর কিছুই জানাতে চায়নি।

প্রশান্ত ভাবছে। বলে সে—মনে হয় শিখার বিভাসের উপর কোন দুর্বলতা ছিল, বিভাস তাতে সায় দেয়নি।

প্রশান্ত উত্তেজিত হয়ে পায়চারী করছে। বলে সে—দ্যাট মে বি দি মোটিভ অব দি মার্ডার।

চমকে ওঠে নিশীথ—কি বলছো প্রশান্ত? এ কি করে সম্ভব!

প্রশান্ত বলে—বলতে লজ্জা নেই নিশীথদা, সবই সম্ভব। শিখা এমনি সর্বনাশা জীবনকে বেছে নিয়েছিল। সোসাইটিতে ওর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছি। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে এটা ঘটা বিচিত্র কিছু নয়।

নিশীথ বলে—তবে রেবা কেন বার বার স্বীকার করছে সেই-ই এর জন্য দায়ী। দোষী সে!

প্রশান্ত বলে—দ্যাটস্ দি ট্রাজেডি। রেবার জীবনে কোন আশা আর ছিল না। কিন্তু নিশীথদা, আমার মনে হয় রেবার সেই ধারণা বদলে দিয়েছো তুমিই। ও চায় আশা, বিশ্বাস, ভালোবাসা, নির্ভর। এ সমাজ তার সব কেড়ে নিয়েছিল, তাই অভিমান ভরে সে মরতেই চেয়েছিল। আজ তুমি সেই নির্ভর, বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছো। আই অ্যাম সিওর নিশীথদা, ও এ কাজ করে নি। নেভার !

নিশীথ কি ভাবছে। বলে সে—প্রমাণ চাই ওর বক্তব্যকে নাকচ করতে গেলে। কিন্তু কোথায় সেই প্রমাণ।

প্রশান্ত ভাবছে কথাটা।

ফোনটা বাজছে। তুলেছে প্রশান্ত। বলে সে, নিশীথদা তোমার ফোন।

অসিত ঘোষ ফোন করছে।

—নিশীথ, তোমার নাম্বার নিয়ে পাশপোর্ট আপিসে খোঁজ করেছি। মিসেস শিখার নামে পাশপোর্ট হয়েছিল, আর একটা পাশপোর্টও ছিল ওই সঙ্গে, দ্যাট বিভাস রায়ের পাশপোর্ট। ফ্রেঞ্চ অ্যাম্ব্যাসিতে তুটো পাশপোর্ট পাঠানো হয়েছিল ভিসার জন্য। ওরা তুজনে বোধ হয় ফ্রান্স যাবার ব্যবস্থাই করছিল। পুওর বিভাস !

নিশীথ অবাক হয়। সব খবরগুলো যেন মিলে যাচ্ছে।

কি উত্তেজনায় কাঁপছে সে। শিখা তাকে মিথ্যা কথাই বলেছে, এড়িয়ে গেছে। কি নীরব ঘৃণায় সারা মন ভরে ওঠে।

নিশীথ বলে, পরে কথা বলবো অসিত।

অসিত বলে—কথা না বলে চলে এসো। দেখা যাক আরও কিছু খবর দিতে পারি কি না। সো লং।

ফোনটা নামাতে প্রশান্ত চেয়ে থাকে ওর দিকে।

নিশীথের উত্তেজিত মুখের দিকে চেয়ে শুধোয় সে—কি খবর নিশীথদা? কে ফোন করছিল?

নিশীথ বলে—আমার বন্ধু, এখানের এক ডি-সি পুলিস, মিঃ ঘোষ।

তোমার অনুমান যেন কিছুটা মিলছে প্রশান্ত।

ওরা খবর পেয়েছে বিভাসকে নিয়ে শিখা ফ্রান্স যাচ্ছিল। ফ্রেঞ্চ অ্যাম্ব্যাসিতে ভিসার জন্য পাশপোর্ট পাঠিয়েছিল ওরা।

প্রশান্তের মুখে একটা আলোর ঝলক ফুটে ওঠে।

বলে সে—মনে হয় একটা সমাধান হবে এ রহস্যের।

নিশীথ চুপ করে থাকে। তার মনে ঝড় উঠেছে। উতরোল ঝড়।

বলে প্রশান্ত—আমি নিশ্চিন্ত, রেবা মাকে 'কভার' করতে চাইছে। নিশীথ ভাবছে কথাটা। বলে সে—আমি শিখার তুর্ভাগ্যের কথা ভাবছি প্রশান্ত, এমন মেয়েকেও সে চিনল না। শুধু ভুলই করে গেল।

প্রশান্ত বলে—সমাজ বড় নির্মম, সংসার বড় কঠিন ঠাঁই নিশীথ। এখানে ভুল, মিথ্যা দিয়ে তু-চারদিন টেকা যায়। কিন্তু বেশীদিন নয়। সব ভুল সেদিন বেদনার পাহাড় হয়ে চেপে বসে। ওই মিথ্যার বেসাতির মাশুলও গুনে দিতে হয়।

সন্ধ্যা নামছে।

এদিকটায় তখনও কিছু ভ্রমণ বিলাসী বালুচরে ঘোরে। জুহু বীচ থেকে ঘোড়ায় চড়ে খুদে সওয়াররা আসে যায়। ভেলপুরী, বাটাটা-পুরী ওয়ালাদের ঠেলাগাড়িতে বাতি জ্বলে জুহু বীচে।

শিখা অবাক হয়, শিবদাসানি আজই লোক দিয়ে নোটিশ পাঠিয়েছে, তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এক মাসের মাইনেও দিয়েছে, আর জানিয়েছে একমাসের মধ্যে তাকে বাংলো ছেড়ে দিতে হবে। নাহলে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে তাকে। অর্থাৎ

তার সব কেড়ে নিয়ে এই বিপদের দিনে শিবদাসানি তাকে পথে বের করে দিতেও দ্বিধা করে নি।

সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘনাচ্ছে তার জীবনে। পরাজয়ের গ্লানি হারিয়ে যাবার বেদনায় সে আজ বিবর্ণ, ভীত। জীবনের এই নিষ্ঠুর সর্বহারা কঠিন রূপটাকে দেখে চমকে উঠেছে শিখা। এতদিন সে দুপাশে দেখেছে স্তাবকের দলকে, দেখেছে কত পুরুষের গুঞ্জরণ। শিখার কৃপাদৃষ্টির জন্য কতজন ঘুরেছে, আজ তাদের সবাই হারিয়ে গেছে। একা—পরাজিত, নিঃস্ব শিখা।

—কে!

সামনে দেখেছে নিশীথকে। চমকে ওঠে শিখা। তার মনের চরম দুর্বল ক্ষণে আবার এসেছে নিশীথ কঠিন পদক্ষেপে। চোখে ওর ঘৃণার কাঠিন্য। শিখা নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করে।—আবার কেন এসেছো? যা বলার সেদিনই বলেছি।

নিশীথ দেখছে তাকে। বলে সে—না সত্যি কথা বলোনি, এখনও তোমার এই ঘৃণ্য জীবনকে ভালোবাসো, বাঁচতে চাও শিখা তোমার মেয়েকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে।

চমকে ওঠে শিখা।

—না তুমি যাও!

নিশীথ বলে—সব কথা শেষ না করে আমি যাবো না শিখা। তুমি বলোনি, আর জেনে রাখো রেবাও বলেনি। সে নিজের জীবন দিয়ে আজও তোমাকে বাঁচাতে চায়।

—মিথ্যা কথা। শিখা অস্ফুট কণ্ঠে বলে—পুলিস আছে, আইন আছে! বারবার এভাবে এসে জ্বালাতন করলে আমি পুলিসে যাবো। তুমি ভয় দেখাচ্ছো?

—না! নিশীথ বলে ওঠে স্পষ্ট স্বরে, ভয় দেখাতে আসিনি। শুধু তোমার বিবেক বলে যদি কিছু থাকে তার কাছে আবেদন জানাতে এসেছি, যা সত্য তাকে স্বীকার করে নাও।

বাতাসে ওঠে জলকল্লোলের শব্দ, হাহাকার জাগে শূন্য বালুচরে।

নিশীথ বলে—তুমি বিভাসকে নিয়ে এদেশ ছেড়ে ফ্রান্সে চলে যাচ্ছিলে কেন ?

বিবর্ণ হয়ে ওঠে শিখা। মনে হয় আরও কিছু জেনেছে সে।

শিখা তবু বলে—না, এসব মিথ্যা কথা।

হাসে নিশীথ—পাশপোর্ট আপিসও সেই কথাই বলবে। আর ফরেনসিক রিপোর্টও আসবে দু'একদিনের মধ্যে।

শিখার সারা দেহ যেন হিম হয়ে আসে। পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। শিখা তবু ওই মানুষটির কাছে মাথা নোয়াবে না। বলে সে—জানি, আমাকে তুমি বিপদে ফেলার জন্য চেষ্টা করবেই। তাই করোগে। দয়া করে এখান থেকে যাও !

নিশীথ কি বলতে চায়।

কিন্তু সে কথা শোনার অবকাশ তার নেই। শিখা উঠে গেল।

রাত্রি ঘনিয়ে আসে।

এদিকে নেমেছে স্তব্ধতা। কোলাহল নেই। অন্ধকারে গাড়িটা এসে থেমেছে।

শিখা চিনেছে ছায়ামূর্তিটাকে।

—মধু!

হাসছে মধু সোমানি। ধারালো হাসি। বলে সে—এবার সব সত্যি হয়েছে আমার কথা! আবার নিজেও জড়িয়ে পড়বে খুনের মামলায়।

মধু সোমানি সব খবরই রাখে তার। ইদানীং মধু অন্য ব্যবসা সুরু করেছে। তবু শিখার আশা ছাড়ে নি।

বলে সে—তোমার বিপদে তবু আমাকে বন্ধু বলে ভাবতে পারো শিখাজী। তাই এসেছি। তোমাকেও ছাড়বে না ওরা।

শিখা বলে—ওই খুন আমি করিনি। পুলিসও তা জানে!

হাসে মধু—ওসব যুক্তি টিকবে না। তাই বলছি শিখা, আমার

াঙ্গে এসো সমুদ্রের মধ্যে বড় 'ঢাউ' বোটে তুলে দেব। দুজনে
লে যাবো গালফ্ কানট্রিতে। কেউ জানবে না। সেখানেও বিরাট
্যবসা করেছি। দুজনে—

শিখা দেখছে ওকে।

আজও মধু সোমানি এসেছে রাতের অন্ধকারে ওই প্রস্তাব
নিয়ে। যৌবন-রূপ ওই নেশায় আজ শিখা অনেক অনেক আঁধার
পথ ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত—শ্রান্ত—পরাজিতই।

কিছুই সে পায়নি। আর তৃষ্ণা তার নেই।

নিশীথের কথাগুলো মনে পড়ে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে
েবার হাসিভরা মুখখানা। চারিদিকে সে শুধু সর্বনাশের আগুনই
জ্বেলেছে। ব্যর্থ করেছে অনেক জীবন।

বেবারও সব কেড়ে নিতে চেয়েছিল নিজের অন্ধ নেশায়।

-শিখা! মধু ডাকছে ওকে।

আর্তনাদ করে ওঠে শিখা, যাও। তুমি যাও মধু। তবু এই
বিপদে তুমি এসেছিলে পাশে। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই
সাহায্য নিতে পারবো না। তুমি যাও—

মধু নির্বাক চাহনি মেলে দেখছে ওকে।

শিখা আর্তনাদ করে—যাও। যাও তুমি। আমার সব তৃষ্ণার
শেষ হয়ে গেছে মধু। জীবন ভোর অমৃত বলে যা পেতে
চেয়েছিলাম তা গরলই। তাই জ্বলে পুড়ে শেষ হয়েছি। এ জ্বালা
তুমি বুঝবে না।

মধু চলে এল। শিখা কি দুঃসহ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

এ রাত্রির যেন শেষ নেই।

নিজেকে মেলে ধরেছে শিখা। সারা জীবনের বুকভরা গরল
জ্বালা তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে। তারাগুলো ঢেকে যায়
কুয়াসায়। আকাশ বাতাসে জাগে ওই চিরন্তন হাহাকার।

অতলান্ত অন্ধকারে হারিয়ে গেছে দিশাহারা শিখা।

সকালে ফোনটা বেজে ওঠে।

নিশীথ হোটেলে ফিরেছে অনেক রাত্রে।

ঘুম ভেঙ্গে যায় ফোনের শব্দে। প্রশান্ত বলে—এখুনি চলে এসো নিশীথদা, এ বাড়িতে!

চমকে ওঠে নিশীথ—রেবা ভালো আছে তো? তোমরা সবাই!

প্রশান্ত বলে—না, না। সে সব কিছু নয়। এসো অন্য কথা আছে।

…সারা বাড়িতে নেমেছে একটা স্তব্ধতা।

প্রশান্ত ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বের হ'ল। মাধবী দেবীর চোখে জল। রেবাও চলেছে গাড়িতে ওদের সঙ্গে।

শিখার বাংলোয় তার আগেই পুলিসের গাড়ি এসে গেছে।

দু-তিনজন পুলিস অফিসারের সঙ্গে এসেছে ডি-সি অসিত ঘোষও। কয়েকজন কনেস্টবল রয়েছে এদিক ওদিকে। ওরা পোর্টিকোতে উঠে ওপাশের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। রেবাকে দেখে অম্বাবাঈ এসে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। একটার পর একটা বিপর্যয় এসে পড়েছে রেবার জীবনে।

শিখা কাল রাত্রেই নিজেকে শেষ করে গেছে।

আজ সে সব কথা—সব দোষই স্বীকার করেছে। রেবা দেখছে মায়ের শান্ত স্তব্ধ মূর্তিটাকে।

সেদিনের কথা মনে পড়ে!

কি এক উন্মাদনায় যেন পাগল হয়ে উঠেছিল শিখা।

রেবার ওই প্রতিবাদে জ্বলে ওঠে সে।

স্টুডিওর আলোটা ম্লান, ওর দুচোখ জ্বলছে। শিখা দেখছে রেবাকে। আজ রেবাই তার জীবনের ছবিটাকে ম্লান করে দিতে চায়। বিভাসকে নিয়ে শিখা চলে যাবে বিদেশে। দুজনে সেখানে বাঁচবে নতুন করে।

তার পথের বাধা ওই রেবা। আজ রেবা বলে ওঠে—

যাও। চলে যাও তুমি! তুমি মা নামের কলঙ্ক! রাহুর মত সব কিছু গ্রাসই করেছো—আর নয়—

ধারালো পাথর কাটা বাটালিটা তুলে নেয় শিখা, গর্জে ওঠে সে, ছুচোখে তার রক্তের নেশা। ঝাঁপিয়ে পড়েছে রেবার উপর, বিভাস ধরতে যায়, উদ্যত ধারালো বাটালিটা ওর কাঁধের ফাঁক দিয়ে নরম চামড়া ভেদ করে হৃৎপিণ্ডে এসে ঠেকেছে, আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ে বিভাস! শিখা চমকে ওঠে—কি সর্বনাশ করেছে সে।

—মা!

. আর্তনাদ করে মায়ের প্রাণহীন দেহের উপর ছিটকে পড়ে রেবা। মাকে তবু বাঁচাতে চেয়েছিল সে নিজের মাথায় সব বিপদের ঝুঁকি নিয়েই। কিন্তু শিখা বাঁচতে আর চায়নি। তুর্বিষহ গ্লানির জ্বালায় আলেয়ার মত অন্ধকারে ছুটে ছুটে ক্লান্ত পরাজিত শিখা নিজেকে শেষ করে মুক্তি পেয়েছে।

আগেই চিঠিখানা লিখে গেছে সে। প্রকাশ করে গেছে কঠিন-সত্যটাকে।

প্রশান্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। নিশীথের চোখ ছুটো ভিজে আসে। বলে সে—ওর সব ভুল, সব কিছুরই প্রায়শ্চিত্ত করে গেল শিখা। ঈশ্বর ওকে ক্ষমা করুন।

সকালের আলো ভরা বনপর্বত—দিগন্ত জুড়ে আলোর বন্যা নেমেছে। ট্রেনটা ছুটে চলেছে কলকাতার দিকে।

ফিরছে নিশীথ আর রেবা।

ওদের কাছে একজনের স্মৃতি কি বেদনায় রঙীন হয়ে গেছে।

—বাবা!

নিশীথ চাইল রেবার দিকে। বলে সে—মাকে কেন আসতে দিয়েছিলে তুমি!

এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না নিশীথ। আজকের সভ্যতার

রথের চাকায় কিছু বলিও চাই, শিখারা সেই আত্মদান করেই হয়তো অন্যকে সঠিক পথের নির্দেশ দেয়।

চুপ করে থাকে নিশীথ।

রেবা বলে—আবার সেই শালবন, লালমাটির দেশ, অজয়ের ধারের কাশবনে নিয়ে যাবে বাবা! কিছু ছবি আঁকবো। সেই আলোর জগতের ছবি—

নিশীথ দেখছে রেবাকে। শিখার সেই মুখ, সেই চাহনি, সেই কণ্ঠস্বব ফুটে ওঠে তার সামনে। এই রেবাকে সে ব্যর্থ হতে দেবে না। সে ওই মাটি-মানুষ-প্রকৃতিকে চিনুক, হয়তো কঠিন সভ্যতার অন্ধকারে সেই ভালোবাসাব আলো তাকে সঠিক পথ দেখাবে। শিখার মত বার্থ হয়ে ফিরে যাবে না সে। নিশীথ বলে—যাবো।

ট্রেনটা ছুটে চলেছে সকালের রোদজাগা অরণ্যানীর বুক চিরে।

শেষ